জ ল ত র ঙ্গ

জলতরঙ্গ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

(বনফুল)

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই মাঘ,
১৮৮০ শকাব্দ

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

অনুজ ডাক্তার শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়
কল্যাণবরেষু

ভাগলপুর
২৩।১।৫৯

প্রথম পর্ব
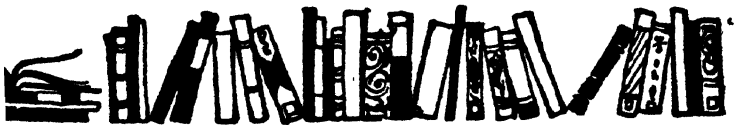
গল্পের কথক শ্রীসাত্যকি রায়ের নিবেদন

এই কাহিনীটির সম্বন্ধে প্রথমেই একটি কথা আপনাদের বলতে চাই। এ কাহিনী কোনদিনই আমি লিখতাম না, এ লেখার যে বিশেষ কোন সার্থকতা আছে তাও আমি মনে করি না, অবশ্য সার্থকতা কথাটা আমি নিতান্ত স্থূল আধিভৌতিক অর্থেই ব্যবহার করছি, আমার ধারণা এ গল্প বাজারে বিক্রি হবে না। ধনী মাত্রেই পাষণ্ড এবং সুন্দরী যুবতী মাত্রেই বিপথে যাবার জন্যে উৎসুক এই যেখানে অধিকাংশ জনপ্রিয় গল্পের মূল সুর, সেখানে এ গল্প চালু করা শক্ত। তাছাড়া এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। সত্য ঘটনার গায়ে রং না দিলে তা শিল্প হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীমতী বর্ণনা, যার জেদে আমি এই গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছি, নিছক সত্যের বাইরে এক পা-ও যাবার অধিকার দেয়নি আমাকে।

এই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা অনেকে এখনও জীবিত। বিশেষ করে ভূষণ চক্রবর্তী বেশ প্রবলভাবেই জীবিত আছেন শুনেছি, এখনও ডাম্বেল মুগুর ভাঁজেন নিয়মিত রূপে। এই গল্পের মধ্যে তিনি তাঁর স্বরূপ আবিষ্কার করে যদি ক্ষেপে ওঠেন তাহলে আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। সত্যের খাতিরে দু'চারজন তথা-কথিত আর্ট-ক্রিটিক, একজন জ্যোতিষী, একজন কামার্ত ধনীর সত্য চরিত্রও এ কাহিনীতে আঁকতে হয়েছে। এঁরাও ইচ্ছে করলে আইনের সাহায্য নিয়ে আমাকে নাস্তানাবুদ করতে পারেন, কারণ টাকার জোর থাকলে এ যুগে একটা ছারপোকাও একটা হাতীকে ওরিএণ্টাল নাচ নাচাতে পারে ;—এ সবই শ্রীমতী বর্ণনাকে বলে-ছিলাম, কিন্তু তবু সে আমাকে সত্য ঘটনার গায়ে অসত্য কল্পনার রং লাগাবার অনুমতি দেয়নি। সে আমাকে প্রথমে যা করতে বলেছিল তা আরও বিপজ্জনক। সে আমাকে তার বাবার একটা প্রামাণিক জীবন-চরিতই লিখে দিতে অনুরোধ করেছিল। তার জন্যেই সমস্ত মাল-মসলা যোগাড় করে এনেছিল সে, 'সুখপুর-পত্রিকা'র ফাইল তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি, কিন্তু সব দেখে-শুনে আমি পিছিয়ে গেলাম। বললাম স্বর্গীয় ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে বেঁচে থাকলে যা করতে পারতেন সাত্যকি রায় তা পারবে না। আমি এই সব মাল-মসলার সাহায্যে বড়জোর একটা উপন্যাস-জাতীয় কিছু লিখে দিতে পারি, কিন্তু ইতিহাসসম্মত জীবন-চরিত লেখা আমার কর্ম নয়। আর জীবন চরিত লিখে হবেই বা কি। চৈতন্য-চরিতামৃত বা বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিতই এ দেশের লোক পড়ে না। তোমার বাবা যদি নামজাদা সিনেমা স্টার হতেন তাহলে হয়তো কেউ কেউ পড়ত। একথা ব'লে আমি যেমন একদিকে জীবন-চরিত লেখার দায় থেকে অব্যাহতি পেলাম, অন্যদিকে তেমনি পা দিলাম আর এক ফাঁদে। নিজের মুখেই স্বীকার করে বসলাম এই মাল-মসলার সাহায্যে উপন্যাস-জাতীয় কিছু একটা লিখে দিতে পারব। বর্ণনা শান্তকণ্ঠে বললে,

"তবে তাই লেখ। কিন্তু মিথ্যে রং চড়িয়ে একটা আজগুবি কাণ্ড করে ব'স না যেন। কল্পনার রাশ আলগা করলে তোমার তো আর জ্ঞান থাকে না।" কোনও যুবতী স্ত্রীলোককে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র, তার উপর সে যদি রূপসী এবং জেদি হয়, ঘাড় নেড়ে, অলক দুলিয়ে, মুচকি হেসে, ভ্রূভঙ্গী করে' নানা কৌশলে নিজের গোঁ বজায় রাখবার প্রয়াস পায়, তাহলে তাকে বোঝাবার চেষ্টা-রূপ নদী যে বিফলতার মরু-পথে হারিয়ে যাবেই তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। তবু আমি চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, "তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের চরিত্র যদি হুবহু আঁকি তাহলে সেটাই অবিশ্বাস্য রকম আজগুবি হবে। কোলকাতার কাছেই এক পাড়াগাঁয়ে একজোড়া রোমশ ম্যামথ বাস করত, এ কথা বরং কেউ কেউ বিশ্বাস করতেও পারে, কিন্তু এ যুগেও তোমার বাবা আর জ্যাঠামশায়ের মতো লোক যে থাকতে পারেন এ কথা বিশ্বাসই করবে না কেউ। ভাববে আমি রূপকথা লিখেছি। বল তো কল্পনার সাহায্যে ও দুটি চরিত্রকে একটু স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করি।"

বর্ণনা বলল, "না, তা করতে হবে না তোমাকে। আমি চাই ওঁদের ঠিক স্বরূপটি আঁকা হোক। সেই জন্যেই জীবন চরিত লিখতে বলেছিলাম। কিন্তু তোমার স্বভাবই হচ্ছে, আমি যে রাস্তায় যেতে বলব, ঠিক তার উল্টো রাস্তায় যাবে তুমি। আমি চাই লোকে জানুক, আমার বাবা জ্যাঠা কি রকম মানুষ ছিলেন। আমি যেমন তাঁদের ফোটো রেখেছি তেমনি তাঁদের চরিত্রের নিখুঁত বর্ণনাও রেখে যেতে চাই। অতি দূর ভবিষ্যতে আমার বংশধরেরা জানবে, কেমন ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা। আমার বিশ্বাস জেনে তারা গর্ব অনুভব করবে।"

স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে এল বর্ণনার চোখের দৃষ্টি। বুঝলাম, ঠিক এই মুহূর্তে এর বিরুদ্ধে আর কিছু বলা সমীচীন নয়।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ বই কি তুমি ছাপাবে?"

"নিশ্চয়।"

"আমার কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে একটা। এ বই কোন প্রকাশক ছাপতে রাজী হবে কি না সন্দেহ।"

"আমার বাবা জ্যাঠার কাহিনী জানবার পর তুমি ভাবলে কি করে যে আমি কোনও প্রকাশকের দ্বারস্থ হব? আমি তো তাঁদেরই মেয়ে। আমি এটা ছাপাব নিজের খরচে এবং বিতরণ করব বিনামূল্যে"—তারপর হঠাৎ একটু হেসে বলল—"অবশ্য তুমি যদি লিখে দিতে না চাও তাহলে আমি জোর করতে চাই না। অন্য লেখকের শরণাপন্ন হতে হবে আমাকে, আর আমার ভুলটাও ভেঙে যাবে তাহলে।"

"কি ভুল ?"

"যে তোমার উপর আমার জোর করবার অধিকার আছে। একটা ভুল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছি হয়তো—"

বর্ণনার পাতলা ঠোঁট দুটি ঘিরে যদিও হাসি চিকমিক করছিল, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি সহসা বিদ্যুৎ-বর্ষী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম যুক্তি-টুক্তি বিসর্জন দিয়ে রাজী হতে হবে আমাকে।

"আমি লিখে দেব না, একথা তো একবারও বলিনি। তোমার জন্যে যা যা করেছি তা তুমি জানো। এ বই বেরুলে বড় জোর আমার না হয় জেল হবে মাস কয়েক, তাতেও আমি পিছপা নই, সেটা খুব বড় একটা ট্র্যাজিডিও হবে না, কিন্তু মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি হবে বইখানার প্রচার যদি আইনের জোরে বন্ধ হয়ে যায়—"

"তা হবার সম্ভাবনা আছে না কি ?"

"খুব আছে। খারাপ লোককেও প্রকাশ্যভাবে খারাপ বললে সে তোমাকে মানহানির দায়ে ফেলতে পারে। আইন তার স্বপক্ষে—"

এ কথা শুনে বর্ণনা মুষড়ে গেল একটু। বরং এ অবস্থায় সাধারণত সে যা করে তাই করতে লাগল, বাঁ কানের উপরের চুলগুলো তিনটে আঙুল দিয়ে টানতে লাগল আস্তে আস্তে, আর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নাকের সূক্ষ্ম ডগাটাও যেন কেঁপে উঠল দু'একবার। কষ্ট হতে লাগল তাকে দেখে।

"একটা কাজ করলে অবশ্য হতে পারে।"

"কি ?"

"নামগুলো সব যদি বদলে দেওয়া যায়। আমার বিশ্বাস তাহলে কেউ আর ধরতে পারবে না। দু'একটা অবাস্তর ঘটনাও অবশ্য ঢোকাতে হবে ওর মধ্যে, যাতে ওদের মনে হয় যে গল্পটা সত্যিই কল্পনা-প্রসূত—"

মুখ গোঁজ করে বসে রইল বর্ণনা কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, "বেশ তাই কর তাহলে—"

সুতরাং এই গল্পের সমস্ত নামগুলিই কাল্পনিক, এমন কি বর্ণনার নামও বর্ণনা নয়, সুখপুরের নামও সুখপুর নয়। বলা বাহুল্য, আমার পরিচয়ও আমি যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস পেয়েছি। আমার নাম থেকেই সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়, কারণ মহাভারত-যুগের পর কোনও লোকই সম্ভবত নিজের ছেলের নাম সাত্যকি রাখেন নি, আমার বাবা তো একথা ভাবতেই পারতেন না। আর একটা কথাও বলা দরকার, এই বিশেষ কাহিনীর জগতেই যে আমি নিজেকে

প্রচ্ছন্ন রেখেছি তা নয়, বাইরের বাস্তব-জগতেও নিজেকে আমি প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেছি বরাবর। ভারী আনন্দ পেয়েছি এতে। অপরিচয়ের বোরখা ঢাকা দিলে জগতের যে রূপ দেখা যায়, স্বরূপে তা দেখা সম্ভব নয় মোটেই। চেনা লোক সর্বদাই আপনার কাছে একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আসে, তার বিশেষ রকম হাসি, বিশেষ রকম কথাবার্তা, বিশেষ রকম ব্যবহার ছাড়া তার আর কিছুই আপনি দেখতে পান না। কিন্তু তার কাছে যদি অচেনা হয়ে যান তাহলে তার আর এক রূপ, সম্ভবত তার সত্য রূপই দেখতে পাবেন আপনি, আরব্য উপন্যাসের হারুণ-অল্ রশীদ যেমন পেতেন।

গল্পটি দুটি পর্বে ভাগ করে আমি বলছি। প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কুড়ি বছর। বর্ণনার জন্মের সঙ্গে প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হয়েছে বর্ণনার বয়স যখন কুড়ি বছর।

এক

একটা বিরাট বনস্পতিকে কেউ যদি তার আরণ্য পরিবেশ থেকে উপড়ে এনে একটা টবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে তাহলে তা যেমন যুগপৎ হাস্যকর এবং করুণ হয়, শ্রীমতী বর্ণনা সুখপুর গ্রামের বনস্পতি মিশ্রকে কোলকাতা শহরের এক ভাড়াটে বাসায় এনে ঠিক তেমনি এক হাস্যকর এবং করুণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বসল। বনস্পতি আসতে চাননি, বর্ণনাও জানত এলে তাঁর কষ্ট হবে খুব, তবু তাঁকে আসতে হয়েছিল, না এসে উপায় ছিল না।

ব্যাপারটা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হলে পূর্ব ইতিহাস জানতে হয়। বনস্পতির পিতা গৃহপতি মিশ্র সুখপুর গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন একজন। গঙ্গার ধারে ধারে দুশ' বিঘে ধানের জমি ছিল তাঁর। যেবার কম ফলত, সেবারও বিঘে পিছু দশ মণ ধান পেতেন তিনি। সুতরাং লোকে যে তাঁর সংসারকে লক্ষ্মীর সংসার বলত, সেটা অত্যুক্তি নয়। অন্নবস্ত্রের চিন্তা ছিল না বলেই শখও ছিল তাঁর নানারকম। ফুলের বাগান, ফলের বাগান, খাওয়া-খাওয়ানো, গান-বাজনা এই সব নিয়েই জীবন কাটিয়েছিলেন তিনি। চন্দন গাছ, হিং গাছ, কমলালেবুর গাছ, আঙ্গুর-লতা ছিল তাঁর বাগানে। শোনা যায় লবঙ্গ-লতা, এলা-লতা আর সোম-লতা চাষ করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে অনেক অর্থ-ব্যয় করেছিলেন তিনি, কিন্তু সফলকাম হন নি। বিলিতি ব্যাঞ্জো বাজনাটা শেখবার চেষ্টা করেছিলেন, বাজনাটা নতুন আমদানি হয়েছিল তখন এদেশে, কিন্তু গুরুর অভাবে সেটাকেও আয়ত্তে আনতে পারেননি ভাল করে। লেখাপড়ার শখও ছিল তাঁর। সেকালে যত রকম বাংলা বই বেরুত, সব কিনতেন তিনি। উর্দু বই, সংস্কৃত বইয়েরও ভাল সংগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল সংস্কৃত উদ্ভট-শ্লোকের প্রতি। অনেক শ্লোক কণ্ঠস্থও ছিল, প্রায়ই আওড়াতেন। আর একটা বিশেষত্বও তাঁর দেখা গিয়েছিল পরে। স্ত্রী-বিয়োগের পর মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতেন। নানারকম গুজব উঠত এ নিয়ে প্রথম প্রথম। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি বেশি দূরে যান না। তাঁর বাড়ির কাছেই 'বুড়ীর জঙ্গল' ব'লে যে বনকরটা তিনি কিনেছিলেন সেইখানে

নির্জন-বাস করেন গিয়ে। কিছুদিন পরে আবিষ্কৃত হল সেখানে একটি ছোট কুঁড়েঘর আছে, কুয়াও আছে একটি। বুড়ীর জঙ্গলের এই কুঁড়ে ঘরে স্বপাক আহার করে একা একা বাণপ্রস্থের মহড়া দিতেন তিনি সম্ভবত।

মোট কথা, খুব খামখেয়ালী এবং শৌখীন লোক ছিলেন তিনি। ধনী তো ছিলেনই। আর একটি গুণ ছিল তাঁর (অনেকে এটাকে দোষ বলেও গণ্য করত) সে যুগে যা অধিকাংশ লোকেরই ছিল না। চরিত্র-বান লোক ছিলেন তিনি। একটি মাত্র বিবাহ করেছিলেন। প্রথম যৌবনেই স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছিল তবু আর বিবাহ করেন নি। দাম্পত্য-জীবনের বাইরে আর কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্কও রাখেন নি। যে যুগে একাধিক বিবাহ এবং একাধিক রক্ষিতা-পালনই আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল সে যুগে গৃহপতির এই একনিষ্ঠ আচরণ বিস্ময় উৎপাদন করেছিল অনেকের মনে। অনেকে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখত। অনেকে বিদ্রূপও করত। সম্ভবত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর 'পাগলা গিরি' নাম দিয়েছিল এই জন্যেই। গৃহপতি নামটাকেই সংক্ষিপ্ত করে 'গিরি' করে নিয়েছিল তারা। পাগলামির আরও নানা-রকম পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি জীবনে। বাড়ির হাতায় কোনও গরু বা ছাগল ঢুকলে তাদের তিনি খোঁয়াড়ে তো দিতেনই না, তাড়িয়েও দিতেন না। বরং ভাল করে খাওয়াতেন তাদের। বলতেন, ওরা অতিথি, মানুষ নয় বলেই কি ওদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা উচিত? একবার গ্রামের এক গরীবলোকের বাড়িতে ভূতের উপদ্রব শুরু হল। গভীর রাত্রে তার বাড়ির চারিধারে পাঁঃ, পাঁঃ, পাঁঃ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অনেক সন্ধান করেও কোনও মানুষ, পাখী বা জন্তু জানোয়ার আবিষ্কার করা গেল না। তখন বাড়ির কর্তা খেতু গৃহপতির কাছে কেঁদে পড়ল এসে। গৃহপতির উপর কিছু দাবিও ছিল তার, কারণ গৃহপতির সহপাঠী ছিল সে পাঠশালায়। গৃহপতি গিয়ে খেতুর বাড়িতে রাত্রিবাস করলেন। পাঁঃ, পাঁঃ শব্দটা শুনলেন স্বকর্ণে। তারপর সকালে খেতুকে বললেন, "তোর ঠাকুরদার প্রেতাত্মা পায়েস খেতে

াইছেন। মনে নেই নিমন্ত্রণ খেতে খেতেই মৃত্যু হয়েছিল তাঁর? ুরো খাওয়াটা শেষ করতে পারেন নি, পায়েসটা বাকি ছিল। সেই াকাঙ্ক্ষাটা আছে এখনও। ভাল করে পায়েস খাওয়া ওঁকে, তাহলেই ব ঠিক হয়ে যাবে।" তার পরদিন নিজেই তিনি দু'মণ দুধের পায়েস তরি করিয়ে খাওয়ালেন সকলকে। খেতুর বাড়ির চারদিকে ছোট ছোট ুরিতে করে একশ' খুরি পায়েস রেখে দেওয়া হল। তার পরদিন কালে দেখা গেল একটি খুরিতেও পায়েস নেই, সব যেন কেউ চেটেপুটে খেয়েছে। এর পর থেকে শব্দটাও থেমে গেল।

গৃহপতির সম্বন্ধে এই ধরনের নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে।

গৃহপতির পত্নী রঙ্গাবতীও অসাধারণ মহিলা ছিলেন। গরীবের ঘরে ন্ম হয়েছিল তাঁর। গৃহপতির পিতা সুরপতি তাঁকে আবিষ্কার করে-ছিলেন এক গরীব যজমানের গৃহে। সুরপতি যজন-যাজন করতেন। জন-যাজন করেই প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি সে যুগে। য দু'শ বিঘে জমি গৃহপতির সংসারে পরে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল তার ধিকাংশই সুরপতি পেয়েছিলেন ব্রহ্মত্র স্বরূপ। বড় বড় জমিদার এবং ধনীরা সুরপতির যজমান ছিলেন। সুলক্ষণা রঙ্গাবতীকে সুরপতি খন আবিষ্কার করেছিলেন তখন তার বয়স ন'বছর। গৃহপতির বয়স তখন ষোল। গৃহপতি সুরপতির একমাত্র সন্তান ছিলেন, শৈশবে াতৃহীনও হয়েছিলেন তিনি। তাই সুরপতি আর কালবিলম্ব না করে ঙ্গাবতীকে পুত্রবধূ করে এনেছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর গৃহে লক্ষ্মীর ূন্য আসন রঙ্গাবতীই সার্থকভাবে পূর্ণ করতে পারবে। তা তিনি পেরেছিলেন, সুরপতির আশা সফল হয়েছিল। খুব 'পয়' ছিল ঙ্গাবতীর। যে বছর তাঁর বিয়ে হয় সেই বছরই জমিতে এত ফসল ফলেছিল যে তা বিক্রি করে আরও পঞ্চাশ বিঘে জমি কিনতে পেরেছিলেন সুরপতি। গঙ্গার ধারের এই পঞ্চাশ বিঘে জমির নামই ছিল 'সোনা-ফলানি'। রঙ্গাবতী আসবার পর সুরপতির সংসারে ঐশ্বর্য যেন উথলে পড়েছিল। শেষ-জীবনে সুরপতি যজন-যাজন ছেড়ে দিয়েছিলেন। গৃহপতিকেও ও কাজে তিনি আর উৎসাহিত করেন নি।

বলতেন, খাঁটি ব্রাহ্মণ না হলে ওসব কাজ ঠিক মতো করা যায় না, আর যা ঠিক মতো করা যায় না তা করাও উচিত নয়। শেষ জীবনে চাষ-বাস নিয়েই থাকতেন তিনি।

গৃহপতিকে গৃহস্থাশ্রমে স্থাপন করে দুটি পৌত্রমুখ দেখে সুরপতি গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তখন গৃহপতির বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, রঞ্জাবতী তখনও যৌবন-সীমা অতিক্রম করেন নি। গৃহপতির বড় ছেলে বকু তখন বারো বছরের, ছোট ছেলে বনু দশ বছরের। এদের নামকরণ সুরপতিই করেছিলেন। বক্ বক্ করতো বলে তিনি বড় নাতির নাম দিয়েছিলেন বকু আর ভাল নাম বাচস্পতি। ছোট নাতিটি ছিল একটু বন্য স্বভাবের, তাই তার ডাক নাম দিয়েছিলেন বনু (মাঝে মাঝে বুনো বলেও ডাকতেন তাকে) আর ভাল নাম বনস্পতি। বনু যখন খুব ছেলেমানুষ তখনই এটা সবাই লক্ষ করেছিল যে সে বনে-জঙ্গলে ঘাটে-মাঠে ঘুরে বেড়ানোটাই পছন্দ করে বেশি। গঙ্গার চরে চরে, গ্রামের বাগানে বাগানে, ঝোপে জঙ্গলে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াত সে। 'বুড়ীর জঙ্গল' বনকরটা যখন কেনা হল তখন প্রায়ই সেখানে চলে যেত। নদীর ধারে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে বসে থাকতে অনেকে দেখেছে তাকে। বকুর স্বভাব ছিল উল্টো। সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত আর প্রত্যেক বাড়ির খবর সংগ্রহ করে এনে সবিস্তারে বর্ণনা করত বাড়িতে। উত্তর জীবনে এরা যা হবে তা তাদের বাল্যকালেই আভাসিত হয়েছিল।

গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছিল দু'জনে। গ্রামে মাইনর স্কুল ছিল একটি। সে স্কুল থেকে যখন তারা বেরুল তখন উচ্চশিক্ষা লাভ করবার জন্যে তাদের শহরে আর গৃহপতি পাঠালেন না। বললেন, ওরা চাকরি তো করবে না, ডাক্তার উকিলও হবে না। শুধু শুধু মেস-বোর্ডিংয়ের কদন্ন খেয়ে শরীর খারাপ করার দরকার কি তাহলে। তার চেয়ে বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করুক। হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে সংস্কৃত পড়ুক বরং কিছুদিন, তারপর বড় হয়ে নিজেদের বিষয়-আশয় দেখুক। রঞ্জাবতীও সায় দিলেন এতে। ছেলে দুটিকে ঘিরেই তাঁর সংসার,

তারা চোখের আড়ালে চলে যাবে, কোথায় থাকবে, কি খাবে—এ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছেলেদের পাঠাতে রাজী হলেন না তিনি। তাঁর মনে হল ছেলেরাই যদি বাইরে থাকে তাহলে সংসারে তিনি থাকবেন কি নিয়ে? এত দুধ, এত ঘি, তরিতরকারি এসব খাবে কে? বারো মাসে তেরো পার্বণের উৎসব কাদের নিয়ে করবেন?

সুতরাং বাচস্পতি এবং বনস্পতির বিলাতী উচ্চশিক্ষা লাভ করা হল না। তারা হিরণ্ময় শিরোমণির কাছে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ পড়তে লাগল।

বছর দুই কাটল এইভাবে। বছর দুই পরে শিরোমণি মশায় তার শিষ্যদের বললেন, তোমরা কিছু সংস্কৃত রচনা করে আমাকে দেখাও। রচনার বিষয় তোমরাই নির্বাচন কর।

বাচস্পতি লিখল—'ফাল্গুন মাসি পূর্ণিমা তিথৌ ভট্টাচার্যস্য ধুম্সি নাম্নী গাভী একং বিচিত্রবর্ণং বৎসং প্রসবয়ামাস।'···বনস্পতি কিছুই লিখল না দু' একদিন। বলল, কি লিখব ভাবছি। শিরোমণি মশায় তাগাদা দিলেন আবার। তখন সপ্তাহখানেক পরে যা লিখল সে তা কেউ প্রত্যাশা করে নি। লিখল—'বিবিধরাগরঞ্জিতা সন্ধ্যা-গগন-পট-শোভা জাহ্নবী-তরঙ্গ-শীর্ষে অবর্ণনীয়-আলেখ্যং বিস্তারয়ামাস।' কালি দিয়ে লিখল না, হলুদ, চুন আর সিঁদুর দিয়ে লিখল, মনে হতে লাগল যেন সন্ধ্যার মেঘই অক্ষরের রূপ ধরেছে।

শিরোমণি মশায় প্রকৃত শিক্ষক ছিলেন। তিনি গৃহপতিকে বললেন, "তোমার দুটি ছেলেই ভাল, কিন্তু একরকম নয়। তোমার বড় ছেলেটির ঝোঁক দেখছি সংবাদ-সংগ্রহের দিকে। গ্রামের যাবতীয় সংবাদ ওর কাছে পাবে। আমার মনে হয় ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ওকে উৎসাহিত করা উচিত। এই সব গ্রন্থই ওকে পড়াতে হবে। আর তোমার ছোট ছেলেটির প্রবণতা শিল্পের দিকে। উৎসাহ দিলে চিত্রকর হতে পারবে। বকুর মতো ওরও সংবাদ-সংগ্রহ করার ঝোঁক আছে, কিন্তু সে সব সংবাদ সাধারণ মানুষের সংবাদ নয়, আলো বাতাস আকাশ অরণ্য এদের সংবাদ, সে সংবাদ ভাষায় ব্যক্ত হয় না, হয় বর্ণের ব্যঞ্জনায়।

ওর বন্ধু কে জান ? শীতল কুমোর আর হরি পোটো। ওর প্রতিভা স্ফুরিত হবে চিত্রকলায়—"

গৃহপতি যে এসব দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন তা মনে হয় না। তবে বাধাও দেন নি। ছেলে দুটি আপন আপন খেয়াল-খুশির স্রোতে নিজেদের নৌকা ভাসিয়ে বড় হচ্ছিল। রঙ্গাবতী এই ভেবে খুশি ছিলেন যে এ সব খেয়াল বদ খেয়াল নয়। উৎসাহ দিতেন তিনি তাদের। বাচস্পতি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে নানারকম সংবাদ সংগ্রহ করে এনে একটি খাতায় লিখত। তারপর মা-কে পড়ে শোনাত সেগুলি। শুনে অবাক হয়ে যেতেন রঙ্গাবতী। গ্রামের মন্দির, গ্রামের পোড়ো ভিটে, সজনেপাড়ার রতনদীঘির পিছনে যে এত সব ইতিহাস ছিল তা কে জানত। অনেক পুরনো লোকের গল্পও যোগাড় করে আনত বাচস্পতি। যে সব গল্প লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায় কখনও কিংবদন্তী রূপে, কখনও রূপকথার আকারে, সেই গল্পগুলিকে সংগ্রহ করে এনে সে লিপিবদ্ধ করত তার 'সুখপুর-পত্রিকায়'। তার খাতাখানার নাম সে দিয়েছিল 'সুখপুর-পত্রিকা'। অতি সাধারণ সর্বজনবিদিত খবরও থাকত তাতে। হারু গাঙ্গুলীর বিধবা কন্যার আত্মহত্যা, চৌধুরী মশায়ের ছেলের উপনয়ন, নাপিতপাড়ায় গোখরো সাপের উৎপাত—এ ধরনের খবরও সুখপুর-পত্রিকায় লিখত সে অসঙ্কোচে। খবর যোগাড় করে আনা এবং সেটা পরিচ্ছন্ন করে খাতায় লেখা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল তার। আর মা-ই ছিল তার একমাত্র শ্রোতা। শিরোমণি মশায়ও শুনতেন মাঝে মাঝে এবং সেগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করতে বলতেন। তা-ও করত বাচস্পতি আলাদা একটি খাতায়।

বনস্পতির প্রধান আড্ডা ছিল হরি পোটোর বাড়িতে। শীতল কুমোরের ওখানেও সে প্রায় যেত। তারা যে পদ্ধতিতে যে সব রং দিয়ে বরাবর পট বা মূর্তি করেছে তা শিখে নিতে বেশি সময় লাগেনি বনস্পতির। একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু ভালো লাগত না তার। সে চাইত নতুন কিছু করতে। নিজে করবার চেষ্টাও করত। একবার একটা তক্তার উপর আঠা মাখিয়ে, সেই আঠার উপর বালি আর মাটি

গুঁড়ো ছড়িয়ে এমন সুন্দর উই-ঢিবি এঁকেছিল সে, যে তাক লেগে গিয়েছিল হরি পোটোর। খড়ির গুঁড়োর সঙ্গে নীল, তিসির তেল আর তার্পিন দিয়ে কেষ্ট ঠাকুরও গড়েছিল সে চমৎকার। মায়ের একটা ছবিও এঁকেছিল অদ্ভুত ধরনের। কাছ থেকে দেখলে মনে হত খাবছা খাবছা কতকগুলো রং লাগানো রয়েছে বুঝি কেবল। সব রকম রংই ছিল ছবিটাতে, এমন কি কালো রং পর্যন্ত।

রঙ্গাবতী ছবিটা দেখে বললেন, "ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া রং লাগিয়ে এ কি করেছিস তুই—"

"দূর থেকে দেখ। বারান্দার ওই দিকে চলে যাও একেবারে—" দূর থেকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন রঙ্গাবতী। চমৎকার রামধনু রঙের শাড়ি পরে পান সাজছেন তিনি নিজেই। মাথাটি হেঁট করে হাসছেনও মুচকি মুচকি। ঠোঁট দুটি টুকটুক করছে, কুচকুচ করছে মাথার চুল, আর ঝলমল করছে শাড়িখানা। হাতের সবুজ পানটা মনে হচ্ছে যেন পান্না। দেখে গৃহপতিও খুশি হলেন খুব। কিছুদিন পরে আর এক কাণ্ড করলে বনু। শিরোমণি মশায়ের একখানা ছবি এঁকে ফেললে কাঠের উপর, আর সেটা বাটালি দিয়ে কেটে কেটে এমন করলে যে দেখলে ঠিক মনে হয় জীবন্ত শিরোমণি মশায় বুঝি বসে আছেন। মাথার সামনে টাক, শুক-চঞ্চু নাসা, মুখে মৃদু হাসি, কানে খড়কে গোঁজা, অবিকল শিরোমণি মশায়।

বনস্পতি কালে যে একজন উঁচুদরের শিল্পী হবে সকলেরই মনে এ ধারণা দৃঢ় হল। তা দৃঢ়তর হল যখন সে গৃহপতি আর রঙ্গাবতীর দুটি বড় বড় মূর্তি তৈরি করে ফেললে সিমেণ্ট দিয়ে। গঙ্গার ধারে তাদের যে বাগানটা ছিল সেই বাগানে দুটি প্রকাণ্ড ছত্রের তলায় মূর্তি দুটি যখন স্থাপিত হল তখন মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। এই খবরটা লিপি-বদ্ধও হয়েছিল বকুর 'সুখপুর পত্রিকা'য়। সংবাদটি সে লিখেছিল যে ভাষায় তা-ও রীতিমত পত্রিকার ভাষাই।

"নবীন শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্র কর্তৃক নির্মিত তাহার পিতা-মাতার সিমেণ্ট-মূর্তি সুখপুর গ্রামস্থ সৈকত কাননে মহাসমারোহে স্থাপিত

হইয়াছে। শ্রীমান বনস্পতির পিতৃদেব শ্রীযুক্ত গৃহপতি মিশ্র এবং জননী শ্রীযুক্তা রঙ্গাবতী দেবী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীমানকে আশীর্বাদ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে একটি বিরাট ভোজেরও আয়োজন হইয়াছিল। সুখপুর গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভূরি-ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া শ্রীমানের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা রঙ্গাবতী দেবী স্বহস্তে পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া এবং স্বহস্তে তাহা সকলকে পরিবেশন করিয়া মাতৃস্নেহের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুখপুরের অধিবাসীবৃন্দ সহজে বিস্মৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

'সৈকত-কানন' গৃহপতিরই গঙ্গার ধারের বাগানটার নাম। এই-খানেই নানারকম শৌখীন গাছ পুঁতেছিলেন তিনি। একটা বেশ বড় বাড়িও ছিল সৈকত-কাননে।

এরপর গৃহপতির গৃহে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা অসাধারণ কিছু নয়। বকু আর বনু যথানিয়মে বড় হয়েছে, তাদের বিবাহও দিয়েছেন গৃহপতি খুব ধুমধাম করে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে তীর্থ পর্যটন করে এসেছেন, গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, দান-ধ্যান করেছেন, তারপর যথানিয়মে গঙ্গাতীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন একে একে। রঙ্গাবতী আগে, গৃহপতি তার বছরখানেক পরে।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে গৃহপতি আর একটা কাজ করেছিলেন, সেটাকেও অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, অন্তত তাঁর পক্ষে এটা অসাধারণ। তিনি ছেলে দুটিকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিছু, যা তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও দেন নি তাদের।

বলেছিলেন, "দেখ, আমার এবার যাওয়ার সময় হল। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমি জানি উপদেশ দিলে কেউ শোনে না, তাই এর আগে কখনও তোমাদের উপদেশ দিই নি। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় আমার ঐহিক সম্পত্তি যা কিছু আছে তা যেমন তোমাদের দিয়ে যাব, আমার ঐহিক অভিজ্ঞতাটাও তেমনি দিয়ে যাওয়া উচিত। অভিজ্ঞতায় অভিনবত্ব কিছু নেই, আমাদের দেশের প্রাচীন কথাই আবার বলছি।

কোনও কারণে স্বধর্ম ত্যাগ কোরো না। করলে কষ্ট পাবে। আর আত্মসম্মানকে রক্ষা করবে যখের ধনের মতো। ওটা যদি কোনও কারণে বিকিয়ে দাও তাহলে নিজের চোখেই নিজেকে হীন বলে মনে হবে। তার চেয়ে বড় কষ্ট আর নেই। সাধারণত অর্থাভাবে পড়ে লোকে এসব করে। ভগবানের কৃপায় যা রেখে যাচ্ছি তাতে সেরকম অভাব তোমাদের হওয়ার কথা নয়। এর বেশি আর বলবার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আর একটা কথাও মনে হচ্ছে সেটাও বলে যাই। তোমাদের ছেলে-মেয়ে দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হল না, তারা যখন আসবে তাদের আর সাবেক চালে মানুষ কোরো না—তোমাদের যেমন করেছি। কালের গতি বদলেছে, সমাজের চেহারাও বদলে যাচ্ছে, পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে হলে নিজেদেরও বদলাতে হবে। তাদের কোলকাতায় রেখে আধুনিক শিক্ষা দিও। সে শিক্ষা না পেলে তারা ঠিক মানিয়ে চলতে পারবে না সকলের সঙ্গে।”

দুই

বাচস্পতির বিয়ে হয়েছিল এক গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। রঞ্জাবতীই পছন্দ করেছিলেন মেয়েটিকে। মেয়ের নামটাও বদলে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়ের ভাল নাম ছিল অসীমাসুন্দরী, আর ডাক নাম ছিল সিমু। তিনি ভাল নামটাকে সীমন্তিনী করে দিয়েছিলেন। সীমন্তিনীর রূপ গুণ দুই-ই ছিল। যেদিন সে বুঝল যে গৃহপতির গৃহের বড় বধূ হতে হবে তাকে, সেদিন থেকেই এর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল সে। প্রস্তুতির অধিকাংশটাই অবশ্য হয়েছিল নেপথ্য মানসলোকে। বাইরে একটা জিনিস দেখা গিয়েছিল শুধু, খুব মন দিয়ে সে হাতের লেখা মক্‌শ করতে আরম্ভ করেছে। সে শুনেছিল বাচস্পতি লেখা-পড়া ভালবাসে, রোজ নিজে সুখপুর-পত্রিকা নামে একখানা বই লেখে। তখনই সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সে-ও বিয়ে হবার

পর স্বামীকে সাহায্য করবে এ বিষয়ে। পাঠশালার পণ্ডিত হরু ঠাকুরের কাছে বসে রোজ মন দিয়ে হাতের লেখা লিখত। মুক্তোর মতো হাতের লেখা হয়েছিল তার। পরবর্তী জীবনে সিমুর নাম আবার বদলে দিয়েছিল বাচস্পতি। 'ছাপাখানা' বলে ডাকত তাকে। এই 'ছাপাখানা' না থাকলে 'সুখপুর-পত্রিকা' অচল হয়ে যেত। আর তাহলে বাচস্পতিও তার জীবনের অবলম্বন হারিয়ে ফেলত। সীমন্তিনীর কোনও ছেলেপিলে হয়নি, 'সুখপুর-পত্রিকা' তারও জীবনে অপত্যের স্থান অধিকার করেছিল। তাকেই সে সারাজীবন লালন করেছে মাতৃস্নেহে। বাড়িতে অবশ্য পরে সন্তানসন্ততির অভাব হয় নি। সিমুর দাদা হিমুর সমস্ত পরিবারই এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাচস্পতির সংসারে। প্রথম প্রথম সিমুকেই সব ভার পোয়াতে হয়েছিল তাদের। হিমুর স্ত্রী সত্যবতী পৌরাণিক যুগের সত্যবতীর মতোই স্থির-যৌবনা ছিলেন। তাঁকে দেখলে মনে হত না যে তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী, বরং মনে হত তাঁর বয়স কুড়ির নীচেই।

বনস্পতির বিয়ে হয় কোলকাতায় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। বনস্পতির স্ত্রী সরস্বতী রূপের জোরেই এসেছিলেন এ সংসারে। যে ঘটক বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তিনি জোর গলায় বলেছিলেন— আপনার ছেলে শিল্পী, মানে সৃষ্টিকর্তা। তার জন্যে সত্যিই সরস্বতীর খোঁজ এনেছি আমি। এ তল্লাটে ওরকম মেয়ে আর দ্বিতীয় নেই, দেখে আসুন, সত্যিই কুন্দেন্দুবরণা। গৃহপতি দেখতে গিয়েছিলেন এবং দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একেবারে আশীর্বাদ করে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। আশীর্বাদ করবার মাসখানেক পরই বিয়ের শাঁখ বেজে উঠেছিল বাড়িতে।

বিয়ের পর বনস্পতি মেতে উঠেছিল বউকে নিয়ে। অবশ্য উন্মাদনাটা সীমাবদ্ধ ছিল তার মানসলোকেই, কারণ সে যুগে বউ নিয়ে বাইরে বাড়াবাড়ি করবার উপায় ছিল না। আর একটা কথাও সঙ্গে

সঙ্গেই বলে দেওয়া উচিত, তা না হলে আধুনিক যুগের পাঠক-পাঠিকারা হয়তো 'বাড়াবাড়ি' কথাটার ভুল অর্থ করতে পারেন। বিয়ের সময় সরস্বতীর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বনস্পতির শিল্পী মনই মেতে উঠেছিল এই কুমারী কিশোরীকে নিয়ে। তার যে মন আকাশের অনন্ত রূপে অভিভূত হত, অরণ্যের নিত্য নব শোভাকে বর্ণের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করত, গঙ্গার তীরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও যা ক্লান্ত হত না কখনও, তার সেই শিল্পী-মানস-শতদলেই এসে সমারূঢ়া হল রূপসী সরস্বতী। সে সরস্বতীর হাতে যে অদৃশ্য বর্ণের বীণায় অসংখ্য ছবির সুর বাজত তা সাধারণ লোকের শ্রুতিগোচর বা নয়নগোচর হত না। তা বনস্পতিকেই সম্মোহিত করত কেবল অনাস্বাদিত-পূর্ব রসে। ছবির পর ছবি এঁকে যেতে লাগল সে। নানারকমের ছবি, নানারকমের রং। নিজেই সে তৈরি করত নানারকমের রং। হলুদ, শিউলি ফুলের বোঁটা, লোহা, সুরকি-গুঁড়ো, তুঁত, হিরাকস, ফটকিরি প্রভৃতি নানা জিনিস মিলিয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত রং সৃষ্টি করত সে, আর তাই নিয়ে মেতে থাকত দিনরাত। রঙের এই রাসায়নিক ক্রীড়ায় সব সময় যে সফল হত তা নয়, প্রায়ই বিফল হত, কিন্তু দমত না কখনও, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠত আবার। বাজারের প্রচলিত রং, রঙের বাক্স, তুলি এ সবই ছিল তার প্রচুর, কিন্তু সে আনন্দ পেত নিজের তৈরি রঙে ছবি এঁকে।

সরস্বতীর অনেক ছবি এঁকেছিল সে। কিন্তু একটি সরস্বতীও প্রচলিত সরস্বতীর মতো হয় নি। কুচকুচে কালো পটভূমিকায় দুলছে একটি ধবধবে সাদা পপি ফুল লম্বা সবুজ বৃন্তের উপর—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। একদল শ্বেতহংস খেলা করছে পদ্মবনে, হাঁসগুলো মনে হচ্ছে পদ্মের মতন আর পদ্মগুলোই যেন হাঁস, একটি আধ-ফোটা পদ্ম চেয়ে আছে আকাশের দিকে—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। কৃষ্ণমেঘের স্তর ভেদ করে চাঁদ উঠেছে পূর্ণিমার—নীচে নাম লেখা সরস্বতী। এক ঝাঁক অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে সবুজ লতাটিকে আচ্ছন্ন করে—নীচে নাম লেখা নীল সরস্বতী। বিরাট বাঘের থাবার নীচে পড়ে আছে রক্তাক্ত হরিণ ঘাড় মটকে—নীচে নাম লেখা রক্ত সরস্বতী। কত রকমের

সরস্বতী যে এঁকেছিল সে তার আর ইয়ত্তা নেই। সৈকত-কাননে বড় হল-ঘর ছিল একটা, সেইখানেই খিল বন্ধ করে অধিকাংশ সময় থাকত সে। নিজেকে নিয়েই থাকত। রঙ্গাবতী যতদিন বেঁচে ছিলেন জোর করে ধরে আনতেন তাকে নাওয়া-খাওয়ার জন্য। না ডাকলে আসত না। একবার ডাকলেও আসত না, অনেকবার ডাকতে হত।

আর একটা জিনিসও হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল দুই ভায়েরই। আগেই বলেছি গৃহপতি সবরকম বাংলা বই কিনতেন। দৈনিক সাপ্তাহিক পাক্ষিক মাসিক সব রকম সাময়িক পত্রিকারও গ্রাহক ছিলেন তিনি। সুতরাং দুজনেরই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল ঘনিষ্ঠভাবে। এর ফলে দুজনের মনেই যে প্রতি-ক্রিয়া হয়েছিল তা-ও স্বাভাবিক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল তা একটু অদ্ভুত। লেখক এবং চিত্রকরদের বাইরের জগতে আত্মপ্রকাশ করবার যে স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে তা বাচস্পতি বনস্পতি দুজনেরই ছিল। দুজনেই তাদের রচনা গোপনে গোপনে পাঠিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের হাটে, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকদের দপ্তরে, কিন্তু পাত্তা পায় নি সেখানে। অনেকদিন কোনও উত্তরই আসে নি। সঙ্গে টিকিট দেওয়া ছিল, ঠিকানা-লেখা খাম দেওয়া ছিল, তবু আসে নি। অনেকবার তাগাদা দেবার পর অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছিল বনস্পতির আঁকা ছবি একখানা। কিন্তু যে অবস্থায় এসেছিল তা দেখলে যে কোন শিল্পীরই বুক ফেটে যাবে। মোড়া, দোমড়ানো, ময়লা—শুদ্ধ ভাষায় ধর্ষিত এবং মর্ষিত হয়ে ফিরেছিল ছবিখানা। কোথাও কোথাও রংও উঠে গিয়েছিল। ছবিখানার দিকে চেয়ে চোখে জল এসে পড়েছিল বনস্পতির। এর কিছুদিন পরে সে হঠাৎ একদিন চমকে গেল তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে। সেখানে তার চোখে পড়ল মেজেতে একটা খাম পড়ে আছে, তারই নাম-ঠিকানা লেখা খাম, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তার নাম ঠিকানা কেটে লাল কালিতে অপরের ঠিকানা লেখা রয়েছে তাতে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলে সে। তারপর তার

আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করল, এ খাম এখানে এল কি করে? তিনিও বলতে পারলেন না কিছু, তারপর একটু ভেবে বললেন, কাল হোর্‌মিলার কোম্পানির একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনিই ফেলে গেছেন সম্ভবত। খামের ভিতর কোন চিঠি ছিল না।

এই ঘটনার পর বনস্পতি তার ছবি আর কোথাও পাঠায় নি।

বাচস্পতির অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত। সাতটি সাময়িক পত্রিকায় সে সুখপুর গ্রামের নানা বিবরণ পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশিত হয় নি। সাতটি পত্রিকার সম্পাদকদের মধ্যে সকলেই যে অভদ্র ছিলেন তা নয়, তিনজন চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করা যাবে না। ভারী দমে গিয়েছিল বাচস্পতি। বিমর্ষ বাচস্পতিকে সিমুই সান্ত্বনা দিয়েছিল।

বলেছিল, "ওরা তোমার লেখার মানেই বুঝতে পারে নি সম্ভবত। শুনেছি বড়লোকের আকাট মুখ্যু ছেলেরা নাকি ওই সব কাগজ চালায়। ওরা তোমার লেখার মর্ম বুঝতে পারে কখনও? শুধু শুধু পয়সা খরচ করে ওই বেনাবনে আর মুক্তো ছড়াতে যেও না তুমি।"

সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরা যে সবাই আকাট মুখ্যু বড়লোকের ছেলে এ অত্যুক্তি অবশ্য বাচস্পতি হজম করতে পারে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিমু যে যুক্তিটা দিলে তা তার মনে লাগল।

সিমু বললে, "তাছাড়া আমাদের গ্রামের খবর, আমাদের পাড়ার লোকের খবর আমাদের যত ভালো লাগবে বাইরের লোকের তত লাগবে কেন। বাইরের লোকের কাছে এসব ছড়াবার দরকারই বা কি। এতদিন যেমন ঘরের লোকেদের জন্যে লিখছিলে তেমনি লেখ না। খাতায় না লিখে খবরের কাগজের মতো বড় বড় কাগজেই লেখ। ঠাকুরপো সুন্দর করে বর্ডার দেবে রং দিয়ে, আর আমি খুব ভালো করে টুকে দেব। শুনেছি আজকাল একরকম যন্ত্রও বেরিয়েছে তা দিয়ে অনেক-গুলো কপি করা যায়, একবারের বেশি লিখতে হয় না। আমাদের গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা ওই যন্ত্রে কোশ্চেন ছাপতেন দেখেছি।

খোঁজ কর না কত দাম ওই যন্ত্রের। তাতে ছেপে ছেপে 'সুখপুর-পত্রিকা' তাহলে আত্মীয়-স্বজনদেরও পাঠান যাবে।"

সিমুর এ কথাগুলো বেশ লেগেছিল বাচস্পতির।

কিন্তু যতদিন গৃহপতি এবং রঞ্জাবতী বেঁচে ছিলেন ততদিন দু'ভায়ের খেয়াল মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। সব একান্নবর্তী পরিবারে যেমন হয়, নগদ টাকা থাকে কর্তার দখলে। তিনি সকলের ভরণ-পোষণ করেন, অনেক সময় ছেলেদের কিছু হাত-খরচও দেন, বনস্পতির ছবি-আঁকার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম গৃহপতি কিনে দিয়েছিলেন, কিন্তু খেয়াল-খুশিমতো টাকা খরচ করবার সুযোগ সে পায় নি। বাচস্পতি সাইক্লোস্টাইলও কিনেছিল গৃহপতির মৃত্যুর পরে।

গৃহপতির মৃত্যুর পরে আর একটা ঘটনাও ঘটেছিল যাতে ওদের পারিবারিক আবহাওয়ার সুরটা বদলে গিয়েছিল কিছুদিনের জন্য। সর্বস্বান্ত হয়ে বাচস্পতির শ্যালক হেমন্তকুমার ওরফে হিমু এসে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছিল ওদের বাড়িতে। হেমন্তকুমারের পরিবারটাই পরবর্তী কালে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এদের জীবনে। তাই এ লোকটির পরিচয় একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার।

তিন

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার রায় খুব গুণী লোক ছিলেন। তাঁকে বিবিধ জ্ঞানের আকর বললেও অত্যুক্তি হবে না। এঁর পিতা বসন্তকুমার রায় হেডপণ্ডিত ছিলেন গ্রামের স্কুলে। যদিও তিনি বাংলা ভাষায় বেশ বিদ্বান ছিলেন, সংস্কৃত জানতেন, ইতিহাস-ভূগোল-অঙ্কশাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল তাঁর, কিন্তু তবু তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল তিনি বিলিতি উচ্চশিক্ষা পান নি। সেই আক্ষেপটা তিনি মেটাতে চেয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র হেমন্তকুমারকে কোলকাতার স্কুলে পাঠিয়ে। ছেলে বোর্ডিংয়ে থাকত তিনি মাসে মাসে

টাকা পাঠাতেন। ছেলে লিখত, 'স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাইরের বই না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। স্কুলের লাইব্রেরিতে অনেক ভাল বই নেই, আপনি যদি কিছু বেশি টাকা পাঠান—।' বসন্তকুমার পাঠাতেন। ছেলে লিখল, 'কোলকাতার নানা জায়গায় ভালো ভালো বক্তৃতা হয়, আমি সেগুলি প্রায়ই শুনতে যাই, শুনে অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু ট্রামে যাতায়াত করতে বড় বেশি সময় হয়ে যায়, একটা যদি সাইকেল থাকত সুবিধা হত। আমি সাইকেল চড়তে শিখেছি। মাত্র একশ' টাকায় সাইকেল পাওয়া যাচ্ছে আজকাল—।' বসন্তকুমার ধার করে ছেলেকে একশ' টাকা পাঠালেন। শোনা যায় দুহিতারাই নাকি দোহন করে, কিন্তু পুত্র হেমন্তকুমার দোহন ব্যাপারে কান কেটে দিয়েছিল তাদের। পুত্রের বিষয়ে অন্ধ ছিলেন বসন্তকুমার। তার কোন আবদার অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। এমন কি সে যখন উপর্যুপরি দু'বার ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করল, তখনও তাঁর অন্ধত্ব ঘুচল না। তিনি ছেলেকে এক স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আর এক স্কুলে দিতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আলোচনা করতে লাগলেন, 'আজকালকার মাস্টাররা মোটেই ভাল করে পড়ায় না। হিমুর মতো ছেলেকেও যখন তারা পাশ করাতে পারছে না তখন তারা কি দরের মাস্টার বোঝ!' বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নানা জাতের স্কুলে আর বোর্ডিংয়ে ঘুরে ঘুরে বছর কয়েক কাটল হেমন্তকুমারের। সে ম্যাটি-কুলেশন পাশ করতে পারলে না যদিও, কিন্তু শিখল নানা বিদ্যা। এক যোগাশ্রমে গিয়ে সে জানল প্রাণায়াম আর কুম্ভকের রহস্য, নানারকম আসনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখল কি করে কাপড় কাচতে হয়, বাসন মাজতে হয়, রান্না করতে হয়, কি সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে মন্ত্র সফল হয়। টিকি রেখে গেরুয়াও পরেছিল দিনকতক, কারণ ওটাই সে আশ্রমের 'ইউনিফর্ম' ছিল। কিন্তু বেশিদিন মন টিকল না সেখানে। এর পর সে চলে এল শান্তিনিকেতনে। বেশ কিছুদিন ছিল সেখানে। নাচ, গান, অভিনয় আর চিত্রকলার জ্ঞানরসে যখন তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেল তখন আর সেখানে থাকা প্রয়োজন মনে করল না সে। ছুটল

গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের দিকে। সেখানে যদিও তেমন কলকে পায় নি কিন্তু হালও ছাড়ে নি সে। কোন এক গুজরাটী পরিবারের সঙ্গে ভাব করে সবরমতীর আশপাশে কাটিয়েছিল কিছুদিন। গান্ধী-তত্ত্বের নির্যাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করে তবে ফিরেছিল। তারপর যে স্কুলে গিয়ে জুটল সেখানকার কর্তৃপক্ষদের ধারণা লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা, বক্সিং, কুস্তি, জুজুৎসু এইসব না শিখলে দেশোদ্ধার হবে না। সেখানে গিয়ে এই সবও শিখল সে কিছুদিন। কিন্তু ওসব বিষয়ে তাদৃশ পটুতা ছিল না তার, ভালও লাগত না খুব। এই সময়েই উদীয়মান একজন সাহিত্যিকের সঙ্গলাভ ঘটেছিল তার কপালে কিছুদিন। দু' একজন রাজনৈতিক নেতার তল্পিবাহক হবার সুযোগও পেয়েছিল সে। ম্যাট্রিকুলেশন সে পাশ করতে পারে নি তা ঠিক, কিন্তু কৃষ্টি-লাভ করেছিল সে, এবং ওরই জোরে হয়তো সে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু হয়েও পড়ত। আজকাল সুযোগও তো হয়েছে নানারকম। কোনও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের নেতা, কিংবা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচার-সচিব, কিংবা কোনও বড় লোকের প্রাইভেট সেক্রেটারি, নিদেনপক্ষে কোন উঠতি কাগজের সম্পাদক হওয়ার মতো যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারল না, বিধি বাম হলেন। হঠাৎ মারা গেলেন বসন্তকুমার। মণি-অর্ডার যোগে টাকা আসা বন্ধ হয়ে গেল। কপর্দকহীন হয়ে বিদেশে থাকা চলে না। বিদেশে থেকে চাকরির চেষ্টা করতে গেলেও টাকা চাই, আর হেমন্তকুমার যে সব চাকরির যোগ্য, তা দরখাস্ত করলে মেলে না, তার জন্যে চাই ভড়ং, বিনা পয়সায় ভড়ং হয় না। জনৈক ঘুন-ধরা রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়তো হতে পারত সে। "এদেশের পারিষদ আর বিদেশের বাট্‌লার এই দুই জীবের সমন্বয়ে হয়েছে আধুনিক প্রাইভেট সেক্রেটারি —একথা হেমন্তকুমারই বলেছিল—"ও কাজ যদি পাই চুটিয়ে করতে পারব।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা পেলই না বেচারা। ভড়ং জাহির করে রাজকুমারের প্রাইভেট পছন্দ-কামরায় ঢোকবার মতো অর্থই জোটাতে পারল না সে।

পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সে যখন বাড়ি এল তখন তাকে দেখে ভড়কে গেল সবাই। পায়ে ছেঁড়া চটি, গায়ে জাপানী কিমোনো। যাঁরা কিমোনো দেখেন নি তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কিমোনো একটা আলখাল্লার মতো জিনিস, গলা থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা থাকে, হাত দুটো অত্যন্ত ঢিলে, আমাদের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবির হাতের পিতামহ, তার ভিতর আবার পকেটও থাকে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে এমন অদ্ভুত পোশাক পরে সে কেন এল তা অনেকে জানতে চাইল। হেমন্তকুমার কিছু না বলে কিমোনোটি খুলে একবার দেখিয়ে দিল শুধু। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, তার গায়ে গেঞ্জি পর্যন্ত নেই, পরনে শুধু একটি কৌপীন। হেমন্ত গম্ভীর ভাবে বলল—"বাবা টাকা পাঠাবেন এই আশায় ধার করেছিলাম। আমার যা কিছু ছিল, বই বাক্স, কাপড়-জামা এমন কি গেঞ্জি পর্যন্ত বিক্রি করে সেই ধার শোধ করতে হল। আমার এক আর্টিস্ট বন্ধু এই কিমোনোটা না দিলে উলঙ্গ হয়ে আসতে হত।"

বসন্তকুমারও ধার করেছিলেন অনেক। হেমন্তকুমারকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্যেই ধার করতে হয়েছিল তাঁকে। কিছু পৈত্রিক জমি ছিল তাঁর। সেই জমি বাঁধা দিয়েই অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তিনি। আশা ছিল হেমন্তকুমার উচ্চশিক্ষা পেয়ে উঁচুদরের চাকরি পাবে, তখন সে-ই ধার শোধ করবে।

শ্রাদ্ধাদি চুকে যাবার পর দেখা গেল মাত্র দু'বিঘে ধানের জমি অবশিষ্ট আছে, আর নেপথ্যে অপেক্ষা করে আছে স্থিরযৌবনা সত্যবতী, তার মায়ের সইয়ের মেয়ে। সই বেঁচে নেই, তাঁর মৃত্যুশয্যায় হেমন্তর মা তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে সত্যবতীকে তিনি পুত্রবধূ করে ঘরে আনবেন।

কালাশৌচ চুকে যাবার পর সত্যবতীর পাণিপীড়ন করে হেমন্তকুমারকে মাতৃসত্য পালন করতে হল। যে ব্যাপারটা সাধারণত সে যুগে ঘটত না, তা-ও ঘটল। বিয়ের একবছর পরেই সত্যবতী তাঁর প্রথম পুত্র প্রসব করলেন। এর কারণ ছিল। বাগদত্তা সত্যবতীকে অনেকদিন

অপেক্ষা করতে হয়েছিল হেমন্তকুমারের জন্য। বিয়ের সময়ই তিনি চতুর্দশী ছিলেন।

হেমন্তকুমার কিন্তু ঘাবড়াল না। দু'বিঘে জমি ছাড়াও তার ভদ্রাসনের পাশে জমি ছিল কয়েক কাঠা। তাতে সে মহা উৎসাহে তরিতরকারি লাগাতে লাগল, ছোটখাটো বাগানই করে ফেললে একটা। সে যখন এক মিশনারি স্কুলে ছিল তখন সেই স্কুলের এক সাহেব মিশনারির কাছে 'কিচেন-গার্ডেন' সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছিল। এই বিদ্যেটা সে কাজে লাগিয়ে ফেললে। সাহেবের কাছ থেকে আহরিত আর একটি বিদ্যেও সে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু খুব বেশি সুবিধা হয় নি তাতে। সাহেব বলেছিলেন, "তোমাদের এমন ফসল ফলাবার চেষ্টা করা উচিত যার বাজার দর বেশি। একমণ ধান বা আলু না ফলিয়ে যদি একমণ কালো জিরে বা মেথি বা ঐরকম কোন দামী মশলা ফলাতে পারো, তাহলে অনেক বেশি লাভ করতে পারবে।" হেমন্ত তার দু'বিঘে জমিতে মেথি ফলাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আশানুরূপ মেথি হয় নি। এর একটি ফল হয়েছিল শুধু, ও অঞ্চলে 'মেথি-হেমন্ত' ব'লে প্রসিদ্ধি হয়েছিল তার। বেশি জমি থাকলে হয়তো অর্থাগমও হত কিন্তু তা হল না। ওই দু'বিঘে জমি ভাগে বিলি করে দিয়ে সে মণ চারেক চালের ব্যবস্থা করে ফেলল। উপার্জনের আর একটা পথও পেয়ে গেল সে। যদিও সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারে নি, তবু স্কুলের কর্তৃপক্ষ বসন্ত-পণ্ডিতের ছেলেকে স্কুলেই কাজ দিয়ে দিলেন একটা। ড্রিল-মাস্টার করে বাহাল করে নিলেন তাকে। একটা স্কুলে থাকতে বয়েজ স্কাউটে ভরতি হয়েছিল সে, সুতরাং ড্রিলের ব্যাপারটা জানত কিছু কিছু। এর থেকে গোটা তিরিশেক টাকা পেত। সব মিলিয়ে সংসারটা তার চলে যাচ্ছিল কোনক্রমে। বছর দুই পরে হঠাৎ ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন হলেন তার উপর। গৃহপতির গৃহিণী রঞ্জাবতীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল ঘটনাচক্রে।

হেমন্তদের বাড়ির কাছেই যে গঙ্গা ঘাটটি, তার নাম উমা-ঘাট। জনশ্রুতি, বহু পূর্বে, কলিকালের গোড়ার দিকে, স্বয়ং উমা নাকি এই ঘাটে

ঘাসে স্নান করেছিলেন। ঘাটের কাছেই যে বহুপ্রাচীন শিবমন্দিরটি আছে স্নানান্তে উমা নাকি সেই মন্দিরে প্রবেশ করে শিবার্চনাও করেছিলেন। কাছাকাছি যতগুলি ঘাট ছিল তার মধ্যে এই ঘাটটির মাহাত্ম্য ছিল সবচেয়ে বেশি। অনেক দূর থেকে লোকে এই ঘাটে স্নান করতে আসত, বিশেষ করে শিবরাত্রির সময়।

রঙ্গাবতী সেবার খুব ভোরে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল শিবের শেষ প্রহরের পূজোটা তিনি ওই প্রাচীন শিব-মন্দিরেই করবেন। পালকি যখন শিবমন্দিরের কাছে, থামল তখনও বেশ অন্ধকার রয়েছে। ঘাটে লোকজন কেউ নেই, মন্দিরে কিন্তু আলো জ্বলছে দেখলেন, কপাটটি ভেজানো আছে। রঙ্গাবতী পালকি থেকে নেবে মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন; কপাটটি একটু খুলে দেখলেন ভিতরে কে আছে। দেখেই চমকে উঠলেন তিনি। তাঁর মনে হল স্বয়ং উমাই বসে শিব-পূজা করছে। ফুটফুটে সুন্দরী একটি কিশোরী, হাত জোড় করে চোখ বুজে বসে আছে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে। সিমুকে সেই প্রথম দেখলেন তিনি, দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তখনই অবশ্য তাকে পুত্রবধূরূপে কল্পনা করেন নি তিনি। কিন্তু তারপর পরিচয় হল, জানলেন যে ওরা পালটি ঘর, ভাল বংশ, খুব গরীব বলেই বিয়ে হয় নি এতদিন। কিছুদিন পরে ঘটকী পাঠালেন তিনি ওদের বাড়িতে। যথা-বিধি সব হল। বিয়ে হল কিন্তু বছরখানেক পরে। নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। সামনে মল-মাস ছিল, তারপর পড়ল গৃহপতির পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ, রঙ্গাবতীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মারা গেলেন, তাইতে গেল কিছুদিন, তারপর পড়ল জ্যৈষ্ঠ মাস, বড় ছেলের বিয়ে ও-মাসে হয় না। কিন্তু কথা যখন পাকা হয়ে গেছে, বিশেষ করে রঙ্গাবতীর যখন পছন্দ হয়েছে মেয়েটিকে, তখন আটকাল না কিছু, বিয়ে হয়ে গেল। রঙ্গাবতীর পছন্দ হয়েছিল সিমুকে, কিন্তু গৃহপতির পছন্দ হল হিমুকে। মেথি-হেমন্তর কথা তিনি আগেই শুনেছিলেন, ছোকরার নতুন-কিছু-করবার ঝোঁকটা ভালো লেগেছিল তাঁর। নিজেও তো তিনি একদিন লবঙ্গ-লতা সোমলতার

চাষ করবার জন্যে অনেক অর্থব্যয় করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল মেথি-হেমন্তর সঙ্গে আলাপ করবেন একদিন গিয়ে। বিবাহের সূত্রে আলাপ হল এবং আলাপ করে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। লোককে মুগ্ধ করবার শক্তি হেমন্তকুমারের ছিল।

প্রথমেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি তার বড় ছেলের নাম শুনে। ওই একটি মাত্রই ছেলে হয়েছিল তখন তার। ছেলের সে নাম রেখেছিল 'লাঠি'। ছেলের এমন অদ্ভুত নাম কেন রাখা হল গৃহপতি হেসে জানতে চেয়েছিলেন।

"দেখুন",—উত্তরে বলেছিল হেমন্তকুমার—"জীবনযুদ্ধের জন্যে অস্ত্রশস্ত্র থাকা চাই তো। বড় লোকেদের অস্ত্র টাকা, আর আমাদের অস্ত্র আমাদের ছেলেমেয়েরা। ওরাই নিজেদের শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, ঠেকিয়ে রাখবে দারিদ্র্য।"

গৃহপতি তর্ক করেন নি, মুগ্ধ হয়েছিলেন।

হেমন্তকুমারও তার মত পরিবর্তন করে নি। লাঠি, সোঁটা, বল্লম, কিরিচ, বন্দুক এই সব নাম রেখেছিল ছেলেমেয়েদের। এমন কি দরকার হলে শেষের দিকে ইঁট, পাটকেল, ঝাড়ু, চড়, ঘুঁষি এসব নাম ব্যবহার করতেও আপত্তি ছিল না তার। বম্, এটম্ বম্ প্রভৃতি আধুনিক মারণাস্ত্রের প্রতি তার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। সে বলত, ওসব বড়লোকদের অস্ত্র, গরীবের নয়। শেষের দিকে কিন্তু নাম সংগ্রহ করতে বেগ পেতে হয়েছিল তাকে, কারণ প্রতি বছরই তার হয় একটি ছেলে না হয় একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তার ছেলেমেয়েদের বয়সের ক্রম-অনুসারে সাজিয়ে একসারে দাঁড় করিয়ে দিলে একটি সমকোণী ত্রিভুজের আকার ধারণ করত, আর ত্রিভুজটি ছিল ক্রম-বর্ধমান।

গৃহপতিদের সঙ্গে হেমন্তকুমারের যখন আত্মীয়তা হল তখন তার যে ক'টি ছেলে-মেয়ে ছিল তারা খুব প্রিয় হয়ে উঠল বনস্পতির। এদের নিয়ে মেতে উঠল তার শিল্পী মন। তাদের নানা ভঙ্গীতে বসিয়ে ছবি আঁকতে লাগল সে। শিল্পী মাত্রেরই ফাই-ফরমাশ করবার মতো লোক হাতের কাছে থাকলে সুবিধা হয়। বিবাহের পূর্বে শীতল কুমোর আর

হুরি পোটোর বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ কাজ করত। বিয়ের কিছুকাল পরে সরস্বতীও করেছিল। কিন্তু হিমু পাকাপাকিভাবে এদের পরিবারভুক্ত হবার আগেই লাঠি-সোঁটা-বল্লম-বন্দুকেরা বনস্পতির পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ছেলেগুলি যেমন ফুটফুটে, তেমনি চপটটে আর তেমনি বাধ্য। দু'তিনজন সর্বদাই বনস্পতির কাছে থাকত।

সুতরাং তিনদিক দিয়ে হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গ অধিকার বিস্তার করল গৃহপতির পরিবারে। হেমন্ত অধিকার করল গৃহপতির হৃদয়, সিমু রঞ্জাবতীর আর ছেলেমেয়েরা বনস্পতির।

হেমন্তকুমার কোলকাতায় যে চাকরিটা পায় নি, সুখপুরে এসে বস্তুত সেই চাকরিটাই পেয়ে গেল। কার্যত গৃহপতির প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়ে উঠল সে। বাড়ির মালিকের প্রাইভেট সেক্রেটারি হলে যে ধরনের সবিনয় সবজান্তা-ভাব আচারে ব্যবহারে কথাবার্তায় প্রকট রাখা উচিত, আসল মনোভাবটি চেপে রেখে অথচ সোজাসুজি মিথ্যাভাষণ না করে গোল কথার সহায়তায় যেভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতিগুলো এড়িয়ে যেতে হয় তার শিল্পায়িত কৌশল ভালভাবেই আয়ত্ত ছিল হেমন্তকুমারের। উদারহৃদয় খামখেয়ালী গৃহপতির মনের নৌকাটির হালে এতদিন বসে-ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী রঞ্জাবতী। তাঁর পাশে কখন যে হেমন্তকুমার এসে বসল তা কেউ টেরও পেল না। নাই পেয়ে হেমন্তকুমারের অন্তর্নিহিত রূপটি কিন্তু প্রকাশ পেতে লাগল ক্রমশ। যদিও সাংসারিক ব্যাপারে বা পারিবারিক আলোচনায় সে যখন ফোড়ন দিত তখন তা তত অসঙ্গত মনে হত না কারও, কারণ সে সিমুর দাদা, আর সে ফোড়নটাও এমনভাবে দিত যে উগ্র ঝাঁজ লাগত না কারো নাকে। এই ফোড়ন-দেওয়ার মধ্যেই যে পরশ্রীকাতরতার ছোঁয়াচ-লাগা একটা মুরুব্বিয়ানা প্রচ্ছন্ন থাকত তা অত লক্ষ্যও করেনি কেউ। বরং সে যে প্রত্যেক ব্যাপারের আর একটা দিক দেখতে পায় এজন্য প্রশংসাই করতেন তাকে গৃহপতি। ক্রমশ ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে হিমুকেই সংসার-তরণীর কর্ণধার বলে স্বীকার করে নিল সবাই। একটু গোল বেধেছিল

অবশ্য বাচস্পতিকে নিয়ে। গৃহপতি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি কখনও, কিন্তু হেমন্তর মনে হল এটা অন্যায় হচ্ছে। এমন অবাধ স্বাধীনতা অনিষ্টকর। তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছিল সে। বলা বাহুল্য, হিতৈষীর মতোই—(ছদ্মবেশে কথাটা বড্ড বেশি রূঢ় হবে বলে সেটা আর ব্যবহার করলাম না) হিতৈষীর মতোই এ চেষ্টা করেছিল।

গৃহপতিকে কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিল, "বকু বন্নু দুজনেই জিনিআস, কিন্তু এই ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকলে ওরা মাটি হয়ে যাবে। ভালো গাছের পক্ষে যেমন উপযুক্ত পরিবেশ আর সার দরকার, জিনিআসের পক্ষেও তেমনি। বিলেতে কিংবা কন্টিনেন্টে যদি ওদের পাঠাতে পারতেন দেখতেন কি কাণ্ড করত ওরা।"

গৃহপতি শুনে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, "দেখ, লোক দেখিয়ে পাঁচজনকে তাক লাগিয়ে কিছু একটা কাণ্ড করা, আর গ্রামে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা দুটো আলাদা জিনিস। ওরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক এইটেই আমরা চেয়েছি। ওদের মা তো ওদের ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই ওদের কোলকাতাতেও পাঠাই নি—"

এর একটা জুৎসই জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"গুরুদেবের সেই বিখ্যাত কবিতাটা নিশ্চয় পড়েছেন আপনি। যার শেষ দু'লাইন হচ্ছে—

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে', মানুষ করনি'।"

"পড়েছি। কিন্তু কবিতা কবিতাই, যখন পড়া যায় বেশ লাগে। কিন্তু পরের লেখা কবিতা অনুসারে নিজের জীবনকে গড়তে গেলে অনেক সময় মুশকিলে পড়তে হয়। আর কবিরা তো এক কথা বলেন না সব সময়। ওই রবীন্দ্রনাথই তাঁর অনেক লেখায় আবার অন্য কথাও বলেছেন। লোলুপ হয়ে বিদেশের ঐশ্বর্যের দ্বারে মাথা লুটিয়ে দিতে আত্মসম্মানে বেধেছে তাঁর।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নি-বচন
তাই আমাদের দিয়ো
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
তোমার উত্তরীয়।”

হেমন্ত তর্ক করতে পারত, কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল গৃহপতি রবীন্দ্রনাথের খানিকটা কবিতা আবৃত্তি করে গেল শুনে। এটা সে প্রত্যাশা করে নি। তার ধারণা ছিল সুখপুর গ্রামে অন্তত রবীন্দ্রকাব্যের সে-ই অদ্বিতীয় সমঝদার। হঠাৎ সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, “হার মানছি আপনার কাছে। আপনি যে এত পড়েছেন, এতো ভেবেছেন এসব বিষয়ে, তা আমার ধারণা ছিল না।” শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়বার ভান করল হেমন্ত। এতে গৃহপতির মনের দরবারে তার আসন আরও পাকা হয়ে গেল।

এখানে আর একটি কথাও কিন্তু বলা দরকার। গৃহপতির কাছে যদিও সে বাচস্পতি বনস্পতিকে ‘জিনিআস’ বলে উল্লেখ করত, কিন্তু আসলে মনে মনে তার ধারণা ছিল, দুটি ছেলেই গবেট, বাপের পয়সার শ্রাদ্ধ করছে ঘরে বসে। বাইরের দুনিয়ার কোনও খবর রাখে না, লেখাপড়ারও ধার ধারে না বিশেষ, কেবল বড়লোকের ছেলে বলে এই নিস্তরু-পাদপ দেশে এরণ্ড দুটি দ্রুম ব’লে চালিয়ে যাচ্ছে নিজেদের। তার অনুকম্পা হত, মনে হত বেচারারা অন্ধ, কি যে করে যাচ্ছে তা তারা জানে না। একজন সুরকি-গুঁড়ো আর হলুদ-গুঁড়ো দিয়ে ছবি আঁকছে, আর একজন সেই খবরটা ঘটা করে হাতের লেখা ‘সুখপুর-পত্রিকা’য় লেখাচ্ছে নিজের বউকে দিয়ে। আর তাই নিয়ে বাহবা বাহবা করছে সবাই।

বাচস্পতি-বনস্পতিকেও সে এর হাস্যকর দিকটার সম্বন্ধে সচেতন করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হয় নি।

“দেখ হিমুদা”—বাচস্পতি বলেছিল—“উপনিষদে ব্রহ্মের বর্ণনা

প্রসঙ্গে এক ঋষি বলেছেন, 'অণোরণীয়ান মহতো মহীয়ান'। যে ব্রহ্ম বিরাটের মধ্যে মহীয়ান, তিনি অণুর মধ্যেও সমান সার্থক। ব্রহ্ম যদি অণুর মধ্যে সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তাহলে আমরা এই এত বড় গাঁয়ের মধ্যে নিজেদের সার্থক করতে পারব না? কি বলছ তুমি। আর এই বা তোমার কেমন কথা যে ছাপা না হলে লেখার কোন দাম নেই। আমাদের দেশের বড় বড় বই যখন লেখা হয়েছিল তখন দেশে ছাপাখানা ছিল না। কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত' ছাপা মাসিকপত্রে বার করেন নি বলে কি কোনও ক্ষতি হয়েছে?"

"কেন ক্ষতি হয় নি জানো? ছাপাখানা তখন ছিল না বটে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ছিল যে। বিক্রমাদিত্যের সভা না থাকলে কালিদাসকে চিনত কে?"

"না চিনলেও ক্ষতি ছিল না। কালিদাস তাঁর মেঘদূতের রসিক সমঝদার পেয়ে যেতেনই।"

"আর একটা কথা ভেবে দেখেছ? ছাপাখানা না থাকাতে কত কালিদাস হারিয়ে গেছে—"

"তাতেই বা ক্ষতি কি। হারিয়ে যাওয়াটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। এখন তো ছাপাখানার অভাব নেই, কিন্তু সব কালিদাসরাই কি জায়গা পাচ্ছে? আর যারা পাচ্ছে তারা সবাই কি কালিদাস? সত্যিকার প্রতিভার কদর যে রসিক সমাজে সেখানে আসল কালিদাসরা জায়গা পাবেই, তা তাদের লেখা ছাপা হোক বা নাই হোক। বৃহত্তর বেরসিক সমাজে হয়তো তারা পাত্তা পাবে না"—তারপর একটু থেমে বলেছিল—"কে জানে হয়তো তাও পাবে শেষ পর্যন্ত। আমি এ বেশ আছি।"

"এই পাড়াগাঁয়ে তোমার ও হাতের লেখা পত্রিকার মর্যাদা কে দেবে বল। আমার মতে জর্নালিজ্‌ম্ যদি করতে চাও, কোলকাতায় যাও। সেখানে অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, নিখিলদা আছেন, নরেশদা আছেন, তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন। এখানে এই গরুর পালের মধ্যে—"

কথাটা হেমন্ত শেষ করল হাত ছুটো উলটে এবং মুরুব্বিয়ানাসূচক হাসি হেসে।

বাচস্পতির কান ছুটো লাল হয়ে উঠল এ কথা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর বলল, "নিজের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে অতটা হীন ধারণা আমার নেই। আমার 'সুখপুর-পত্রিকা' পড়ে তারা যদি খুশি হয় তাহলেই আমি ধন্য হয়ে যাব। তাছাড়া, আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন, সুখপুর-পত্রিকার প্রধান পাঠিকা আমার মা। তাঁকে খুশি করবার জন্যেই ছেলেবেলায় ওটা আরম্ভ করেছিলাম। যা তাঁর ভাল লেগেছে তা কোলকাতার কোন সবজান্তা সহকারী সম্পাদকের বা আধুনিক ময়ুরপুচ্ছধারী বায়সদের ভাল লাগল কিনা এ জানবার আমার উৎসাহ নেই—"

হেমন্তকুমার অনুভব করল বাচস্পতি যে রকম উঁচু পরদায় সুর বেঁধেছে তার চেয়ে বেশি চড়াতে গেলে তার ছিঁড়ে যাবে, অর্থাৎ মনোমালিন্য হবে। সেটা করা সমীচীন মনে হল না তার। সুতরাং চেপে গেল।

দিনকয়েক পরে বনস্পতির কাছে আবার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিল সে। শুনে বনস্পতি চটে গেল, যা বললে তা অপমানসূচকই, কিন্তু হেমন্ত সেটা গায়ে মাখে নি।

বনস্পতি বলল, "আপনি তো আমাদের কোলকাতা পাঠাতে চাইছেন। কিন্তু নিজে তো এতদিন কোলকাতাতেই ছিলেন, কি কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে এসেছেন বলুন।"

সাধারণ লোক হলে এ কথায় চটে উঠত, কিন্তু হেমন্তকুমার চটল না। তার মনে বরং অনুকম্পা জাগল এই কূপমণ্ডুকের সংকীর্ণ দৃষ্টি-পরিধি দেখে। কিন্তু মুখের কথায় বা চোখের দৃষ্টিতে তার মনোভাব প্রতিফলিত হল না।

সে হেসে বললে, "আমার সঙ্গে কি তোমাদের তুলনা হয়। তোমরা হলে 'জিনিআস', যাকে বাংলা ভাষায় বলে 'প্রতিভা'। সোনা বা হীরে যদি ওস্তাদ স্যাকরার হাতে পড়ে তবেই তা বহুমূল্য অলঙ্কারে পরিণত

হতে পারে, লোহার ভাগ্যে তা কি সম্ভব? আমি লোহা, বড় জোর পিতল—"

বনস্পতি আর কোন উত্তর দেয় নি। সে নূতন একটা সরস্বতী আঁকতে ব্যস্ত ছিল। কেবল দু'খানি পায়ের পাতা আর সেই পাতা দুটি ঘেরে অপরূপ একটি শাড়ির পাড়, মনে হচ্ছিল নক্ষত্র-খচিত এক টুকরো আকাশ যেন ওই পায়ের পাতা দু'টি ঘেরে ধন্য হয়েছে।

হেমন্তকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, তারপর মুচকি হেসে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত তাকে উপলব্ধি করতেই হল এই আধ-পাগলা ছেলে দুটিকে সে যা ভেবেছিল তা তারা নয়। বোলচাল দিয়ে ওদের বিচলিত করা যাবে না, পুকুরে চুনোপুঁটি ছাড়া মাছ নেই এ কথা শতবার বললেও ওরা এই এঁদো পুকুর-পাড় ছেড়ে উঠবে না, দামী ছিপ ফেলে ঠায় বসে থাকবে ফাৎনার দিকে চেয়ে। থাক্—। সে যতক্ষণ আছে যতটা পারে ওদের উপকারের চেষ্টাই করে যাবে। হাজার হোক, আত্মীয় তো!

চার

গৃহপতি আর রঙ্গাবতীর মৃত্যুর পর যখন বাচস্পতি আর বনস্পতি বিষয়ের মালিক হল তখন একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠল সকলের কাছে, যে আইনত ওরা মালিক বটে, কিন্তু কার্যত মালিক সাবু মিত্তির (ভাল নাম, সর্বেশ্বর মিত্র) আর ভূষণ চক্রবর্তী। সাবু মিত্তির গৃহপতির প্রাক্তন কর্মচারী ধনেশ্বর মিত্তিরের একমাত্র ছেলে। ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর বাচস্পতি তাকে বাহাল করেছিল বিষয়-সম্পত্তি দেখা-শোনা করবার জন্য। বিষয়ের সমস্ত 'ঝক্কি'টা সাবুকেই পোয়াতে হত। বাচস্পতি ব্যস্ত থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। সীমন্তিনীরও অন্য দিকে মন দেবার অবসর ছিল না। তাকে সকালে, বিকালে, কখন-কখনও রাত্রেও 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে হত। শ্রুতি-লিখনের মতো হত ব্যাপারটা। বাচস্পতি বলে যেত, সীমন্তিনী লিখত। সুখপুর-

পত্রিকায় থাকত প্রধানত সুখপুরের এবং আশপাশের গ্রামের খবর। আর থাকত একটি প্রবন্ধ, কখনও কখনও কবিতা। খবর সংগ্রহের জন্য নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল একদল। গ্রামেরই কিশোর ছিল কয়েকটি, ভিন্ন গ্রামেরও ছিল। খবর পিছু এক আনা করে পেত তারা। খবর এনে প্রথমে দিতে হত সাবু মিত্তিরকে। সেই প্রথমে খবর বাছাই করত। সে বাছাই করে যে খবরগুলি বাচস্পতিকে দিত, সেগুলি বাচস্পতি আবার যাচাই করে দেখত অকুস্থলে গিয়ে। এজন্য ছোট একটি টাট্টু ঘোড়া রেখেছিল সে। খবর সত্য হলে সেটি প্রকাশিত হত সুখপুর-পত্রিকায়। সুখপুর-পত্রিকার দু'কপি সীমন্তিনী খুব ভাল করে নিজের হাতে লিখত, আর খান পঞ্চাশেক ছাপা হত সাইক্লোস্টাইলে। ছাপা হবার পর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরিত হত সেগুলি। হাতে হাতে কিছু কিছু পাঠিয়ে দেওয়া হত, কিছু বা ডাকযোগে। সাবু মিত্তির হিসাব করে বলেছিল এর জন্য মাসে প্রায় পঁচিশ টাকা খরচ হয়। কম খরচেও হতে পারত, কিন্তু বাচস্পতি দামী কাগজ ব্যবহার করত বলে তা আর হত না। সাবু এ বিষয়ে বাচস্পতির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে ধমক খেয়েছিল।

"দেখ, যদি তামাক-বিড়ি খেতাম, তাহলেও এ খরচটা হত। তখন কি তুই বলতে আসতিস অম্বুরী তামাক না খেয়ে দা-কাটা তামাক খান তাহলে খরচ কম হবে? এটা একটা দরকারী জিনিস, এর জন্যে ন্যায্য খরচ করতে হবে বইকি। ওতে কুণ্ঠিত হলে কি চলে?"

গৃহপতি-রঞ্জাবতী যে বাড়িতে বাস করতেন সেই বাড়িটাই বাচস্পতি নিয়েছিল। বনস্পতি থাকত সৈকত-কাননে, সেখানে যে বাড়িখানা ছিল তাতেই কুলিয়ে গিয়েছিল তার। হেমন্তকুমার যখন সপরিবারে এসে এদের আশ্রয়-প্রার্থী হল তখন একটু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, কোথায় ওদের থাকতে দেওয়া যায় এই নিয়ে। স্থানাভাবের প্রশ্ন নয়, কারণ গৃহপতির বাড়ি প্রকাণ্ড বাড়ি, তাতে স্থানাভাব হত না, কিন্তু সীমন্তিনীই রাজী হলেন না।

বললেন, "এখানে পত্রিকার কাজকর্ম নিয়ে তুমি সর্বদাই ব্যস্ত থাক। ছেলেমেয়ের হট্টগোল হয়তো ভাল লাগবে না তোমার, মনে মনে বিরক্ত হবে, অথচ মুখে কিছু বলতে পারবে না। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গোলমাল করবেই। তাছাড়া আমাকেও থাকতে হবে তোমাকে নিয়ে, ওদের দেখাশোনাও করতে পারব না। বৌদি হয়তো এতে কিছু মনে করতে পারেন। তার চেয়ে ওদের আলাদা একটা বাড়িতেই ব্যবস্থা করে দাও না। 'জাহ্নবী-নিবাসে'র দোতালাটা তো খালি পড়ে আছে। নীচের তলার একটি মাত্র ঘরে সাবু-ঠাকুরপোর আপিস। ওই বাড়িতেই ওরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। রান্নাঘরও আছে, সামনেই গঙ্গা—"

বাচস্পতি চিন্তা করছিল বিভিন্ন আলোকে।

বলল, "সেটা কি ভালো দেখাবে। আত্মীয় স্থল, নিন্দে করবে না তো লোকে। বাবা মা বেঁচে থাকলে এই বাড়িতেই থাকতে দিতেন ওদের, এক হাঁড়িতেই খাওয়া-দাওয়া হত। সৈকত-কাননে বন্ধু যে বাড়িটাতে আছে সেখানে তো প্রচুর জায়গা, চারিদিকে বাগান, ছেলেগুলো খেলা করে বাঁচবে। ঘরও অনেকগুলো আছে বাড়িটাতে—"

"কিন্তু ঠাকুরপো যে একাই একশ'। কখন যে কোন্ খেয়ালে থাকে ঠিক নেই। ছেলেপিলের 'ঝক্কি' ওর ওপর দেওয়া চলবে কি। তাছাড়া, সরু ছেলেমানুষ এখনও—"

জাহ্নবী-নিবাসেই শেষ পর্যন্ত গেল হেমন্তকুমার। বাচস্পতির জমি থেকে তার সমস্ত পরিবারের জন্য চাল ডাল তেল নুন আটা ঘি তরিতরকারি সবই সরবরাহ হতে লাগল। এমন কি মশলা পর্যন্ত। জাহ্নবী নিবাসের পাশে জমি ছিল এক টুকরো, সেইটেতে হেমন্তকুমার লাগিয়ে ফেলল নানাবিধ তরিতরকারি। কিন্তু অবসর বিনোদনই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। সারের বিবিধ বৈচিত্র্য করে কুলি-বেগুনকে মুক্তোকেশী বেগুন করা সম্ভব কিনা, বড় বড় টমাটোকে ছোট ছোট আঙুরের মতো করা যায় কিনা, হেমন্তকুমার এই সব গবেষণা নিয়ে সময় কাটাতো।

আগেই বলেছি, বাচস্পতি থাকত 'সুখপুর-পত্রিকা' নিয়ে। তার জীবন-ধারা অনেকটা এই রকম ছিল। সকালবেলা উঠে স্নানান্তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পূজো করত খানিকক্ষণ। তারপর জলখাবার খেয়ে বাচস্পতি সীমুকে ডাকত—"কই এস এবার, বসা যাক—"

"হ্যাঁ, এই যে যাচ্ছি—"

গুছিয়ে বসতে একটু দেরি হত সীমুর। পানের বাটাটি নিয়ে, ভাল শাড়িখানি পড়ে, মাথার চুলটি বাগিয়ে, খয়ের টিপটি কপালের ঠিক মাঝখানটিতে নিপুণভাবে এঁকে তবে সে আসত। তার ছেলে হয় নি, হবার আশাও নেই। জ্যোতিষী, ডাক্তার কেউ আশা দেয় নি। তার সমস্ত নারী-সত্তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল ওই 'সুখপুর-পত্রিকা'কে কেন্দ্র করেই। পুজোর ঘরে ঢোকবার আগে সে যেমন স্নান করে গরদ পরে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নিত, লেখবার ঘরে ঢোকবার আগেও তেমনি নিজেকে একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে না নিলে তৃপ্তি হত না তার। তাকে দেখলে মনে হত সে যেন প্রিয়-সম্ভাষণে যাচ্ছে। প্রশস্ত চৌকির উপর একটি গালিচা পাতা, তার উপর সুদৃশ্য একটি কাঠের ডেস্ক। সেই ডেস্কের সামনে এসে বসত সীমন্তিনী কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। বালির কাগজের উপর পেন্সিল দিয়েই প্রথমে সে শ্রুতি-লিখন লিখে নিত। বাচস্পতি সংবাদগুলি লিখে রাখত আগের রাত্রে। সামনে একটি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেইগুলি সে পড়ে যেত, আর সীমন্তিনী শুনে শুনে টুকত সেগুলি। টোকা শেষ হলে বাচস্পতি সেগুলির বানান ভুল সংশোধন করত। বাচস্পতির ভাষা একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল বলে বানান ভুল অনেক হত। বাচস্পতির সংশোধনের পর আবার সেগুলি পরিষ্কার করে টুকতে হত সীমন্তিনীকে। সুখপুর-পত্রিকার একটি সংখ্যা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি।

প্রথমেই বড় অক্ষরে হেডলাইন :—ধর্ম-ষাঁড়ের বিপুল আক্রমণে মোগলপুরের হানিফ মিঞার সংজ্ঞা-লোপ। এর নীচে ছোট ছোট অক্ষরে সংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

"বাঘনা গ্রামের হরিহর মণ্ডল পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে বৃষটি উৎসর্গ

করিয়াছিলেন তাহা এখন একটি বিশালবপু ষণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তাহার বিরাট আকার, সু-উচ্চ ককুৎ এবং সুবৃহৎ শৃঙ্গদ্বয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। হানিফ মিঞার ঘন কুঞ্চিত দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে, গুম্ফ নাই। তদুপরি তিনি একটি ঘোর রক্তবর্ণ জোব্বা পরিয়া ঈষৎ কুব্জ হইয়া হাঁটেন। তাঁহার আকৃতি এবং পোশাকই সম্ভবত উক্ত ষণ্ডটির ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়াছিল। হানিফের পুত্র ইসমাইল থানায় খবর দেয়। থানার দারোগা মৃত্যুঞ্জয় বসাক মহাশয় কয়েকটি কনেস্টবল লইয়া দুষ্ট ষণ্ডটিকে গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। দুইটি কনেস্টবলকে জখম করিয়া ষণ্ডটি লাফাইতে লাফাইতে গিয়া যখন 'বুড়ীর জঙ্গলে' আত্মগোপন করিল তখন বসাক মহাশয় হাল ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, হিন্দু হইয়া তিনি ধর্মের ষাঁড়ের উপর গুলি চালাইতে পারেন না। মানুষ হইলে পারিতেন, কিন্তু গরুকে গুলি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। মনে হয় তিনি শুধু পরলোকের ভয়েই ভীত নহেন, ইহলোকের ভয়ও তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছে। তাঁহার আশঙ্কা হইতেছে গরুকে গুলি করিয়া মারিলে স্থানীয় হিন্দুরা বিদ্রোহ করিবে, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও হইয়া যাইতে পারে। হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁহার চাকুরি লইয়া টানাটানি পড়িবে। তিনি সদরে খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

কল্পনা করছি শ্রীমতী সীমন্তিনী ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে—"বড্ড শক্ত শক্ত কথা দিয়ে লিখেছ এটা। ককুৎ মানে কি ?"

"ষাঁড়ের পিঠের উপর যে উঁচু ঢিবিটা থাকে তাকে ককুৎ বলে।"

"আজ বোধহয় অনেক বানান ভুল হয়ে গেল। এত সব শক্ত শক্ত কথা আমি লিখতে পারি কি !"

"তুমি লিখে যাওনা, আমি তো সব দেখে দেব আবার।"

এ সংবাদটির শেষের অংশটি আরও কৌতুকপ্রদ।

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কি নির্দেশ দিয়াছেন তাহা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই, কিন্তু একটি অদ্ভুত উপায়ে সমস্যাটির সমাধান হইয়া গিয়াছে।

ষাঁড়টি হরি মণ্ডলের দৌহিত্রী খুকুমণির অত্যন্ত প্রিয় ছিল! আশ্চর্যের বিষয় সে এই দুর্দান্ত ষাঁড়ের নামকরণ করিয়াছিল 'লক্ষ্মীসোনা'। পুলিশের দল যখন চলিয়া গেল তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে খুকুমণি 'বুড়ীর জঙ্গলের' ধারে গিয়া আস্তে আস্তে কয়েকবার ডাক দিল—লক্ষ্মীসোনা, আয়, আয়। একটু পরেই অরণ্য ভেদ করিয়া বিরাটকায় পুঙ্গবটি বাহির হইয়া আসিল। খুকুমণি তাহার জন্য কিছু খাবার আনিয়াছিল, বাধ্য বালকের মতো সেটি সে আহার করিল। খুকুমণি বলিল, "বড় দুষ্টু হয়েছিস তুই। আয় আমার সঙ্গে—" একটি সামান্য দড়ি তাহার গলায় বাঁধিয়া খুকুমণি তাহাকে টানিয়া টানিয়া নিজেদের বাড়িতে লইয়া গিয়া গোহালে বন্দী করিয়াছে। প্রেমই যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ইহা আর একবার প্রমাণিত হইল।"

ইহার পর অন্য একটি সংবাদ।

"ধীবর বিশু দাস তাহার পুষ্করিণীগুলিতে এবার নূতন 'পোনা' ছাড়িয়াছে। গত বৎসর কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহার পুষ্করিণীগুলিতে সমস্ত মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছিল। অনেকে মনে করেন গ্রীষ্মাধিক্যই তাহার কারণ ছিল। কিন্তু তাহাই যদি হইত অন্য পুষ্করিণীর মাছগুলি অব্যাহতি পাইল কিরূপে? আমাদের মতে তাহার পুষ্করিণীগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখাও প্রয়োজন, কারণ মন্দ লোকের অভাব নাই।"

আর একটি খবর।

"মহাত্মা নৃপতি পাইনের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ভূপতি পাইনের জলসত্র স্থাপন। মহাত্মা নৃপতি পাইন এ অঞ্চলের একজন আদর্শচরিত্র সাধু ব্যক্তি ছিলেন। দম, শম, শৌচ, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি গুণাবলী তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। চাল, ডাল, লবণ, তৈল, সাধারণ মসলা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সামান্য একটি দোকান ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই পরনিন্দাপ্রবণ পল্লীগ্রামেও তাঁহার বিরুদ্ধে একটিও নিন্দাবাক্য কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য

পুত্র ভূপতি পাইন লেখাপড়া শিখিয়া দারোগা হইয়াছেন। বিদেশে চাকুরি করেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডকে পাঁচশত টাকা পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহার জন্মভূমি রায়না গ্রামে গ্রীষ্মকালে যেন একটি জলসত্র স্থাপিত হয়। জলসত্রে শীতল জল, কিছু ভিজানো-ছোলা এবং গুড় যে কোনও পিপাসিত ব্যক্তিকে দান করা হইবে। তাঁহাদের বাস্তুভিটার উপরই সত্রটি স্থাপিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইন প্রকাণ্ড টিনের উপর 'নৃপতি পাইন জলসত্র' এই কথা কয়টি বড় বড় করিয়া লিখাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুইটি বংশদণ্ডের উপর সেটি যথাবিধি টাঙানোও হইয়াছে। আমাদের মতে আর একটু উঁচু করিয়া টাঙাইলে সাইন বোর্ডটি দূরবর্তী পিপাসিত পথিকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত। জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা শ্রীযুক্ত ভূপতি পাইনের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"

আর একটি খবর।

"কাজল দীঘির ঘাটে বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার। এ অঞ্চলে কাজল দীঘির নাম সকলের নিকট সুপরিচিত। এই দীঘিটার পূর্বঘাটে একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বহুকালাবধি পড়িয়া ছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রস্তরটির উপর কাপড় কাচা হইত, বালক-বালিকাদের তাহার উপর দাঁড় করাইয়া জননীরা অনেক সময় তাহাদের স্নান করাইতেন মেয়েরা অনেক সময় তাহার উপর পা ঘষিয়া পা পরিষ্কার করিতেন এ যাবৎ সকলে উহাকে সামান্য প্রস্তরখণ্ড রূপেই গণ্য করিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে হালদার বাড়ির কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীমান কনককান্তি সকলের এই ধারণাটিকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান ইতিহাসের ছাত্র, উত্তর-প্রদেশের কোন এক কলেজে প্রাচীন মূর্তি লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তিনি শ্বশুরবাড়ি আসিয়া উক্ত কাজল দীঘিতে স্নান করিতে যান। প্রস্তরটিকে দেখিয়াই তাঁহার সন্দেহ হয় যে ইহা সামান্য প্রস্তরখণ্ড নহে। তাঁহার নির্দেশক্রমে এবং কাজল দীঘির বর্তমান স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভূপেন দাঁ মহাশয়ের সম্মতি অনুসারে

লোকজন ডাকিয়া পাথরটিকে উল্টাইয়া ফেলা হয়। প্রস্তরটি যে এত গুরুভার তাহা প্রথমে কেহ অনুমান করিতে পারে নাই। পঁচিশটি সমর্থ যুবকের সম্মিলিত চেষ্টায় তবে সেটিকে উল্টানো সম্ভব হইয়াছে। শক্ত মোটা নারিকেল দড়ি বাঁধিয়া উক্ত পঁচিশজন বলিষ্ঠ যুবক সম্মিলিত-ভাবে শক্তি প্রয়োগ করিয়া তবে পাথরটির বিপরীত দিক সকলের দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দৃষ্টিগোচর হইবার পরও প্রথমে কিছু বোঝা যায় নাই। শৈবাল, পঙ্ক, গুগলি, শামুক প্রভৃতি জলমগ্ন অংশটিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পরিষ্কার করিবার পর দেখা গেল তাহা চমৎকার একটি বিষ্ণুমূর্তি। শ্রীবিষ্ণুর মুখের স্মিত হাস্যটি সত্যই সুন্দর। কৃষ্ণপ্রস্তরের উপর বিবিধ কারুকার্যও অপূর্ব। অধ্যাপক কনককান্তি মূর্তিটি নিজের গবেষণাগারে লইয়া গিয়াছেন। গ্রামের মহিলামহলে কিন্তু একটু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। যে সব মহিলা প্রায় প্রত্যহই বিষ্ণু-মূর্তির পৃষ্ঠের উপর পদাঘাত করিতেন তাঁহারা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। বিনু তৈলকারের পুত্রটি সহসা জ্বরাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে আশঙ্কা আরও বাড়িয়াছে। উক্ত বালক নাকি নিয়মিতভাবে বিষ্ণু-মূর্তিটির পৃষ্ঠের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করিত। আমাদের মতে ইহাতে আশঙ্কার কোন সঙ্গত কারণ নাই। অজ্ঞাতসারে পাপ করিলে ভগবান শাস্তি দেন না। পাপকে পাপ জানিয়া তাহাতে যদি কেহ লিপ্ত হয় তবেই তাহা শাস্তিযোগ্য।"

এই নমুনা ক'টি থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন 'সুখপুর-পত্রিকা' কি ধরনের পত্রিকা ছিল। এ পত্রিকার আর যে দোষই থাক এর প্রধান গুণ ছিল যে সংবাদগুলি একটিও মিথ্যা নয়। প্রতিমাসে দু'টি করে সংখ্যা বেরুত। পূর্ণিমা সংখ্যা আর অমাবস্যা সংখ্যা। ঠিক নির্দিষ্ট দিনে বেরুত। আর এই নিষ্ঠার জন্য খাটতে হত দু'জনকেই। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তির তদারক করা বাচস্পতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সাবু মিস্ত্রির যা করত তাই হত।

চার

সাবু মিত্তির রোগা পাতলা লোক, একটু মিনমিনে গোছের, গলার স্বরও সরু, চোখে বেমানান গোছের বড় চশমা। কিন্তু হিসাবপত্রের ব্যাপারে একেবারে নিখুঁত। এই জন্যই বাচস্পতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পেরেছিল তার উপর। তার প্রধান কাজ ছিল বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, কত আয় কত ব্যয় তার হিসাব রাখা এবং নিট্ আয়ের অর্ধাংশ বনস্পতির তত্ত্বাবধায়ক ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে জমা করে দেওয়া। বাচস্পতি আর বনস্পতি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বিষয়ের সম্পূর্ণ ভার সাবু মিত্তিরের উপরেই দিয়েছিল, সে যা করত তাই হত। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর উপর ভার ছিল বনস্পতির আয়ের অংশটুকু বুঝে নেওয়া। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় যাকে 'এক্জিকিউটিভ' বলে সাবু মিত্তির ছিল তাই আর ভূষণ চক্রবর্তী ছিল 'অডিট্'। ভূষণ চক্রবর্তীকে লোকে আড়ালে 'ভীষণ চক্রবর্তী' বলে ডাকত। রেগে গেলে তার মুখে কিছু আটকাত না। লোকের গায়ে হাত তুলতেও কসুর করত না সে। গায়ে শক্তি ছিল অসুরের মতো। মুগুর ভাঁজত রোজ। এহেন লোকের কাছে হিসাব দাখিল করা ক্ষীণ-প্রাণ সাবু মিত্তিরের পক্ষে সহজ ছিল না। দু'একবারের অভিজ্ঞতার পর সাবু আর তার সামনাসামনি বসে হিসাব বুঝিয়ে দিতে সাহস করত না। ভূষণ চক্রবর্তীর কঠোর নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বসতেই ভয় করত তার। ভূষণ চক্রবর্তীর চোখ দুটো বড় বড় আর সর্বদাই মনে হত সে দুটো বুঝি এখনই ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। দু'দিকের রগে কুটিল স্ফীত শিরা ছিল, সাবুর মনে হত সেগুলোও যেন মাঝে মাঝে নড়া-চড়া করে, হয়তো হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে চামড়া ফুঁড়ে। কণ্ঠস্বরও কমনীয় ছিল না। ঝাপসা, ধরা-ধরা কর্কশ কণ্ঠে সে যখন কাউকে গালাগালি দিত মনে হত র‍্যাঁদা চালাচ্ছে কেউ খরখরে কাঠের উপর। সাবু মিত্তির পারতপক্ষে তাই এ লোকটির সম্মুখীন হতে চাইত না। সে আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ একটি হিসাব কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিত চক্রবর্তী মশায়ের কাছে। আর পাওনা টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিত স্থানীয় পোস্টাফিসে। বনস্পতির নামে আলাদা সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে। ভূষণ চক্রবর্তী প্রায়ই হিসাবের কাগজে

লাল কালিতে দাগ দিয়ে দিয়ে জবাবদিহি তলব করত হিসাবের খুঁটিনাটি নিয়ে। সাবু মিত্তির লিখেই জবাব দিত তার!

এই ব্যক্তিটি কি করে বনস্পতির কাছে এসে জুটল তার আসল রহস্য অনেকেই জানে না। লোকটি এম-এ পাশ, কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি কোথাও বাড়ি, কিছু জমিজমাও আছে নাকি সেখানে, জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে। যদিও জমিজমা এবং বাস্তুভিটের সেই একমাত্র উত্তরাধিকারী, কিন্তু তার থেকে অন্নবস্ত্রের কোনও সংস্থান সে করতে পারেনি। কোলকাতা শহরে এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে, কিন্তু হতাশা ছাড়া আর কিছু জোটেনি। প্রেমে পড়েছিল একটি মেয়ের, কিন্তু পায়নি তাকে। চাকরির চেষ্টা করেছিল অনেক জায়গায়, ভেবেছিল তার যোগ্যতার মর্যাদা সে পাবে। কিন্তু এদেশে যোগ্যতার মর্যাদা আর ক'টা লোকে পায়? সে-ও আবিষ্কার করেছিল চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার তত দরকার নেই, যত দরকার খোশামোদের। যে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে প্রভুর পায়ে তেল দিতে পারে তারই উন্নতি হয়, সে প্রথম শ্রেণীর এম. এ., না তৃতীয় শ্রেণীর, তার খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করে না কেউ। সাহিত্য এবং শিল্পকলার দিকে ঝোঁক ছিল। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা নিয়ে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করেছিল সাহিত্যের বাজারে, কোথাও আমল পায়নি। নূতন লেখকদের কোনও সম্পাদক, কোনও প্রকাশক প্রশ্রয় দেন না, অনেক সময় তার লেখাটা পড়েও দেখেন না পর্যন্ত, দেখলেও বুঝতে পারেন না অনেক সময়, কারণ ভালো লেখা পড়ে বোঝবার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। তাঁরা মোহিত হয়ে যান বিখ্যাত নাম দেখে।

বনস্পতির ছবিটা যে সম্পাদকের দপ্তরে এসেছিল সেখানকার একজন সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে তার আলাপ ছিল। সেখানেই সে বনস্পতির আঁকা ছবিটা দেখেছিল প্রথমে, সেখান থেকেই সে বনস্পতির ঠিকানাটাও প্রথমে জানতে পারে। ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তী। কল্পনার অভিনবত্বই বিশেষ করে মুগ্ধ করেছিল তাকে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে চেয়েছিল সে ছবিটার দিকে, এককথায় ছবিটা দেখে তাক্ লেগে গিয়েছিল তার। জ্যোৎস্নালোকিত একটা পথ দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেছে, আর সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একক একটি গাছ, গাছের কালোছায়া পড়েছে পথের উপর, মনে হচ্ছে গাছটাই যেন পা বাড়িয়ে দিয়েছে জ্যোৎস্নালোকিত পথটার উপর, দিয়েই যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গাছের দুটো শাখা উঠে রয়েছে আকাশের দিকে, মনে হচ্ছে যেন দুটো হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেউ, আরও দুটো শাখা বেরিয়ে আছে দু'পাশ দিয়ে, সে দুটোকেও হাত বলে মনে হচ্ছে। ছবির নীচে নাম লেখা 'মহাকালী'।

এরপর নিম্নলিখিত রূপ কথাবার্তা হয়েছিল তার সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে।

উচ্ছ্বসিত ভূষণ বলেছিল—"চমৎকার ছবি। কোন্ সংখ্যায় যাচ্ছে এটা ?"

"চমৎকার লাগল ? তোমার আত্মীয় হন নাকি ভদ্রলোক ?"

"আত্মীয়ই মনে হচ্ছে, কিন্তু দেখিনি কখনও এঁকে। ছবি দেখে লোভ হচ্ছে আলাপ করে আসি। কোথায় থাকেন ভদ্রলোক ?"

"সুখপুরে।"

সেই সময় ঠিকানাটা দেখেছিল ভূষণ। টুকে নিয়েছিল।

"কোন্ সংখ্যায় যাচ্ছে ছবিটা ?"

"ও ছবি ছাপা হবে না। বুলু সেন বলেছে অতি বাজে ছবি। নামজাদা আর্টিস্টদের ছবি প'ড়ে আছে একগাদা, দেখবে ?"

নামজাদা আর্টিস্টদের অনেক ছবি দেখিয়েছিল তাকে। ছবিগুলো ভালই, কিন্তু অধিকাংশই মেয়ের ছবি। ভূষণের মনে হয়েছিল ছবিগুলোতে স্তন এবং নিতম্বের প্রাধান্যও একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি, যেন ওইগুলো দেখিয়েই ইতরজনকে মুগ্ধ করবার চেষ্টা করেছেন শিল্পীরা, মাংস দিয়ে কুকুর ভোলাবার চেষ্টা করে যেমন কুকুর-চোরেরা।

ভূষণ তবু বলেছিল, "এঁরা সবাই নামজাদা লোক, এঁদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলা শোভা পায় না। কিন্তু এ কথা আমি বলব

বনস্পতি মিশ্রের 'মহাকালী' ছবিখানা এ ছবিগুলোর চেয়ে অনেক ভালো—"

"বুলু সেনের তা মত নয়।"

"বুলু সেন কে?"

"আমাদের মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের শালী।"

"তিনিই ছবি নির্বাচন করেন? তাঁর সে যোগ্যতা আছে নাকি?"

"তাঁর তো যোগ্যতার দরকার নেই। তিনি মালিকের দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী শালী, এই তো তাঁর সব চেয়ে বড় যোগ্যতা। তার উপর তিনি ইয়োরোপ বেড়িয়েছেন, প্যারিসে গেছেন, রোমে গেছেন, স্পেনে গেছেন। লণ্ডনেও গিয়েছিলেন, আরও সব কোথায় কোথায় যেন গিয়েছিলেন, সুতরাং ছবির ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাঁর মতই অকাট্য, অন্তত এই পত্রিকার আপিসে—"

চুপ করে রইল ভূষণ চক্রবর্তী খানিকক্ষণ।

"আমার কবিতাটা ছাপা হবে তো?"

"সত্যি কথা বলব? হবে না। কাগজে 'স্পেস্' কই। সিনেমা, খেলাধুলো, রান্না, সবরকম খবরই তো দিতে হয়। জানই তো নিছক সাহিত্য-পত্রিকা বাজারে চলে না আজকাল। 'সবুজপত্র', 'সাধনা' কদিন চলেছিল? যে কদিন চলেছিল তা লোকসান দিয়ে। তাছাড়া তোমার ও কবিতা অচল আজকালকার যুগে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতাও ফেরত দিতে হয় আমাদের। ওসব কবিতা সেকেলে, জিন্নুবাবুর অন্তত তাই মত।"

"জিন্নুবাবু কে?"

"জনমেজয় বসু। নাম শোননি? উদীয়মান কবি একজন। আমাদের মালিকের ভাগনে।"

"তিনি বলেছেন আমার কবিতা অচল?"

"তিনি কি বলেছেন জানি না, কিন্তু অমনোনীত লেখাগুলো সাধারণত তিনি যে ওএস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন সেইখানে তোমার লেখাটাও ছিল।"

"তিনিই কি কবিতা নির্বাচন করেন নাকি? আমার ধারণা ছিল, সম্পাদক মশাই কিম্বা তুমি কর।"

ম্লান হেসে তিনি জবাব দিলেন, "আমাদের কাজ কি জান? প্রুফ দেখা।"

তারপর নিম্নকণ্ঠে বললেন, "সত্যি কথা শুনবে একটা? আজকাল অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই বড়লোকের বাগান বাড়ি। তাঁরা নিজের নিজের শখ অনুসারে সেগুলো সাজান। কোথাও খেমটা নাচ হয়, কোথাও বা কীর্তন। কেউ কেউ ঝুমকো লতা পছন্দ করেন, কেউ আইভি লতা, কেউ ক্রোটন, কেউ বা ক্যাক্‌টাস। আমরা সেই সব বাগান বাড়ির ভৃত্য মাত্র। যে টব যখন যেখানে রাখতে বলেন সেই রকম রাখি। কথাগুলো তোমাকে কন্‌ফিডেন্‌শ্যালি বললাম, বোলো না যেন কাউকে, অন্তত আমাদের মালিকদের কানে যেন না যায়, গেলে চাকরি থাকবে না। আমি তোমার কবিতাটি ঢুকিয়ে দিতে খুব চেষ্টা করব। কোন গল্প বা প্রবন্ধের নীচে যদি 'স্পেস' পাই ঢুকিয়ে দেব। সে ক্ষমতাটা আছে আমাদের হাতে।"

উক্ত আলাপের পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসেছিল ভূষণ চক্রবর্তী। হঠাৎ তার চেঙ্গিস্ খাঁর কথা মনে পড়েছিল। কৈশোরে পিতৃহীন হয়ে বিবিধ শত্রুপরিবৃত সেই মোঙ্গল বীর বাহুবলে, বুদ্ধিবলে সবেগে তরোয়াল এবং ঘোড়া চালিয়ে যেমন কৃতিত্বের শীর্ষদেশে উপনীত হতে পেরেছিল, সে-ও কি তেমনি পারে না? সে অর্ধেক পৃথিবীর রাজত্ব চায় না, সে চায় অন্তত একটা ভালো কাগজেও তার লেখা সগৌরবে ছাপা হোক। এইটুকু সে পারবে না?...

কিন্তু পারেনি। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছিল তাকে ভিক্ষুকের মতো। তবু তা ভদ্রভাবে যোগাড় করতে পারেনি সে। বহু ব্যর্থতার পর হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। অসংখ্য ক্ষতের জ্বালায় সে যখন ছটফট করছিল, অপমানের তীব্র হলাহলে তার সমস্ত অন্তঃকরণ যখন আর্তনাদ করছে,

।ামান্য একটু আশার বাণী বা স্নেহের স্পর্শ পাবার জন্য যখন তার সমস্ত চিত্ত আকুল, তখন হঠাৎ একদিন বনস্পতি মিশ্রের কথা মনে পড়ল তার। মনে হল এই পৃথিবীতে বোধহয় ওই একটিমাত্র লোকই আছে যে তার অন্তর্দাহের মর্ম বুঝতে পারবে, যার মনের সুরের সঙ্গে হয়তো বা তারও মনের সুর মিলবে। কারণ এটা সে লক্ষ্য করেছিল যে তথাকথিত সুধী বা গুণী-সমাজে বনস্পতি মিশ্রের নাম পর্যন্ত কেউ শোনেনি। তার একটি ছবিও ছাপা হয়নি কোনও কাগজে। তার মতো সেও বোধ হয় অপমানিত, অবহেলিত। ঠিকানা জানাই ছিল। অনেক ইতস্তত করে প্রথমে সে চিঠি লিখলে একখানা।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনাকে আমি চিনি না। কিন্তু শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন আপনিই আমার সবচেয়ে আপনার লোক। বহুদিন আগে এক মাসিক পত্রিকার আপিসে আপনার 'মহাকালী' ছবিটি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝেছিলাম আপনি কত বড় শিল্পী। উক্ত মাসিক পত্রিকায় আপনার ছবি ছাপা হয়নি, সে পত্রিকাও এখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু আমার মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে আপনার ছবিখানি চিরকালের জন্য। এতদিন সাহস পাইনি আপনাকে চিঠি লিখতে, শিল্পীর তপস্যা ভঙ্গ করতে সঙ্কোচ হয়েছিল, আপনি যে এখনও শিল্পসাধনা করছেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। আমার কোন বিশেষ পরিচয় নেই, আমি জীবনে সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। আমার এই ব্যর্থ অপমানিত পদদলিত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে সহসা আজ মনে হল, আপনার সঙ্গে একবার অন্তত দেখা না হলে আমার মরেও সুখ হবে না। অবশ্য আপনি যদি অনুমতি দেন, তবেই যাব। আপনার উত্তরের আশায় রইলাম। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।"

চারদিনের মধ্যেই উত্তর এসেছিল ছবির ভাষায়। জোড়-করা দু'টি হাত, নীচে রং দিয়ে লেখা, 'এলে অনুগৃহীত হব, বনস্পতি'। প্রতিটি অক্ষর যেন অবনত হয়ে আছে স-সম্ভ্রমে।

ভূষণ চক্রবর্তী সেই যে এলেন আর ফিরে গেলেন না। লোহা যেন চুম্বকে আটকে গেল।

ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন-সংবাদটি সুখপুর-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটিই উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর আগমন। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের জনৈক গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তী এম. এ. মহাশয় গত সপ্তাহে এখানে আসিয়া শিল্পীর সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন প্রথম সাক্ষাৎ বড়ই অদ্ভুত ধরনের হইয়াছিল। বনস্পতির সম্মুখীন হইয়া চক্রবর্তী মহাশয় কোনও কথা বলেন নাই, নমস্কার পর্যন্ত করেন নাই, নির্বাক বিস্ময়ে বনস্পতির দিকে চাহিয়াছিলেন। বনস্পতি শিষ্টাচার-সঙ্গত নমস্কারান্তে যখন আলাপ করিতে উদ্যত হইল তখন চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিলেন তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি এইবার যাইতে চান, অনর্থক বাগবিস্তার করতঃ শিল্পীর অমূল্য সময় নষ্ট করিবার বাসনা তাঁহার নাই। বনস্পতি ইহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে অন্তত দুই এক দিনের জন্য তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানায়। সে অনুরোধ চক্রবর্তী মহাশয় রক্ষা করিয়াছেন।"

সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল অমাবস্যা-সংখ্যায়। পূর্ণিমা-সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে চক্রবর্তী মশায় শেষ পর্যন্ত বনস্পতি মিশ্রের কাছে পাকাপাকিভাবেই থেকে গেলেন। সংবাদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি।

"শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের অভিনব প্রহরী। শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের গুণগ্রাহী শ্রীযুক্ত ভূষণ চক্রবর্তীর সুখপুরে আগমন-বার্তা বিগত অমাবস্যা-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি প্রথমে মাত্র দুই দিনের জন্য বনস্পতির আতিথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুইদিন আলাপের পর তাঁহার মত বদলাইয়াছে। বনস্পতির শিল্প-কর্মের

চমৎকারিত্বে তিনি এতদূর অভিভূত হইয়াছেন যে আজীবন তিনি বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে, এজন্য তিনি কোন বেতন লইবেন না। তিনি বলিয়াছেন, যে প্রেরণা বশে বৈরাগিনী মীরা একদা গাহিয়াছিল 'ম্যয়নে চাকর রাখো জী' সেই প্রেরণাই তাঁহাকেও শিল্পী বনস্পতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সৈকত-কাননের বাড়িতে সামান্য আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেই তিনি সানন্দে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনটা শিল্পীর সেবায় কাটাইয়া দিতে পারিবেন এই কথা বলিয়াছেন। কিভাবে তাঁহার সমস্ত দিন কাটিবে, অর্থাৎ তাঁহার দৈনিক কার্যক্রম কি হইবে তাহা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রীমান ভূপেন দাস জানিতে চাহিয়াছিল। উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, শিল্পী বনস্পতিকে প্রহরা দেওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য হইবে। তাঁহার মতে ভালো দামী গাছের চারাকে গরু ছাগলের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যেমন কাঁটার বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের রক্ষা করিতে হইলেও সেইরূপ সমর্থ এবং কড়া প্রহরী চাই। তিনি আরও বলিয়াছেন সভ্য মনুষ্যসমাজেও গরু ছাগল জাতীয় প্রাণীর অভাব নাই, তাহাদেরও একমাত্র কাজ উদীয়মান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাথাটি মুড়াইয়া খাওয়া। তাঁহার বিবেচনায় ইহা খুবই সুখের এবং সৌভাগ্যের বিষয় যে শ্রীবনস্পতিকে শহরের অর্ধশিক্ষিত স্বার্থপর পরশ্রীকাতর এবং তথাকথিত আলোক-প্রাপ্ত ফড়িয়াদের কবলস্থ হইয়া শিল্পী-জীবন যাপন করিতে হয় নাই। তিনি নির্জনে নিজগৃহে স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের নিকট আর একটি আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে বনস্পতি মিশ্রের তপোভঙ্গ করিবার জন্য শহর হইতে বহুবিধ ফড়িয়ার সমাগম হইবে। ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা কলসীর কানা, পুরাতন পট অথবা হাতে-লেখা পুঁথির খোঁজে যাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহারা কালক্রমে বনস্পতির সন্ধান পাইবেনই এবং তখন তাঁহাকে রক্ষা করিবার মতো কোন সমর্থ লোক যদি না থাকে তাহা হইলে যে

কি হইবে তাহা কল্পনা করিলেও তাঁহার হৃৎকম্প হয়। তিনি স্থির করিয়াছেন যে অনুমতি পাইলে তিনিই প্রহরীর কাজ করিবেন। চক্রবর্তী মহাশয় বেশ বলিষ্ঠ গঠন ব্যক্তি, প্রত্যহ মুদ্গর চালনা করেন। তিনি স্বল্পাহারী, স্বল্পবাক এবং কৃতবিদ্য। তিনি এই স্বেচ্ছাবৃত প্রহরীর কার্য যে অনায়াসে করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের অনুরোধ তিনিও তাঁহার প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তুলুন। তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তি, ইচ্ছা করিলে তিনি আমাদের প্রভূত জ্ঞান দান করিতে পারেন। সুখের বিষয় তিনি 'সুখপুর-পত্রিকা'য় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী যে কি রকম কড়া প্রহরী তার প্রথম আভাস পেল হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার প্রায়ই যেত সৈকত-কাননে, উদ্দেশ্য আনাড়ি বনস্পতিকে আর্ট সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান দান করা। ভাবত—'এদের খাচ্ছি, পরছি, যতটা পারি এদের উপকার করি। যতটা পারি কূপমণ্ডূকটাকে বলে আসি যে তার কূয়োর বাইরে কত বড় বড় আর কি অপরূপ সব সাগর মহাসাগর আছে। শুনেও যদি ওর কিছুটা উন্নতি হয়। এত করে বললাম গ্রাম ছেড়ে তো গেল না কোথাও।' বনস্পতি যখন ছবি আঁকত তখন তার কাছে বসে সে প্রায়ই গিয়ে সমুদ্রের কথা শোনাত। র‍্যাফল, বটিচেলি, এল্ গ্রেকো, ভ্যান গঘ, রুবেন্স্, গগ্যাঁ, পিকাসো, মিকালেঞ্জেলো, গয়া, দা ভিঞ্চি কত রকম নামই যে করত তার ঠিক নেই। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারেনি, কিন্তু সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিল সে। অনর্গল বলে যেত এদের কথা। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ যে কোথায় কোথায় ভুল করেছেন, কি কি করলে তাঁরা সত্যি বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন, যামিনী রায় কেন প্রগ্রেসিভ নন, দেবীপ্রসাদের দুর্বলতা কোথায় এসব নিয়েও বেশ বিজ্ঞের মতো বক্তৃতা দিত সে নস্যির টিপটি হাতে ধ'রে। বনস্পতি তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে কি না, মহামূল্য এসব তথ্যে তার চিত্তলোক উদ্দীপ্ত হচ্ছে কিনা তা কিন্তু সব সময়ে বুঝতে পারত না হিমু। কারণ বনস্পতি আপন মনে ছবিই এঁকে যেত, 'হাঁ' 'না' কোনও

উত্তরই দিত না, মাথা নাড়ত না, ভুরু কোঁচকাত না, হাসত না। বক্তৃতার মাঝখানে উঠেও যেত মাঝে মাঝে। কিন্তু এসবে দমত না হেমন্তকুমার। সে নস্যির টিপটা টেনে নিয়ে হাসিমুখে বসে থাকত চুপ করে, বনস্পতি ফিরে এলে শুরু করত আবার। আর একটা বিশেষত্বও ছিল হেমন্তকুমারের। বনস্পতির ছবির সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই করেনি কখনও সে, যেন সেগুলো তার নজরেই পড়েনি, যদিও যে ঘরে ব'সে সে বনস্পতির সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করত সে ঘরের চারটে দেওয়ালই ভরতি ছিল বনস্পতির আঁকা ছবিতে। তারই ছেলেমেয়ের নানা ছবি সে এঁকেছিল নানা ভঙ্গীতে, কিন্তু সেগুলোর সম্বন্ধেও কোন প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করা দূরে থাক, কোনও মন্তব্য পর্যন্ত করেনি হেমন্তকুমার, যেন ওসব ছেলেমানুষী কাণ্ডগুলোকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনাটা অশোভন তার মতো বিজ্ঞের পক্ষে। বনস্পতি হেমন্তকুমারের ছেলেমেয়ের ছবিগুলো সত্যিই অদ্ভুত করে এঁকেছিল। যার নাম বন্দুক তার হাতে একটা বন্দুক দিয়ে মেয়েটার ভাব-ভঙ্গীতে ফুটিয়েছিল একটা বন্দুক-ভাব—নির্বিকার, আপাত-দৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অগ্নি-গর্ভ। বর্শার মুখখানা এঁকেছিল একটা চকচকে বর্শা-ফলকের উপর। সত্যবতী দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন এই অভিনবত্বে, কিন্তু হেমন্তকুমারের মনে এসব যে কোন রেখাপাত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সে মুখে একটা সবজান্তা-মার্কা হাসি ফুটিয়ে হয় চুপ করে বসে থাকত, কিম্বা বনস্পতির আত্মিক উন্নতির জন্য বক্তৃতা করত।

ভূষণ চক্রবর্তী মাসখানেক ধরে' লক্ষ্য করলেন এসব। হেমন্তকুমারের স্বরূপ আবিষ্কার করতে বিলম্ব হয়নি তাঁর, কিন্তু বাচস্পতির শ্যালক বলে প্রথম প্রথম তাকে কিছু বলতে পারেন নি। কিন্তু একদিন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যখন তিনি আড়াল থেকে শুনতে পেলেন হেমন্তকুমার বলছে—"ও ছবি আঁকবার আগে তোমার লিওনার্দো দা ভিঞ্চির জীবন-চরিতটা পড়ে নেওয়া উচিত ছিল, তাহলে বুঝতে পারতে কত বড় প্রতিভা থাকলে তবে ও ছবি আঁকা সম্ভব। তুমি ছবির নাম দিয়েছ 'বিশ্ববিদ্যালয়', কিন্তু বিশ্বের সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে তোমার? সারাজীবন

প'ড়ে আছো তো এই অজ পাড়াগাঁয়ে। দা ভিঞ্চি আঠারো উনিশ বছর ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছিলেন শুধু, দুনিয়ার কত কিছু দেখেছিলেন, তবু তিনি ও নাম দিয়ে ছবি আঁকতে সাহস করেননি। বিখ্যাত আর্টিস্টদের জীবনীগুলো অন্তত তোমার পড়া উচিত, কিন্তু মুশকিল হয়েছে তুমি ইংরেজি যে একেবারে জান না, প'ড়ে বসে আছ এক 'ডেড্ ল্যাঙ্গুএজ'—"

ভূষণ চক্রবর্তীর আপাদমস্তক জ্বলে উঠল এ-কথা শুনে। কিছুদিন আগে 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে বনস্পতি প্রকাণ্ড যে ছবিটি আঁকতে শুরু করেছিল তার পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় কোন বড় অট্টালিকা নয়। প্রাচীন এক বট-বৃক্ষ অসংখ্য ঝুরি নাবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট গাম্ভীর্যে, তার গাঁটে গাঁটে সবুজ পাতা আর লাল ফলের সমারোহ, কত রকমের পাখী যে আশ্রয় নিয়েছে তাতে, কত রকমের পতঙ্গ যে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাতায় পাতায়, কত রকমের লতা উঠেছে তার গা বেয়ে তার আর ইয়ত্তা নেই। একধারে এক বুড়ি ডাল নুইয়ে পাতা পাড়ছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি উন্মুখ বাছুর। আর একধারে দোলনায় দুলছে এক মেয়ে, উড়ছে তার আলুলায়িত চুল, চোখে মুখে উপচে পড়ছে হাসি, মাথার উপর অনন্ত আকাশ, চারিপাশে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। আকাশে উড়ে চলেছে বকের সারি। বটবৃক্ষের পাদমূলে নানারকম পাথরের মূর্তি, প্রত্যেকটিতে সিন্দুর-চন্দন, একটি মেয়ে প্রণতা হয়ে আছে তাদের সামনে, বর্তমান যেন প্রণাম করছে অতীতকে। এছাড়া আরও অনেক বৈচিত্র্য অলঙ্কৃত করছে ছবিখানিকে। কোথাও পাখী নীড় বেঁধেছে, কোথাও আবার পিঁপড়েরা, মাকড়শারা সূক্ষ্ম উর্ণার জাল টাঙিয়ে দখল করে আছে খানিকটা জায়গা, ভাঙা শুকনো শাখার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে নবীন কিশলয়ের দল। গাছের আর একধারে বুড়িটার পাশে কয়েকটি মেয়ে শুকনো পাতা আর ডাল কুড়িয়ে বোঝা বাঁধছে। একদল শাখা-মৃগও বসে আছে একধারে গাছের উপর। সবাই আনন্দিত, সবাই প্রাণরসে ভরপুর। ভূষণ চক্রবর্তীর মতে এইটি নিঃসন্দেহে বনস্পতির শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি

দূর থেকে দাঁড়িয়ে রোজ দেখে যেতেন কতদূর আঁকা হল, নীরবে দেখে যেতেন শুধু, কোন কথা বলতেন না।

এই ছবির সম্বন্ধে হেমন্তকুমারের অভিমত শুনে ক্ষেপে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী। কিন্তু তখনই তখনই এর প্রতিকার করা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে, হেমন্তকুমার বাড়ির একজন নিকট আত্মীয়।

হেমন্তকুমার চলে যাবার পর ভূষণ চক্রবর্তী গেলেন বনস্পতির কাছে। বনস্পতি তখন আঁকছেন গাছের মাথার উপরে আটকে গেছে রঙীন একখানা ঘুড়ি।

"একটা কথা বলতে এসেছি আপনাকে।"

বনস্পতি তখনও রং লাগাচ্ছেন ঘুড়িতে। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "ও, আপনি। কি বলবেন বলুন। কেমন লাগছে ছবিখানা ?"

"অপূর্ব। আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি। আমি নিজেকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করেছি, কিন্তু যা করব বলে এসেছিলাম তা তো করতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হেমন্তবাবু রোজ আপনাকে এসে বিরক্ত করে যাচ্ছেন, আমার মনে হচ্ছে ওঁকে বাধা দেওয়া উচিত—"

উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে বনস্পতি বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি ?"

"উপায় আছে। আপনি যদি আমাকে লিখিত একটি আদেশ দেন তাহলে আমি কোন বাজে লোককে ঢুকতে দেব না।"

"তাহলে তো বাঁচি। কি লিখতে হবে ?"

"লিখতে হবে ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে কেউ আমার ছবি-আঁকার ঘরে ঢুকতে পাবে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে হলেও ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আগে দেখা করে সেটা ঠিক করে নিতে হবে। ভূষণ চক্রবর্তীই আমার প্রহরী, কোনও কারণেই তাঁর অমতে আমার কাছে আসা চলবে না।"

"এরকম লিখলে কেউ কিছু মনে করবে না তো।"

"করবে বইকি, নিশ্চয় করবে। কিন্তু ওর ঝুঁকিটা আমি নিজের

ঘাড়েই নেব, বদনাম আমারই হবে, আর নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আপনার লেখাটা আমি দেখাব না কাউকে।”

শেষ পর্যন্ত তাই হল। বনস্পতি একটা খাতায় লিখে দিলেন ওই কথাগুলো, লিখে নাম সই করে দিলেন নীচে।

বনস্পতিকে রক্ষা করবার একটা সুবিধা ছিল। বনস্পতির অন্দর মহলে প্রবেশ করবার দ্বার একটি মাত্র। সেই দ্বারের সামনেই প্রকাণ্ড একটি বারান্দা। বারান্দার অপর প্রান্তে দুটি ঘর নিয়ে বাস করতেন ভূষণ চক্রবর্তী। সুতরাং তার দৃষ্টি এড়িয়ে বাইরের কোন লোকেরই অন্দর-মহলে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। চাকর-চাকরানী আর হেমন্তকুমার ছাড়া অন্দর-মহলে তখন যেতও না কেউ বিশেষ। কোলকাতা থেকে জনসমাগম পরে আরম্ভ হয়েছিল।

একদিন সকালে হেমন্তকুমার এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ তুলে দেখল সদর দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে নোটিশ ঝুলছে —“ভূষণ চক্রবর্তীর বিনা অনুমতিতে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।” হেমন্ত-কুমার নস্যির টিপটি ডান হাতে ধরে আরও ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ নোটিশটার দিকে। মনে ঈষৎ কৌতুক সঞ্চার হল তার। তারপর নস্যির টিপটা সজোরে টেনে নিয়ে ভিতরের দিকে যথারীতি অগ্রসর হল সে।

“শুনছেন ? ভিতরে যাবেন না।”

ভূষণ চক্রবর্তীর বজ্রকণ্ঠ শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল হেমন্তকুমারকে। চক্রবর্তী মশায় নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে অন্দর মহলের দ্বার রোধ করে এসে দাঁড়ালেন।

“এর মানে ?”—প্রশ্ন করলেন হেমন্তকুমার।

“নোটিশটা দেখুন।”

“দেখেছি। কিন্তু ও নোটিশ আমার উপরও খাটবে ? আমি ওর আত্মীয়—”

“আপনি ওঁর আত্মীয় নন, বরং আমার মনে হয় আপনি ওঁর শত্রু।

আপনি ওঁর কানের কাছে বকবক করে ওঁর কাজে বাধা দিচ্ছেন। আত্মীয় এটা করতেন না।"

"ওর ভালোর জন্যেই বকবক করি। আর্ট সম্বন্ধে যতটুকু জানি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি—"

"আপনি যা বলেন তা আমি শুনেছি। আর্ট সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই, আজকাল কতকগুলো শস্তা বিলিতি বইয়ের দৌলতে অধিকাংশ লোক যা হয়েছে আপনি তাই।"

"কি—"

"একটি 'ফড়ে'। তাই আমার ইচ্ছে নয় যে আপনি ওঁর কাছে যান।"

"আপনার ইচ্ছে অনুসারে আমাকে চলতে হবে না কি ?"

"বনস্পতি মিশ্রের বাড়িতে চলতে হবে। তিনি এ বিষয়ে লিখিত অনুমতি দিয়েছেন আমাকে—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে হেমন্তকুমার চেয়ে রইল চক্রবর্তীর দিকে। এইটি তার একটি বিশেষত্ব। প্রাণের ভিতর যাই হোক মুখে তা প্রকাশ পায় না কখনও। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে অবশেষে বলল, "আমি যদি জোর করে ঢুকি ?"

"আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমার সঙ্গে জোরে পারবেন কি ?"

হেমন্তকুমার তাঁর পেশী-সমৃদ্ধ বাহুখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে আর একটু হেসে এমন ভাবে চলে গেল যেন সে একটা ষাঁড়কে দেখে পাশ কাটাচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয়, এ নিয়ে হেমন্তকুমার কোনও হৈ চৈ তো করেইনি, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির কাছে কথাটা প্রকাশ পর্যন্ত করেনি। এটাও তার একটা বৈশিষ্ট্য। কিলটি খেয়ে সেটি নিঃশব্দে হজম করবার অদ্ভুত নৈপুণ্য আছে তার। কোথাও অপমানিত হলে কাক-পক্ষীটি পর্যন্ত সে খবর জানতে পারত না। কোন বয়স্ক ব্যক্তি কোথাও পা পিছলে প'ড়ে গেলে যেমন প্রথমেই চারিদিকে চেয়ে দেখে তার এই অধঃপতন কেউ দেখতে পেয়েছে কি না, অপমানিত হলে হেমন্তকুমারও তেমনি শঙ্কিত

হয়ে পড়ত, খবরটা কেউ জানতে পারেনি তো। ছাত্র জীবনে বহু ঘাটের জল খেয়ে এই সত্যটা সে উপলব্ধি করেছিল যে গায়ে একবার কাদা লেগে গেলে তার আর চারা নেই, বুক চাপড়ে লোক জড় করলে সে কাদার মলিনতা তো একটুকু কমবেই না, বরং সেটা অনেক লোকের হাসির খোরাক জোগাবে। তার চেয়ে চুপি চুপি আড়ালে গিয়ে কাদাটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আর ভবিষ্যতে কাদাটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করাই উচিত।

হেমন্ত এ ক্ষেত্রেও তাই করল।

কাদার সংস্রব এড়িয়ে গিয়ে বসতে লাগল তালুকদার মশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে। বেশ একটি সম্মানের আসনও পেল সে সেখানে। তালুক-দার মশায়ের তৃতীয় পক্ষের কনিষ্ঠ পুত্র সহদেবের শ্রদ্ধা সে আগেই আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। সহদেব ফোর্থ-ক্লাস থেকে প্রমোশন পায়নি। তিনবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। এই জন্যেই সম্ভবত সহদেবের সম্বন্ধে একটা মমত্ব-বোধ ছিল হিমুর। সহদেবের বাবা শিবু তালুকদার স্বর্গারোহণ করেছিলেন বছর দুই পূর্বে। তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ছিল কিছু, ভাগ করলে প্রতি ভাগে চটকস্য মাংসের চেয়েও কম পড়ত, কারণ ত্রয়োদশ পুত্রের পিতা ছিলেন তিনি। এক সহদেব ছাড়া অন্য ভাইগুলির বিবাহ এবং সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল। সবাই একান্নবর্তী ছিল বলেই মোটা-ভাত মোটা-কাপড় কোনক্রমে জুটছিল সকলের। অন্য ভাইগুলি এদিকে-ওদিকে কিছু রোজগারও করতেন। সহদেবই ছিল বেকার। সে সংসারের ফাই-ফরমাশ খাটত, আর সন্ধ্যের পর নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাস খেলত বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে। প্রথমে সে এর নামকরণ করেছিল 'সুখপুর ক্লাব'। কিন্তু হেমন্তকুমার সংশোধন করে দিয়েছিল নামটা। বলেছিল, "কানা পুতের নাম পদ্মলোচন রেখো না। ক্লাব অনেক বড় জিনিস হে, 'বার্' না থাকলে ক্লাব হয় না। কার্ড-ক্লাব রাখতে পার বরং।" লাউ কুমড়োর ডালনা, পুঁই শাকের চচ্চড়ি আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে লাল চালের ভাত ছাড়া শারীরিক পুষ্টি বিধানের জন্য অন্য উপকরণ যদিও সে জোটাতে পারত না, বিদেশী

আহার সংগ্রহ করা অসম্ভবই ছিল তার পক্ষে, বিদেশী বিদ্যাও সে আহরণ করতে পারেনি, কিন্তু বিদেশী সভ্যতা সম্বন্ধে মোহের অন্ত ছিল না সহদেবের। এরই প্রকাশ হয়েছিল তার 'ওপন্ ব্রেস্ট' কোটে আর ওই সুখপুর কার্ড ক্লাবে।

হেমন্তকুমার এইখানে এসেই আশ্রয় পেল।

সহদেব একটু কৌতূহলী প্রকৃতির লোক। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি আর বন্ধুদার ওখানে যান না, আগে তো রোজ যেতেন ?"

"না ভাই, আর যাই নাঁ। ওখানে যাওয়া ছেড়েছি। আমাদের এক মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি যাওয়া যেমন ছেড়েছিলাম—"

"কি রকম ?"

কৌতূহলী সহদেব আরও কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"কোলকাতায় শেষবার যে স্কুলটাতে ট্রায়াল দিয়েছিলাম সেখানে এক মাস্টার ছিলেন ভানু মিত্তির। লোকটি এমনিতে ভালো, বেশ ভালো। আমাকে স্নেহ করতেন খুব। একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন, তাঁর স্ত্রীটিও দেখলাম খুব ভালো। আমাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়ালেন। মাঝে মাঝে যাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি যেতামও মাঝে মাঝে, কিন্তু তার এক ল্যালা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছেলের জন্য যাওয়া ছাড়তে হল শেষটা—"

"কেন, কি করত সে ?"

"ডাক্তারের পরামর্শে তাকে ভালো ভালো খাবার খেতে দিতো ওরা। সন্দেশ, রসগোল্লা, সর, মাখন, ডিম—কত কি, কিন্তু ছেলেটা খেত না কিছু, বাঁ হাত দিয়ে চটকাত খালি, আর মুখ দিয়ে নাল গড়িয়ে পড়ত। সে এক বীভৎস দৃশ্য। রোজ রোজ ওই দৃশ্য দেখা পোষাল না আমার, যাওয়া ছেড়ে দিলাম। বন্ধুর ওখানে যাওয়াও ছেড়েছি ওই জন্যে। ভাল ভাল কাগজ রং আর তুলি নিয়ে যে সব কাণ্ড ও করছে তা আর বসে দেখা যায় না—"

"কি ছবি আঁকচেন আজকাল বন্ধুদা ?"

"ও ছবি আঁকবে কি! মোগল পাঠান হদ্দ হল ফারসী পড়ে তাঁতি, ওর হয়েছে সেই অবস্থা। আস্থা আছে খুব। কিন্তু সামর্থ্যে কুলোয় না। একটা ছবির গাল-ভরা নাম দিয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয়', কিন্তু আঁকছে একটা বটগাছ—"

"তাই না কি! বটগাছের নাম বিশ্ববিদ্যালয় দেবার মানে?"

"বোঝ—"

এরপর হেমন্তকুমার গাল-ভরা কতকগুলো নাম উচ্চারণ করে সহদেবকে বিস্মিত করে দিলে। র‍্যাফেল, মিকালেঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, গয়া, রুবেন্স প্রভৃতির নামও কখনও শোনেনি বেচারা। হাঁ করে শুনতে লাগল। সহদেবকে বিস্মিত করে দেবার মতো বিদ্যে ছিল হেমন্ত-কুমারের।

এর দিনকতক পরে 'সুখপুর-পত্রিকা'র এক সংখ্যায় ভূষণ চক্রবর্তীর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রবন্ধের নাম 'মানুষের সঙ্গ'।

চক্রবর্তী মশায় তাতে লিখলেন—"প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোনও সমর্থ পুরুষ দ্বিতীয় সমর্থ পুরুষের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত না। নারী এবং শিশু পরিবৃত হইয়াই সে বন্য জীবন যাপন করিত। শিশু-পুত্র যৌবনে উত্তীর্ণ হইলেই পিতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য হইয়া অবশেষে বিতাড়িত হইত। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই নিয়মই মানব-সমাজকে চালিত করিয়াছে। ইহার পর মানুষ সভ্য হইল, সমাজ-স্থাপন করিল, সমাজের পুরুষেরা আর তখন অন্য পুরুষের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিল না, বর্জন করিতে চাহিলও না। কারণ তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিল নিজেদের স্বার্থের জন্যই একতা, সহৃদয়তা, বন্ধুত্ব, সামাজিকতা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহু শতাব্দী ধরিয়া পরস্পরের প্রতি যে বিরুদ্ধ ভাব তাহারা পোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহা সহজে অবলুপ্ত হইল না। ইংরেজিতে একটি প্রবচন আছে—চিতাবাঘ নিজ চর্মের কৃষ্ণ-বৃত্তগুলি কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সংস্কৃত কবিও বলিয়াছেন, অঙ্গারকে শতবার ধৌত

করিলেও তাহা মলিনতা-মুক্ত হয় না। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও বলিতেছেন, আমাদের পাশব প্রবৃত্তিগুলিও লুপ্ত হয় না, অবদমিত হয় মাত্র, মনের গহনে অবচেতন লোকে তাহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং কালক্রমে ভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হইয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে।

একটি উদাহরণ দিতেছি মনে করুন, আপাতদৃষ্টিতে 'ক' 'খ'-য়ের বন্ধু। যতদিন তাহাদের অবস্থা সমান থাকে ততদিন তাহাদের বন্ধুত্বে হয়তো ফাটল ধরে না। কিন্তু যে-ই একজনের সৌভাগ্য দেখা দেয়, ধনে-মানে পুত্রে-কলত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যেই একজন আর একজনকে ছাড়াইয়া যায়, তখনই নিম্নস্থ বন্ধুটির মনে ঈর্ষা জাগে। কিন্তু এ ঈর্ষা সে প্রকাশ করে আইনসঙ্গত সভ্য উপায়ে। জঙ্গলের আইন প্রচলিত থাকিলে সে সোজাসুজি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নখদন্ত আয়ুধপ্রহারে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিত। কিন্তু সভ্যসমাজে তাহা করিবার উপায় নাই। তাই তাহারা বাধ্য হইয়া যে সব অস্ত্রের আশ্রয় লয় আপাতদৃষ্টিতে সেগুলিকে অস্ত্র বলিয়া চেনাই যায় না। বর্তমান সভ্যসমাজে তাহারা নানা নামে প্রচলিত আছে। একটি এইরূপ অস্ত্রের নাম করিতেছি। সেটির নাম 'সমালোচনা'। সমালোচনার ভালো দিক যে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সমালোচনা পরশ্রীকাতরতারই প্রকাশ। যিনি আপনার বন্ধু, তিনিই আপনার বড় সমালোচক, প্রকাশ্য সমালোচক নয়, গোপন সমালোচক। তিনি আপনার নিকটে আসিয়া আপনাকে উপদেশ দিবার ছলে আপনার সমালোচনা করেন, আপনার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনাকে অভিনন্দন করিবার সময় আসিয়াও আপনার সমালোচনা করেন, তাঁহার অন্তর্নিহিত ঈর্ষানল তাঁহার বাক্যে, ব্যবহারে, হাসিতে বিকীর্ণ হয়। আপনি বিপন্ন হইলে তিনি মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু মনে মনে আনন্দিত হন।

ইহার প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে। সম্ভবত, ইহারই ফলে সমাজে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক উদ্ভূত হইয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে আছেন

সাধু সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত মহাত্মাগণ। ইহারা সংসার ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর অরণ্যে, পর্বতে বা মরুভূমিতে একক জীবন যাপন করাই নিরাপদ মনে করেন। যাঁহারা তাঁহাদের নাগাল পান না তাঁহারা এই সাধু সন্ন্যাসীদের 'এস্‌কেপিস্ট' অর্থাৎ 'পলাতক' আখ্যা দিয়া কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ঈশপের গল্পে শৃগালও দ্রাক্ষাগুচ্ছকে তিক্ত বলিয়াছিল। একথা কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ইহারা সকলেই গুণী, জ্ঞানী এবং তপস্বী। তথাকথিত সভ্য মানবসমাজের পাশবিকতা এড়াইবার জন্যই মনুষ্যসঙ্গ পরিহার করা তাঁহারা শ্রেয় মনে করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বটে, কিন্তু সমাজের ভিতর থাকিয়াই তাঁহারা কূর্মের মতো হাত-পা গুটাইয়া বাস করেন। ইহারাও ঐশ্বর্যবান। কিন্তু ইহারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কথা কাহাকেও জানিতে দেন না। টাকা-কড়ি থাকিলে তাহা মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখেন। আহারে, বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে সে ধনের অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র আভাসিত হয় না সমাজের নিকট তাঁহারা দরিদ্র রূপেই পরিচিত হইতে চান। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারাও অতি-বিনয়-বশত মূর্খতার ভান করিতে ভালবাসেন, নিজেদের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়া অপরের ঈর্ষাভাজন হইবার বাসনা তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মূর্খতারই ভান করেন। অর্থাৎ এই দ্বিতীয় স্তরের লোকেরাও যে জ্ঞানী গুণী এবং ধনী হইয়াও সমাজে অতিশয় স-সঙ্কোচে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, আমার বিশ্বাস, তাহা তথাকথিত বন্ধুদের ভয়ে। যে মনোবৃত্তি বশে আমরা বর্ষাকালে পোকার ভয়ে আলো জ্বালি না, ইহা অনেকটা সেইরূপ মনোবৃত্তি। মানুষের সঙ্গ ইহাদের নিকট বিরক্তিকর, অনেক সময় ভয়াবহ এবং বিপদসঙ্কুল।

তৃতীয় আর একটি শ্রেণীর উল্লেখ করিব। ইহারা মানুষের অনুরাগী, মনুষ্য সমাজেই বাস করেন, মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা, মানুষের পরিবেশ, বস্তুত মানুষই ইহাদের জীবনের প্রেরণা, ইহাদের সৃষ্টির উপাদান এবং উপকরণ। ইহারা কবি ও শিল্পী। মানুষের সঙ্গ ইহাদেরই

সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন করিয়াছে। নিন্দা, প্রশংসা, তিরস্কার, পুরস্কার, ছদ্মবেশী শত্রু, মতলববাজ চাটুকার, ঈর্ষা-ক্লিষ্ট আত্মীয়-বন্ধু, বেরসিক পৃষ্ঠপোষক, অখ্যাতির হতাশা, অতি-খ্যাতির বিড়ম্বনা প্রভৃতি অনিবার্য-ভাবে আসিয়া ইঁহাদের অনাবিল মানসলোককে আবিল করিয়া তুলিতেছে। ইঁহারা আত্মভোলা লোক, কিন্তু সন্ন্যাসীদের মতো সাত্ত্বিক প্রকৃতির নহেন, রাজসিকতার ইন্দ্রলোকে সমাসীন হইয়া শান্তিতে সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর থাকিতে পারিলেই ইঁহারা সর্বোত্তম সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, মানুষের সঙ্গই এ পথে তাঁহাদের প্রধান অন্তরায়। তাঁহারা প্রকৃত রসিকের খোঁজে মানুষদের সহিত মিশিতে বাধ্য হন, কারণ মানুষই তাঁহাদের সৃষ্টির একমাত্র মূল্যদাতা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত মানুষেরা তাঁহাদের চারিদিকে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাহা পীড়াদায়ক। ইহাদের চাপে অনেক সময় প্রতিভার মৃত্যু হয়। আমার মতে ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তব্য। কিন্তু আমরা সে কর্তব্য পালন তো করিই না, উপরন্তু উপাধি, পুরস্কার, খোশামোদ, নিন্দা প্রভৃতির লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ইঁহাদের বিরক্ত করি, কখনও জ্ঞাতসারে, কখনও অজ্ঞাতসারে।

সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের সঙ্গ হয়তো কাম্য, অনেক সময় তাহা হিতকরও। কিন্তু যাঁহারা অসাধারণ ব্যক্তি, অবাঞ্ছিত মনুষ্যসঙ্গ তাহাদের পক্ষে বিষবৎ। তাহা সুধাবৎ হইত যদি তাঁহারা প্রকৃত রসিক এবং হিতৈষী লোকের সঙ্গ পাইতেন। কিন্তু সেরূপ লোক সর্বযুগেই বিরল, এ যুগে আরও বিরল।”

এ প্রবন্ধটি বাচস্পতির খুব ভাল লেগেছিল। সম্ভবত এ-ও তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে প্রবন্ধটির লক্ষ্য হেমন্তকুমার। হেমন্তকুমার যে বনস্পতির ওখানে না গিয়ে সহদেবদের চণ্ডীমণ্ডপে তাস খেলছে এবং সহদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদের নতুন নতুন রকম তাস খেলা শেখাচ্ছে এ খবরও তিনি শুনেছিলেন সীমন্তিনীর মুখে। সীমন্তিনী শুনেছিল লাঠির কাছে। লাঠি ছিল একটু গোয়েন্দা-প্রকৃতির। তার বাবা কি করছে, কোথায়

যাচ্ছে এসব খবর সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাখত আর তার পিসীমার কাছে এসে বলত চুপি চুপি। হেমন্ত যে আর বনস্পতির ওখানে যাচ্ছে না এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল সীমন্তিনী। তার দাদা যে সপরিবারে এখানে এসে আছে এতেও মনে মনে একটা কুণ্ঠা ছিল তার। অথচ সে মুখে কিছু বলতে পারত না। তার দাদাকেও না, স্বামীকেও না বাচস্পতি ও সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্যই করতেন না। বহুকাল পূর্বে হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর যে আলোচনা হয়েছিল, তারপর থেকে হেমন্ত-কুমার তাঁকে এড়িয়ে চলত। তিনিও আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবার উৎসাহ পাননি। সুখপুর পত্রিকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হত তাঁকে যে সময়ও পেতেন না। প্রায়ই টাট্টু ঘোড়াটিতে চ'ড়ে তিনি বেরিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে সংবাদের যাথার্থ্য যাচাই করবার জন্যে ফিরে এসেই আবার বসতেন সে সংবাদটি লিখতে। সুতরাং হেমন্ত-কুমারকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই পেতেন না তিনি। ভূষণ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি পড়ে তিনি বুঝলেন হেমন্তকুমারের সঙ্গে তাঁর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেছে সম্ভবত। খুশি হলেন মনে মনে। হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে আর যাচ্ছে না শুনে আরও খুশি হলেন।

হেমন্তকুমার সৈকত-কাননে না গেলেও তার ছেলেমেয়েরা সেখানে যেত। বনস্পতি তাদের সঙ্গ পছন্দ করত, তাদের মডেল করে ছবি আঁকত, তাদের নানারকম ফাই-ফরমাশ করত। ভূষণ চক্রবর্তীকে সে বলে দিয়েছিল ওদের আসা-যাওয়া যেন অবারিত থাকে।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভূষণ চক্রবর্তী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। কোলকাতা শহর থেকে সমঝদার জুটতে লাগল এরা আকৃষ্ট হল অবশ্য ছবির টানে নয়, টাকার গন্ধে। তারা ভেবেছিল বনস্পতি মিশ্র নামক যে অর্ধশিক্ষিত ধনী সন্তানটি ছবির খেয়ালে মেতে আছে তাকে একটু চোমরালে, একটু তাতালে, 'শিল্প জগতে আগামী যুগের অগ্রদূত' বা 'জুলিয়াস সীজার' বা 'নাদির শাহ' বা ওইরকম কিছু বলে বর্ণনা করলে তার মাথা ঘুরে যাবেই, আর মাথা

ঘোরাতে পারলেই পয়সা টানা যাবে। তারা জানে অনেক বড় লোকের ছেলে মদ-মেয়েমানুষ আর ঘোড়ায় পয়সা ওড়ায়, আবার কেউ কেউ এই-সব খেয়ালেও ওড়ায়। এই সব উড্ডীয়মান পয়সা যে শেষ পর্যন্ত চতুর ব্যক্তিদের ব্যাংকে গিয়ে নীড় বাঁধে এ কথা তো সুবিদিত। চতুর ব্যক্তিগুলি এই আশা নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভূষণ চক্রবর্তীর খবর পাননি।

বনস্পতি যে একজন খেয়ালী শিল্পী এবং ধনী লোক এ খবরটা কোলকাতায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল বনস্পতির শ্বশুরবাড়িতে। জামাইষষ্ঠীর একটি নিমন্ত্রণেও যায়নি সে। সরস্বতী লিখে জানিয়েছিল, "উনি ছবি-আঁকা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে ওঁকে সময়ে খাওয়ানো-নাওয়ানো যায় না। ছবি নিয়েই দিনরাত মেতে আছেন। ওঁকে আর তোমরা যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কোরো না। আর ওঁর মতো লোককে নিয়ে গিয়ে শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই হবে। উনি এখানে একাই চার-পাঁচটা বড় বড় ঘর নিয়ে থাকেন। কোলকাতায় গলির মধ্যে ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ির খুপরি ঘরে গিয়ে থাকা খুবই কষ্টকর হবে ওঁর পক্ষে।..."

সরস্বতীর বাপের বাড়ি থেকে এই খবর পল্লবিত হল। এ কান সে কান হয়ে শেষকালে তা গিয়ে পৌঁছল রৈবতক গাঙ্গুলীর কানে।

হবুচন্দ্র রাজা যখন প্রথম শূকর দেখেছিলেন তখন সবিস্ময়ে তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ আবার কি রকম জানোয়ার। আগে তো দেখিনি কখনও।" গবুচন্দ্রও দেখেননি, কিন্তু নিজের অজ্ঞতা মহারাজের কাছে প্রকাশ না করে তিনি কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "মহারাজ, এ নতুন কোন জানোয়ার নয়। এর আবির্ভাবের দুটি কারণ আমি অনুমান করছি—হয় গজ-ক্ষয়, না হয় মূষিক-বৃদ্ধি।" শ্রীরৈবতক গাঙ্গুলীর পরিচয় দিতে গিয়ে আমার গবুচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে এবং তাঁর উক্তির অনুকরণে বলতে ইচ্ছে করছে—রৈবতক গাঙ্গুলী হয় এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-ব্রিটানিকা-ক্ষয় অথবা হেমন্ত-কুমার-বৃদ্ধি। রৈবতক গাঙ্গুলীর সামাজিক পরিচয়টাও তুচ্ছ করবার মতো নয়। চাঁছা-ছোলা বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার তিনি, বিনা-বেতনে অধ্যাপনাও করেন একটা

বেসরকারি কলেজে। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় সূর্যচন্দ্রগ্রহতারা নিয়ে লোফালুফি করাটাই তাঁর অভ্যাস, অবসর-বিনোদন করেন 'প্রতিভা' আবিষ্কার করে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটা তিনি বিলেত থেকে শিখে এসেছেন। বিলেতে অনেক সম্ভ্রান্ত-বংশীয় ছেলে-মেয়ের 'হবি' না কি অবহেলিত, অবজ্ঞাত. প্রতিভাবানদের আবিষ্কার করে 'পুশ্' করা। রৈবতক গাঙুলী বিলেতে গিয়ে এই 'হবি'টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ছেলেবেলায় স্ট্যাম্প সংগ্রহ করতেন, এখন 'প্রতিভা'-সংগ্রহে মন দিয়েছেন। ইনি যখন সরস্বতীর পিসতুতো ভাইয়ের কলেজ-সঙ্গিনী চখীর মুখে বনস্পতি মিশ্রের কথা শোনেন তখন টুকে রেখেছিলেন সেটা নোট-বুকে। তখন আসতে পারেননি, কারণ তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর বাড়িওলার ভাইপো সুগ্রীবকে নিয়ে। সে একজন উদীয়মান কবি। কোনও তরুণী নাকি তার গ্রীবার প্রশংসা করেছিল, তাই সাহিত্য জগতে সে নিজেকে 'সুগ্রীব' নামে পরিচিত করেছে। সে 'ছাতারে কাব্য' বলে যে কবিতার বইটি লিখেছে রৈবতক গাঙুলী সেটিকে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে মনে করেন। এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি বক্তৃতা করে প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছেন এ কাব্য কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-পরিধিকে অতিক্রম করেছে, নাম-জাদা সব লোকদের মুখ দিয়ে কলম দিয়ে এই অভিমত ব্যক্ত তিনি করিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মনোমত ফল হয়নি, সুগ্রীবের বই বিক্রি হয়নি মোটে। তিনি তাকে আশ্বাস দিচ্ছিলেন যে আগামীবারে নোবেল পুরস্কার তাকে পাইয়ে দেবেন, কারণ যাঁদের হাতে বিচারের ভার তাঁরা সবাই নাকি তাঁর বন্ধুলোক। কিন্তু বন্ধু ছোকরার খুড়ো, মানে তাঁর বাড়িওয়ালা, বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলেন একটা, বাকি ভাড়ার জন্যে নালিশ করে দিলেন তাঁর নামে। এরপর আর সুগ্রীবের কাব্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাবার উৎসাহ রইল না তাঁর। নিজের প্রেস্টিজ বজায় রাখবার জন্যে বড় রাস্তার উপর বড় একটা বাড়ি নিতে হয়েছিল তাঁকে। সাধ এবং সাধ্যের সামঞ্জস্য করে' চলতে যাঁরা উপদেশ দেন এবং যাঁরা সে উপদেশ শুনে গদগদ হয়ে পড়েন রৈবতক গাঙুলী এদের কোনও দলেরই

নন। তিনি বলেন, তোমার সাধ অনুসারেই তুমি চলতে চেষ্টা কর, পাথেয় জুটেই যাবে কোন-না-কোন উপায়ে। তিনি সুগ্রীবের কাকার বাড়িভাড়া মিটিয়ে দিতেনই, হয়তো দু'দিন দেরি হত, কিন্তু ভদ্রলোকের তর সইল না, একেবারে কোর্টে ছুটলেন।

সুতরাং আবার তাঁকে নোটবুক খুলে সন্ধান করতে হল এরপর কোন্ অবহেলিত 'প্রতিভা'র প্রতি তিনি মনোযোগ দিতে পারেন। দেখলেন তিনটি নাম রয়েছে। প্রথম, জটাধারী দাস, উইদিন ব্র্যাকেট, কমরেড্-বৈষ্ণব। ইনি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশের সন্তান, বড় কীর্তনীয়া, কিন্তু এঁর বিশেষত্ব ইনি কীর্তনের সঙ্গে বোম্বাই টপ্পার সুর মিশিয়ে নূতন ধরনের এক সুর সৃষ্টি করেছেন। আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। ঠিকানা লেখা আছে। বাড়ি স্টেশন থেকে কুড়ি মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তায় যেতে হয়, গরুর গাড়ি ভিন্ন অন্য যান অচল সে পথে। রৈবতক সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করলেন জটাধারীকে। দ্বিতীয় নামটি জর্জেট মাসী, আসল নাম করুণাময়ী বর্মা। ইনি সূচী-শিল্পী। এঁর বিশেষত্ব ইনি পুরোনো জর্জেট কাপড় দিয়ে কাঁথা, দোলাই, সুজ্‌নী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। এককালে এঁর স্বামী অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। এখনও এঁর যাঁরা বান্ধবী তাঁরা সবাই ধনী, তাঁরাই এঁকে পুরোনো জর্জেট সরবরাহ করেন। কিন্তু নিজের অবস্থা এঁর শোচনীয়। স্বামী অনেকদিন আগে মারা গেছেন, পূর্ববঙ্গের জমিদারী পাকিস্তানের কবলে। একটি মাত্র ছেলে বগেন লম্বা চুল রেখে বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়, যা রোজকার করে তাতে নিজেরই চলে না তার। জর্জেট মাসীর যা কিছু সঞ্চিত অর্থ গয়না-গাঁটি ছিল তা ওই ছেলের পিছনেই গেছে। জর্জেট মাসী এখন কোলকাতারই এক অভিজাত-পল্লীতে বাস করেন তাঁর এক খুড়তুতো বিপত্নীক দেওরের বাড়িতে। রৈবতক গাঙুলী তাঁকে 'বঙ্গ-সংস্কৃতি'র আসরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেখানকার কয়েকটি খদ্দরধারী চাঁইয়ের জন্য পারেননি। তাঁরা বলে বসলেন—জর্জেট বাংলার নয়, মস্‌লিন হলে বিবেচনা করে দেখতাম। শিল্পের ক্ষেত্রে এরকম সঙ্কীর্ণ মনোভাব প্রত্যাশা করেননি রৈবতক গাঙুলী। তিনি জর্জেট মাসীর নামটার

দিকে খানিকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলেন, তারপর স্থির করলেন এঁকে নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তাঁর যে দূর সম্পর্কের দেওরটির কাছে থাকেন, তিনি এ বিষয়ে মোটেই উৎসাহী নন। এঁর সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে একবার আলাপ করেছিলেন তিনি, যদি চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা প্রদর্শনী খোলবার জন্যে কিছু অর্থসাহায্য করতে রাজী হতেন তিনি, তাহলে পাব্লিসিটির ব্যবস্থা করা অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। অবশেষে বনস্পতি মিশ্রকেই পল্লীগ্রামের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা সাব্যস্ত করলেন তিনি।

সুখপুরে এসে সৈকত-কাননে পৌঁছতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। সুখপুরে রেল স্টেশন নেই। পাঁচ মাইল দূরের জংসন স্টেশন থেকে গো-যানে কিম্বা পদব্রজে আসতে হয়। স্টেশনে নামবামাত্রই তিনি উপলব্ধি করলেন যে বনস্পতি মিশ্র এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। গাড়ির গাড়োয়ান কুলি সবাই চেনে তাঁকে। প্রথমে অবশ্য একটু মুশকিলে পড়লেন নেবেই। নিখুঁত সাহেবী স্যুট পরে এসেছিলেন, গরুর গাড়িতে চড়লে 'ক্রীজ'গুলো নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য যানও নেই। গাড়িতে আলতোভাবে বসে তিনি নিজে হয়তো যেতে পারবেন, কিন্তু ক্যামেরাটা? বেশ বড় ক্যামেরা তাঁর। ওটাকে গরুর গাড়ির উপর চাপিয়ে নিয়ে যেতে ভয় করছিল, গাড়ির ঝাঁকানিতে ভিতরকার কোনও স্ক্রু আলগা হয়ে যায় যদি?

গাড়ির গাড়োয়ান কিন্তু সমস্যাটার সমাধান করে দিলে। বললে, "আমার ভাই ওটা মাথায় করে নিয়ে যাবে।"

"কত দিতে হবে তোমার ভাইকে এজন্য?"

"কিছু দিতে হবে না সায়েব। আপনি ভদ্দর নোক, বনুবাবুর বাড়িতে যাবেন, এর জন্যে আর আলাদা করে কিছু দিতে হবে না আপনাকে গাড়ির ভাড়া তো দিচ্ছেনই। ভাইটা গাড়িতে করে আমার সঙ্গে এসেছিল। হেঁটে তো ওকে ফিরতেই হবে সুখপুরে, আপনার সঙ্গে বসে তো আর যেতে পারে না, আপনার জিনিসটা নিয়ে চলুক—"

এই অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন রৈবতক। মনে পড়ল বিলেতের এক কান্টি সাইডে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার এক অপরিচিত লোকের কাছে কি সাহায্যই পেয়েছিলেন। সে তাঁকে পোস্টাফিসের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল, কোন্ হোটেলে গেলে ভাল খানা পাওয়া যাবে তাও বলে দিয়েছিল। তার সঙ্গে তুলনীয় লোক যে এদেশের পাড়াগাঁয়েও আছে এ ভেবে বেশ পুলকিত হলেন তিনি। বিস্মিতও হলেন। তাঁর বিস্ময় কিন্তু চরমে পৌঁছল যখন সৈকত-কাননে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি।

সৈকত-কাননের বাড়িটি দেখে ভালো লাগল তাঁর। বনস্পতি যে শাঁসালো ব্যক্তি বাড়িটি দেখেই তা অনুভব করলেন। বারান্দার উপরে উঠতেই দেখা হল বল্লমের সঙ্গে।

"আপনি কে ?"

রৈবতক তাঁর কার্ডটি দিলেন তাকে। কার্ডটি উলটে পালটে দেখে বল্লম সেটি ফেরত দিলে।

"আমি ইংরেজি পড়তে জানি না। আপনি কোথা থেকে এসেছেন ?"

"কোলকাতা থেকে। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"ও। তাহলে আপনি ভূষণ কাকার কাছে যান। ওই ঘরে থাকেন তিনি।"

ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের বন্ধ দ্বারের দিকে দু'এক সেকেণ্ড চেয়ে রইলেন রৈবতক।

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "বনস্পতিবাবু কোন্ ঘরটায় থাকেন ?"

"ভিতরে থাকেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে আগে ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।"

বল্লম তাঁকে সঙ্গে করে ভূষণ চক্রবর্তীর ঘরের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর কপাটটা একটু ফাঁক করে ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে বলল, "কোলকাতা থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন"—বলেই এক ছুটে চলে গেল সে ভিতরে। বেরিয়ে এলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"কি চান ?"

"শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি যে শিল্পী সে কথা আপনি জানলেন কি করে ? তাঁর ছবি তো কোথাও ছাপা হয়নি।"

অপরূপ একটা হাস্যস্নিগ্ধ ভাব ফুটে উঠল রৈবতক গাঙুলীর মুখে। দুটি প্রচলিত উপমা তিনি ব্যবহার করলেন পর পর।

"আগুন কি কখনও চাপা থাকে ? ফুলের গন্ধ কি লুকিয়ে রাখা যায় ?"

ভূষণ চক্রবর্তীর ভ্রূ কুঞ্চিত হল একটু।

প্রশ্ন করলেন, "আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ?"

"এই যে—"

কার্ডটি দিলেন। কার্ডে-ছাপা নামটি দেখে তার ভ্রূযুগল আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল। এ নাম তো তিনি কাগজে দেখেছেন, তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মনে মনে বললেন, "ও, এই তাহলে সেই রাস্‌কেলটা—"

মুখে বললেন, "দেখা হবে না।"

"হবে না! বলেন কি! অতদূর থেকে এসেছি, ক্যামেরা বয়ে এনেছি একটা ছবি তুলব বলে, আর আপনি বলছেন, দেখা হবে না!"

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন ভূষণ চক্রবর্তী—"হবে না।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন রৈবতক।

"আপনি কি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি ?"

"না, আমি ওঁর দারোয়ান।"

"ও।"

রৈবতকের চোখে এক ঝলক সকৌতুক বিস্ময় ফুটে মিলিয়ে গেল।

"দারোয়ান ? কিন্তু আমি তো দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি। আমি এসেছি শিল্পীর কাছে। তিনি যদি দেখা না করতে চান, সেটা মানব, কিন্তু দারোয়ানের কথায় ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। আপনি বরং আমার কার্ডটা তাঁকে দিয়ে আসুন, আর আমি কেন এসেছি

তাও জানিয়ে দিন তাঁকে। আমি তাঁর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখব বলে মাল-মসলা সংগ্রহ করতে এসেছি। তাঁর আর্টের বিষয়ে তাঁর সঙ্গেই আলোচনা করা দরকার। তাছাড়া তাঁর ছবি তুলব, তাঁর ছবিরও ছবি তুলব—”

ভূষণ চক্রবর্তীর খোঁচা খোঁচা ঘন গোঁফ ছিল। গোঁফের চুলগুলো নড়তে লাগল। নাকের নীচেটাও কেঁপে উঠল, ঠিকরে বেরিয়ে এল চোখ দুটো। মনে হল এখনই বুঝি তিনি রৈবতকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেবেন তাঁকে। কিন্তু তা না করে একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি বললেন, “ওসব কিছু হবে না, আপনি ফিরে যান।”

রৈবতক এবার চটেছিলেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত মার্জিত-রুচি লোক তিনি, মনের ভাব চেপে রাখবার অসীম ক্ষমতা তাঁর। তাই একটু মোলায়েম মুচকি হেসে তিনি বললেন, “আপনার ব্যবহারে সত্যিই আমি আশ্চর্য বোধ করছি। আপনার এই বিরুদ্ধ মনোভাবের হেতুটা জানতে পারি কি ?”

“ঘেয়ো নেড়ী কুকুরকে মন্দিরে ঢুকতে দেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। বৈঠকখানাতে তাকে ঢুকতে দিই না, হাতাতেও না, সে যদি বিলিতি স্যুট প'রে আসে তাহলেও না।”

রৈবতক এদিক-ওদিক চাইলেন একবার। তাঁর সন্দেহ হল লোকটা পাগল নয় তো! যে ছেলেটি তাঁকে এর কাছে দিয়ে গেল, তারই সন্ধানে তাঁর চোখের দৃষ্টিটা একবার ঘুরে এল চারিদিকে, কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। পকেট থেকে মুসলমানী-লুঙ্গির টুকরোর মতো একটা রুমাল বার করে কপালটা আর মুখটা মুছে ফেললেন। তারপর ভূষণ চক্রবর্তীর দিকে চেয়ে বললেন, “আমাদের দেশের ঐতিহ্য পাড়াগাঁয়ে বেঁচে আছে আমরা শহুরে মানুষরা এই কথাই শুনে এসেছি বরাবর। স্টেশনে নেবে তার একটু পরিচয়ও পেয়েছিলাম গাড়োয়ানটার কাছে, আশা ছিল তার পরিপূর্ণ রূপটি দেখতে পাব আপনাদের সান্নিধ্যে, যে আতিথেয়তা আমাদের দেশের প্রত্যেক অতিথির ন্যায্য পাওনা সেটুকু থেকে আমাকে অন্তত বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু আপনার ব্যবহারে—”

ভূষণ চক্রবর্তী তাঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না।

"অচেনা একটা লোককে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কর্তার কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করতে কেউ দেয় না কখনও। ভুল ধারণা আছে আপনার। ক্যামেরা নিয়ে ফোটো তুলতেও দেয় না। আর আপনি তো অচেনা অতিথি নন, আপনাকে খুব ভাল করে চিনি আমি। আপনার মতো মতলববাজের সঙ্গে কথা কয়ে আমি যে সময় নষ্ট করেছি এইটেই কি যথেষ্ট নয়?"

মতলববাজ কথাটা চাবুকের মতো আঘাত করল রৈবতক গাঙ্গুলীকে। কিন্তু তবু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

"আপনি আমাকে চেনেন? আমার তো মনে পড়ছে না এর আগে কখনও আপনাকে দেখেছি।"

"না, দেখেননি। আমিও আপনাকে দেখিনি।"

"তবে আমাকে মতবলবাজ বলে চিনলেন কি করে?"

"চেহারা দেখে মতলববাজকে চেনা যায় না, চেনা যায় তার চালচলন থেকে। আপনার চালচলনের খবর পেয়েছিলাম খবরের কাগজের কৃপায়। আপনিই তো সেই রৈবতক গাঙুলী যিনি হনুমান, না সুগ্রীব কার ল্যাজে তেল দিয়েছিলেন হাবাতে কাব্য, না ছাতারে কাব্য, না ন্যাকড়া কাব্য নিয়ে? নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন বাংলার সব কবিদের ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে আর ছাপিয়েছিলেন আপনার সেই অমূল্য ভাষণ সম্পাদকের খোশামোদ করে? সেই লোকই তো আপনি। সেই হনুমানটার কাছ থেকে কত টাকা মেরেছিলেন?"

এবার রৈবতক একটু অপ্রতিভ হলেন সত্যি সত্যি। আশ্চর্য, মুখের মার্জিত হাসিটি কিন্তু মলিন হল না। বরং সেটিকে আর একটু মার্জিত করে বললেন, "আপনার মতো রূঢ় অভদ্র ভাষা ব্যবহার করবার শিক্ষা আমার নেই। 'ছাতারে কাব্য' এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত আমি ব্যক্ত করেছি সেটা আমার নিজস্ব মত, সে মত ব্যক্ত করবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।"

"আপনার ওই নিজস্ব মতের জন্য আপনাকে আমার এলাকা থেকে

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দূর করে দেবার অধিকারও আমার নিশ্চয়ই আছে। আপনি চলে যান, আপনাকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করতে চাইনে—"

"শিল্পীর সঙ্গে তাহলে দেখা হবে না কিছুতেই।"

"কিছুতেই না।"

পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"এখানে কোনও হোটেল আছে?"

"না।"

"তাহলে কোথায় যাই বলুন, খাওয়া দাওয়াই বা করব কোথায়?"

"ওই বেঞ্চিটায় বসুন। আমার কাছে যা খাবার আছে দিচ্ছি। খেয়ে আপনি স্টেশনেই ফিরে যান, একটু পরেই ট্রেন পেয়ে যাবেন।"

ভূষণ চক্রবর্তী ভিতরে ঢুকে গেলেন এবং একটু পরে একটি মাটির খুরিতে করে কিছু ছোলা-ভিজে আর গুড় নিয়ে এসে ঠক্ করে নামিয়ে দিলেন সেটা তাঁর পাশে। তারপর ঢুকে গেলেন ঘরে। পর মুহূর্তেই তার ঘরের কপাটটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ভিতর থেকে চীৎকার করে কি যেন বললেন কাকে। একটু পরে একটা চাকর চকচকে কাঁসার ঘটিতে করে এক ঘটি জল দিয়ে গেল।

রৈবতক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর উঠে পড়লেন।

...ঘণ্টা দুই পরে তাঁকে দেখা গেল জাহ্নবী-নিবাসে সাবু মিত্তিরের দপ্তরে। সাবু মিত্তির তাঁর সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন, তাঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, ভূষণ চক্রবর্তীর হাতে তাঁর লাঞ্ছনার কথা শুনে আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে একথা বলতেই হল যে বনস্পতির সঙ্গে দেখা করতে হলে ওই অভদ্র ভূষণ চক্রবর্তীরই মত নিতে হবে। তাঁর অমতে দেখা হবে না।

"শিল্পী বনস্পতি কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হয়ে থাকবেন এ-কথা তো ভাবাই যায় না।"

"বনুদা নিজেই ওঁকে সে অধিকার দিয়েছেন, লিখে দিয়েছেন।

"বলেন কি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রৈবতক কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, "এতদূর থেকে খরচ পত্তর করে এসেছি, একবার দেখা না করে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। আপনি গিয়ে ভূষণবাবুকে একটু অনুরোধ করতে পারেন না?"

"না, ওইটি পারব না। আমি তাঁর কাছে পারতপক্ষে যাই না। তবে হিমুদা সৈকত-কাননে যান। তিনি যদি কিছু পারেন দেখি, আপনিও আসুন না।"

হেমন্তকুমারের সঙ্গে ভূষণ চক্রবর্তীর সংঘর্ষের খবরটা সাবু পায়নি। আগেই বলেছি খবরটা হেমন্তকুমার কারো কাছে প্রকাশ করেনি। রৈবতক গাঙ্গুলীকে নিয়ে সাবু যখন গেল তার কাছে তখনও খবরটা ভাঙল না সে। রৈবতককে খুব আদর-যত্ন করে বসাল, নিজের হাতে তৈরি করে 'কফি' খাওয়াল (সুখপুর গ্রামে একমাত্র হেমন্তকুমারই কফি খেত), তারপর একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললে, "আমি জানতুম মরুভূমিতেই লোকে মরীচিকা দেখে, শস্যশ্যামল বাংলা দেশের সমতলেও যে ও-জিনিস দেখা যায় তা জানা ছিল না।"

হেমন্তকুমারের বাক্-ভঙ্গীতে খুশি হলেন রৈবতক। তাঁর আহত-আত্মসম্মানের নিদারুণ ক্ষতে একটু যেন স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ল এতে।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, "চিরকালই মরীচিকার পিছনেই দৌড়চ্ছি মশাই। মরীচিকার পিছনে দৌড়তে দৌড়তে লণ্ডন প্যারিসেও গিয়েছিলাম, আবার সুখপুরেও এসেছি। কিন্তু এখানে যে রকম ঘা খেলাম, এমনটা আর কোথাও খাইনি।"

"ও, ভূষণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি! ভূষণ একটু কড়া লোক, কিন্তু লোক ভাল—"

"দেখুন না যদি শিল্পীর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দিতে পারেন।"

"শিল্পী? দামী কাগজে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ক'রে রং লাগালেই শিল্পী হয় না কি! যাই হোক চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে নেওয়াই ভালো—"

"কিন্তু আপনি সাহায্য না করলে সেটা তো হবে না।"

"দেখি।"

হেমন্তকুমার সেই যে বেরিয়ে গেল আর ফিরল না।

তার ছেলে সড়কি একটু পরে এসে খবর দিলে—"বাবা একটা জরুরি দরকারে শিয়ালমারিতে চলে গেছে। ফিরতে দেরি হবে।"

সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রৈবতক গাঙ্গুলীকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হল অবশেষে।

*

রৈবতক গাঙ্গুলী ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু নিরস্ত হলেন না।

পত্রযোগে হানা দিলেন বনস্পতির কাছে। তাঁর আশা ছিল এইবার তিনি ভূষণ-চক্রবর্তী-রূপ ঘোড়া ডিঙিয়ে বনস্পতি-রূপ ঘাসটি খেতে পারবেন। কিন্তু এবারও হতাশ হতে হল তাঁকে। কারণ বনস্পতি তাঁর চিঠিটি ভূষণ চক্রবর্তীর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছিল উত্তর দেবার জন্য। ভূষণ চক্রবর্তী সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দিলেন—"সবিনয় নিবেদন, আপনি শ্রীবনস্পতি মিশ্রকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহার উত্তরে জানাইতেছি যে তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। এ সম্পর্কে আর কোন পত্রালাপ করিতেও তিনি ইচ্ছুক নহেন। ইতি—"

রৈবতক গাঙ্গুলী একটি মাত্র নমুনা। বাইরে থেকে আরও অনেক লোক এসেছিল, কিন্তু তারা কেউ ভূষণ চক্রবর্তীকে কায়দা করতে পারেনি। দশ বছর ধরে মূর্তিমান নিষেধের মতো তিনি দাঁড়িয়েছিলেন বনস্পতির দরজার সামনে। অবশ্য সবাইকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, বনস্পতির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিত কিছু কিছু সমঝদার ঢুকে পড়েছিল অন্দরমহলে। কিন্তু তারা খুব বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। কারণ একটু বেগতিক দেখলেই বনস্পতি স্বয়ং ডেকে পাঠাতেন ভূষণ চক্রবর্তীকে, আর বলতেন, "ভূষণ, ইনি তোমার বৌদির পিসতুতো ভাই, খুব রসিক লোক, শিবু ময়রার দোকান থেকে কিছু ভালো রসগোল্লা আনাও দিকি"—এটি ছিল তার ইঙ্গিত। ভূষণ

চক্রবর্তী রসগোল্লা আনাতেন এবং আড়ালে সরস্বতীকে বলে আসতেন, "বৌদি, দেখবেন আপনার ভাইটি মত্ত মাতঙ্গের মতো শিল্পীর কমল বনে যেন ঢুকে না পড়েন।" সরস্বতীও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন খুব। তাঁর বাপের বাড়ির লোকেরা যাতে বনস্পতিকে বিরক্ত না করে সে বিষয়ে কড়া নজর ছিল তার। আর তারা আসতও ক্বচিৎ।

পাঁচ

...এই ভাবেই চলছিল।

কিছুদিন পরে এদের পারিবারিক জীবনে প্রধান ঘটনা ঘটল একটি। বনস্পতির একটি কন্যাসন্তান হল। বাচস্পতির কোন ছেলে-মেয়ে হয়নি, তিনি খুব মেতে উঠলেন এতে। ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়া তো হলই, 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি বিশেষ সংখ্যাই বের করে ফেললেন তিনি। তার থেকে সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"গত বৈশাখী পূর্ণিমার শুভলগ্নে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় শ্রীমান বনস্পতির একটি সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মিশ্র পরিবারের সকলে যে অবিমিশ্র আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় কন্যাটির ঠিকুজি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে কন্যার তুঙ্গী সূর্য, তুলা লগ্ন এবং তুলা রাশি হওয়াতে কন্যার সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমা ভগবান বুদ্ধদেবেরও জন্মদিন। ইহাও অনেকে বলিতেছেন যে আমাদের স্বর্গগতা জননীর মুখাবয়বের সহিত শিশুকন্যার মুখাবয়বের নাকি সাদৃশ্য আছে। ইহাও অনেকের অনুমান তিনিই নাকি বনস্পতির কন্যারূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা কঠিন। কন্যার নামকরণ লইয়া একটু মতদ্বৈধ হইয়াছে। বনস্পতির ইচ্ছা কন্যার নাম 'বর্ণ' হউক। শ্রীমান শিল্পী, সুতরাং বর্ণই তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। সেদিক দিয়া নামকরণ

ঠিকই হইয়াছিল, কিন্তু শ্রদ্ধেয় শিরোমণি মহাশয় ইহাতে ব্যাকরণের অসঙ্গতি দেখিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন সংস্কৃত ভাষায় 'বর্ণ' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। বাংলা ভাষার ব্যবহারিক প্রয়োগে কোন কোন স্থলে তাহা পুংলিঙ্গ রূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন ভাষাতেই 'বর্ণ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং কন্যার নাম বর্ণ দিলে তাহা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হইবে না। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে 'বর্ণ' শব্দটির প্রতি বনস্পতির যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহা হইলে নামটিকে আর একটু দীর্ঘ করিয়া 'বর্ণ-বতী' করা যাইতে পারে। তাহা হইলে উভয় দিকই রক্ষিত হইবে। শ্রীমান বনস্পতি কিন্তু অত দীর্ঘ নাম পছন্দ করিতেছে না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে মধ্যপথ অবলম্বন করিলে কেমন হয়, তিন অক্ষরের 'বর্ণনা' নামটি রাখিলে ক্ষতি কি? শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং ইহার আভিধানিক অর্থ দীপন, রঞ্জন প্রভৃতি। রঞ্জাবতীর পৌত্রীর পক্ষে এ নাম বেমানান হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

এর পর সুখপুরের মিশ্র-পরিবারে যে সব ঘটনা ঘটেছে তাতে অসাধারণত্ব কিছু নেই। তা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনাপুঞ্জের আবর্তন এবং পুনরাবর্তন মাত্র। এই কাহিনীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাগুলি ঘটেছে 'সুখপুর-পত্রিকা'র প্রায় কুড়ি বছরের ফাইল ঘেঁটে তা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি, প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করবার জন্য।

"শ্রীমতী বর্ণনার কলিকাতা যাত্রা। শিল্পী শ্রীমান বনস্পতি মিশ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বর্ণনা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য গতকল্য কলিকাতা গিয়াছে। শ্রীমতীর বয়স মাত্র দশ বৎসর। এতদিন গৃহেই সে শিরোমণি মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতেছিল, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় অতি-বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি এমন কি চলচ্ছক্তিও ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে। শারীরিক

অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি উৎসাহের সহিত শ্রীমতীর অধ্যাপনা করিতে-ছিলেন, কিন্তু বনস্পতির মতে এ বয়েসে তাঁহার উপর আর চাপ দেওয়া উচিত নহে। তাছাড়া আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নির্দেশ ছিল যে আমরা যেন আমাদের বংশধরদের কলিকাতায় পাঠাইয়া আধুনিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করি। পিতৃদেবের অন্তিমকালীন এ উপদেশ অমান্য করা অনুচিত মনে হওয়াতে আমরা শ্রীমতীর শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতাতেই করিয়াছি। সে কলিকাতায় 'কন্‌ভেণ্ট' নামক বিদ্যালয়ে ভরতি হইবে এবং সেই বিদ্যালয়েরই ছাত্রীনিবাসে থাকিবে। শ্রীমতীর মাতুলালয়ও কলিকাতায়। সেখানে থাকিয়াও সে পড়িতে পারিত, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। তাহার মাতামহ মাতামহী উভয়েই কিছুকাল পূর্বে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাহার একমাত্র মাতুল একটি ধনী কন্যার পাণিপীড়ন করিয়া ইংলণ্ডে সস্ত্রীক প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছে জনশ্রুতি সেইখানেই সে নাকি উপার্জনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এদেশে আর ফিরিবে না। কলিকাতায় তাহাদের বাসাও আর নাই, কারণ তাহারা ভাড়াটিয়া বাসাতে বাস করিত। সুতরাং ছাত্রী-নিবাসেই শ্রীমতীর থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ ও নাগরিক জীবন যাপন করিয়া শ্রীমতী যেন ভারতীয় নারীত্বের মর্যাদাকে নূতন অলঙ্কারে ভূষিত করিতে সমর্থ হয়।"

দ্বিতীয় খবরটি সাত বছর পরের।

"কলিকাতার বিদ্যালয়ে শ্রীমতী বর্ণনার কৃতিত্ব। শ্রীমতী বর্ণনা এবার প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরেজি, বাংলা এবং সংস্কৃতে সম্মানসূচক অক্ষর (লেটার) লাভ করিয়াছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ আশা করেন শ্রীমতী হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভও করিবে। এ সংবাদ আমাদের সকলের পক্ষেই নিঃসন্দেহে আনন্দজনক, কিন্তু সম্প্রতি একটি দুর্ঘটনা ঘটাতে সে আনন্দ কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর হইতেই গঙ্গার ধারা সুখপুর গ্রামের কোল

ঘিয়া বহিতেছিল, এবার বর্ষায় তাহা উদ্দাম হইয়া আমাদের গঙ্গাতীরস্থ 'জাহ্নবী-নিবাস' নামক অট্টালিকাটিকে গ্রাস করিয়াছে। এ পারের অনেক স্থানেই ভাঙন ধরিয়াছে, অনেকের জমি কাটিয়া গিয়াছে। আমাদের জমিও রক্ষা পায় নাই। গঙ্গার এ-কূলবাসী অনেকের মনেই ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে, হইবারই কথা, কারণ সর্বনাশ আসন্ন। মা গঙ্গার গতি যদি এইরূপই থাকে এবং জননী যদি তাঁহার সংহারিণী প্রবৃত্তি সংবরণ না করেন, তাহা হইলে এ অঞ্চলের বহু পরিবার উৎসন্ন হইবে। 'জাহ্নবী-নিবাস' গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হওয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশি বিব্রত হইয়াছেন হেমন্তকুমার। তিনি তাঁহার একাদশটি পুত্রকন্যা লইয়া জাহ্নবী-নিবাসে বাস করিতেন। জাহ্নবী-নিবাসের চারিপাশে তিনি একটি সুন্দর সব্‌জিবাগও করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের ইটালীদেশীয় বাঁধা-কপির অপরূপ বর্ণ-বৈশিষ্ট্য ও সুস্বাদ এ গ্রামের অনেকেরই হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, মা গঙ্গা সবই গ্রাস করিলেন। ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। গ্রামে অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসংকীর্তন এবং দৈনিক গঙ্গা-পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

তৃতীয় খবর আরও তিন বছর পরের।

"মিশ্র পরিবারের কলিকাতা যাত্রা। বিগত কয়েক সংখ্যায় মিশ্র-পরিবারের বৈষয়িক সর্বনাশের কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গার তীরে তীরে আমাদের যত ধানের জমি ছিল মা-গঙ্গা সবই একে একে গ্রাস করিয়াছেন। সৈকত-কাননও রক্ষা পায় নাই। শিল্পী বনস্পতি তাহার পিতামাতার যে সিমেন্ট মূর্তিগুলি নির্মাণ করিয়াছিল সে দুইটিও গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। আমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সকল দুর্লভ বৃক্ষলতাদি সৈকত-কাননে রোপণ করিয়াছিলেন সেগুলিও আর নাই। গত সপ্তাহে গঙ্গার ধারা সৈকত-কাননের মনোরম সৌধটির অতি সন্নিকটে আসিয়া পড়াতে বনস্পতি মিশ্র সপরিবারে তাহার অঙ্কিত দুই শতাধিক চিত্রসহ তাহার পুরাতন বসতবাটিতে

সরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। হেমন্তকুমার পূর্ব হইতেই সেখানে আসিয়াছিল; তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্যা, কয়েকটি বেশ বড় হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন বসতবাটিতেও স্থানাভাব ঘটিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্নাভাব ঘটিবারও সম্ভাবনা। কারণ যে জমি আমাদের অন্ন সরবরাহ করিত তাহা আর নাই। পোস্টাফিসে যৎসামান্য যাহা সঞ্চিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা কোনক্রমে কালাতিপাত করিতেছিলাম, কিন্তু গত পরশ্ব হইতে গঙ্গার আবর্তসংকুল ভয়ঙ্করী ধারা আমাদের পুরাতন বসতবাটির দিকেও অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সুখপুর হইতে এবার আমাদের বাস উঠিল। শ্রীমতী বর্ণনা কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়াছে, সেইখানেই আমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। শ্রীমতী বর্ণনা বলিল পরিবারের লোকসংখ্যা অল্প হইলে একটি ছোট পাকা বাড়িতেই সংকুলান হইয়া যাইত। মাসিক ষাট টাকা ভাড়ায় সে একটি বাড়ি যোগাড়ও করিয়াছিল, কিন্তু হেমন্তকুমারের পরিবারবর্গকে লইয়া সেখানে কুলাইবে না। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে নবীনগঞ্জে হেমন্তকুমারের মাতুলালয়। সে সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিত। কিন্তু শ্রীমান বনস্পতির তাহা ইচ্ছা নয়। বনস্পতি বলিয়াছে আমরা যেখানেই থাকি একসঙ্গে থাকিব। দুঃখে পড়িয়াছি বলিয়া নিজেদের হস্তপদাদি আমরা যেমন বিসর্জন দিই না, যাহাদের সহিত এতকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি সেই আত্মীয়-স্বজনদেরও তেমনি বিসর্জন দিব না। হেমন্তকুমারের ছেলেমেয়েগুলি বনস্পতির খুব প্রিয়। সুতরাং শিল্পীর ইচ্ছা অনুসারে বর্ণনা এক বস্তিতে চারিটি বড় বড় খোলার ঘর ভাড়া করিয়াছে। আগামীকল্য আমরা সেইখানেই যাইব। পিতৃ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া যাইতে খুবই কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ইহা ছাড়া গত্যন্তরও তো নাই। সবই যে গঙ্গাগর্ভে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে রহিল কেবল আমাদের 'বুড়ির জঙ্গল' বনকরটা, সেটা গঙ্গার তীর হইতে কিছু দূরে। পুরাতন সুখপুরের অস্তিত্ব লোপ পাইল, দেখা যাক নূতন কোন সুখপুরের সন্ধান পাওয়া যায় কি না।"

দ্বিতীয় পর্ব

এক

সেদিন খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল নবনী রায়ের। নবনী রায় কোনও ভাঙা জিনিসকেই জোড়া লাগাবার চেষ্টা করে না, ভাঙা ঘুমও নয়। সে বিছানায় উঠে বসল, মাথার দিকের জানলাটা ভাল করে খুলে দিলে, তারপর সিগারেটটি ধরিয়ে চীৎকার করে উঠল—"প্রহ্লাদ—"। সকালে উঠেই এইটি তার প্রথম কাজ, ঠাকুর-দেবতার নাম করা নয়। খোলা জানলাটির সামনে বিছানায় বসে সামনের রাস্তাটির দিকে চেয়ে সে ধীরে ধীরে সিগারেটটিতে টান দিতে থাকে যতক্ষণ না প্রহ্লাদ চা দিয়ে যায়। সিগারেটটি নিঃশেষ হওয়ার পরও যদি চা না এসে পৌঁছয় তাহলে দ্বিতীয় আর একটি সিগারেট ধরিয়ে দ্বিতীয় আর একটি ডাক দেয় সে। তৃতীয় সিগারেট ধরাবার বা তৃতীয় ডাক দেবার দরকার প্রায়ই হয় না, চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রহ্লাদ এসে পড়ে।

প্রহ্লাদ ব্যক্তিটি দুর্বোধ্য। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে নবনী যখন বাসায় থাকে না তখন সে লুকিয়ে ডাক্তার সুকুমার সামন্তের জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে প্রৌঢ়া নার্স সুবাসিনীর কাজ-কর্ম ক'রে দিয়ে আসে, বোঝবার উপায় নেই যে তার বয়স ষাটের কাছাকাছি, বোঝবার উপায় নেই যে সে বিহারী। প্রহ্লাদের একটি চুলও পাকেনি, একটি দাঁতও পড়েনি, চমৎকার বাংলা বলে। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে সে যে কখন যায় তা নবনী জানতেও পারে না, কারণ বাসায় ফিরে সে প্রহ্লাদকে অনুপস্থিত দেখেনি কখনও। এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছিল বিশেষ কোনও গুণের জন্য নয়, ডাক্তার সামন্তর ক্লিনিকটি নবনীর বাসার খুব কাছে বলে নবনী বাসায় ঢুকলেই প্রহ্লাদ ক্লিনিকের জানলা থেকে স্পষ্ট দেখতে পেত সেটা।

…সেদিন সকালে জানলা খুলেই নবনী দেখতে পেল যে কুয়াশা হয়েছে, পাতলা মসলিনে যেন চারদিক ঢাকা। নবনী কবিতা লেখে না, কিন্তু কবি-প্রকৃতির। তাই তার মনে হল আকাশলোক থেকে কোনও অশরীরিনী অভিসারিকা নিশীথ রাত্রে হয়তো এসেছিল এখানে, এখনও

ফিরে যেতে পারেনি, অপ্রত্যাশিতভাবে ভোর হয়ে গেছে, নিজের ওড়নার আড়ালে হয়তো এখনও সে লুকিয়ে আছে, কিম্বা নেই, হয়তো আলোর পথেই সে ফিরে গেছে আকাশে···হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার বাসার ঠিক সামনেই রাস্তার ওধারে কালো স্তূপের মতো কি একটা যেন রয়েছে। সিগারেটে ধীরে ধীরে টান দিতে দিতে অসম্ভব রকম একটা কল্পনা করে বসল সে। ওটা ওই আকাশচারিনী অভিসারিকার বিরহ-বেদনার স্তূপ নয় তো? হয়তো সে আর বইতে পারছিল না বিরহ-বেদনার গুরুভার, তাই সেটা নামিয়ে দিয়েছে পথের ধুলোর উপরই, অতিশয় সসঙ্কোচে কিন্তু নিরুপায় হয়ে। খুব আস্তে আস্তে সিগারেটে টান দিতে দিতে সে কল্পনায় আরও রং চড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় কুয়াশাটা কেটে গেল, দেখা গেল, ওটা স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা নয়, তিরপল-ঢাকা প্রকাণ্ড একখানা 'মোটর লরি'।

ঠিক এই সময় প্রহ্লাদ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

নবনী তার দিকে ফিরে বলল, "প্রহ্লাদ, তুই যদি আমার চোখের সামনে দেখতে দেখতে এখুনি ইঁদুর কিম্বা ব্যাং হয়ে যাস তাহলে কি রকম হয় সেটা?"

প্রহ্লাদ তার মনিবটিকে চেনে তাই মাত্র মুচকি হাসিটুকু হেসে চলে গেল, কোন মন্তব্য করা নিরাপদ মনে করল না। তার চক্ষে নবনী রহস্যময় ইলেক্‌ট্রিক্ যন্ত্রের মতো, ঠিক ভাবে নাড়াচাড়া করলে চমৎকার, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই 'শক্' খাবার ভয় আছে।

নবনী চায়ের কাপে একটা লম্বা-গোছের চুমুক দিয়ে তিরপল-ঢাকা লরিটার দিকেই চেয়েছিল, ফলে, পরের চুমুকটা দিতে একটু দেরি হল তার। তিরপল-ঢাকা লরির ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল বর্ণনা। বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল সে, তারপর হাত তুলে থামাল একটা চলন্ত রিক্‌শাকে। রিক্‌শাওলাটার সঙ্গে কি কথা হল তার, তারপর সেই রিক্‌শাওলাটাই আরও খানকয়েক রিক্‌শা ডেকে নিয়ে এল। এরপর দুজন ময়লা হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা লোক আবির্ভূত হল কোথা থেকে। লরিরই ড্রাইভার এবং ক্লিনার সম্ভবত।

তারা ত্রিপল খুলতে লাগল। তারপর এল লাঠি আর বল্লম। নবনী রায় এদের কাউকেই চিনত না, কিন্তু সেটা তার কাছে খুব বড় বাধা বলে মনে হল না। কারণ সে জানে পৃথিবীতে কেউ কাউকে চেনে না, সবাই সবাইকে চেনার ভান করে এবং তার মধ্যে থেকেই কিছু আনন্দ, কিছু রোমান্স, কিছু দুঃখ, কিছু হতাশা ভোগ করে' যে যার নিজের পথে চলে যায়, কিন্তু যেটা তার কাছে অসুবিধাজনক বাধা বলে মনে হচ্ছিল সেটা হচ্ছে এই যে সে আলাপের কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছিল না। সে ঠিকই করে ফেলেছিল এদের সঙ্গে আলাপ করে এদের নিয়েই আজ দিনটা শুরু করবে। যে ব্যাপার নিয়ে সে এতদিন নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিল তা শেষ হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। কন্যাদায়গ্রস্ত নীলাম্বর-বাবুর কন্যাটির শুভ-বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেছে। যে মাদ্রাজী বন্ধুটির ফটোগ্রাফের দোকান-ঘর ঠিক করে দেবে বলেছিল তাও হয়ে গেছে, তার জন্যে বড় রাস্তার উপর ভাল ঘরই পেয়েছে সে একটা। এখন তার হাতে আর কাজ নেই, একটা যোগাড় করবার জন্য সে চা খেয়ে বেরুবে ঠিক করছিল, এমন সময় ঠিক তার বাসার সামনেই এই কাণ্ড। প্রথমেই কুয়াশার ওড়না গায়ে আকাশচারিনী অভিসারিকার আবির্ভাব ও তিরোভাব, তারপরই এই লরি, লরির পাশে রূপসী একটি মেয়ে, খানকয়েক রিক্‌শা, দুটি ছোকরা, মেয়েটির মুখে একটু বিষণ্ণ বিব্রত ভাব—হঠাৎ নবনী রায়ের কল্পনাকে সজীব করে তুলল। কি সূত্রে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়বে হঠাৎ সেইটেই ঠিক করতে পারছিল না সে। একটা রিক্‌শাওলাকে দেখে সেটাও ঠিক হয়ে গেল। এক নিশ্বাসে চা-টা শেষ করে নেবে গেল সে। রিক্‌শাওলা ঝকসু তার চেনা লোক, এই পাড়াতেই থাকে, অনেকবার সে তার রিক্‌শায় চড়েছে। বন্ধুত্ব আছে ওর সঙ্গে।

তাকে ডেকে বললে—"চল্ গড়পারে পৌঁছে দে আমাকে।"

"আমি তো বাবু ভাড়া গছে নিয়েছি।"

নবনী তখন বর্ণনাকে নমস্কার করে বললে, "ও, আপনি ভাড়া করেছেন বুঝি এটা? সবগুলোই ভাড়া করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনারা তো মাত্র তিনজন দেখছি। কিন্তু রিক্‌শা তো দেখছি আটটা—"

"ওতেও কুলুবে না। রিক্‌শাতে আমরা কেউ যাব না, ছবি যাবে এক লরি সব ছবি।"

"বলেন কি! নীলামের ব্যাপার নাকি কোনও?"

"না। আমার বাবার আঁকা ছবি। তিনি দেশে থাকতেন, সম্প্রতি এখানে এসেছেন—"

"ও, আপনার বাবার আঁকা!"

সম্ভ্রম ফুটে উঠল নবনী রায়ের চোখে মুখে।

"কোথায় এসে উঠেছেন তিনি?"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "বাসা এখনও ঠিক হয়নি, এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছি আমরা।"

এই মিথ্যাভাষণটুকু করে বর্ণনা ছবি নামাতে আরম্ভ করল লাঠি আর বল্লমের সহায়তায়। নবনী রায় দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট, অবাক হয়ে গেল দু'একটা ছবি দেখে। সে ছবির খুব সমঝদার নয়, কিন্তু ছবিগুলি যে সাধারণ পর্যায়ের নয়, তা বুঝতে দেরি হল না তার। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে অশোভন হচ্ছে তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু তবু সে সরতে পারছিল না সেখান থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরতেই হল, কারণ আর একটা রিক্‌শা এসে পড়ল এবং তাতে চড়তেই হল তাকে না চড়লে বর্ণনার সন্দেহ হত। রিক্‌শা চড়ে সোজা চলে গেল কিছুদূর, একটা চায়ের দোকানে নেমে আর একবার চা খেলে, তারপর বাড়িতেই ফিরে এল আবার। এসে দেখলে তখনও লরি থেকে ছবি নামানো চলছে। সে সোজা উঠে চলে গেল তার তেতলার ঘরটিতে। আর একটি সিগারেট ধরিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল মেয়েটির কার্যকলাপ।

নবনী রায়ের উক্ত আচরণ থেকে যদি আপনাদের মনে এই ধারণা হয় যে লোকটি আধুনিক যুগের সেই শ্রেণীর লোক যারা যুবতী

তরুণী দেখলেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হয় কবিতা লেখে, না হয় পিছু নেয়, না হয় প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করবার জন্যে উদ্বাহু হয়ে নাচতে থাকে—তাহলে আপনাদের সে ধারণাটা বদলাতে হবে। নবনী রায় বর্ণনাকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল সত্য, কিন্তু এর আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল ন্যুব্জদেহ নীলাম্বরবাবুকে দেখে যার পঞ্চম কন্যার পাত্র জোটাবার জন্যে সে সমস্ত কোলকাতা শহর চষে ফেলেছিল। তার আগে সে আকৃষ্ট হয়েছিল এক দরিদ্র কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত পরিবারের প্রতি, তার আগে এক চানাচুর ফেরিওলাকে নিয়ে কাটিয়েছিল কিছুদিন, এরকম আরও অনেক উদাহরণ আছে। নবনীর জীবন-চরিত যদি কেউ কখনও লেখে বা অনুধাবন করে তাহলে এই কথাটাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে যদিও সে অবিবাহিত, যদিও তার কল্পনাশক্তি এবং ভাব-প্রবণতার অভাব নেই, তবু মেয়েমানুষ সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এ যাবৎ। "নারী নরকের দ্বার" অথবা "অপ্সরী না হলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করব না"—এ ধরনের কোনও আজগুবি খেয়ালের বশে সে যে একাজ করেছে তা ঠিক নয়। করেছে কারণ সে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী। ইংরেজিতে যাকে 'এস্‌কেপিস্ট' বলে তাও ঠিক নয় সে, কারণ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে গা বাঁচিয়ে সে সরে পড়েনি কখনও, বরং অপরের ঝামেলা স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে বরাবর। এই 'স্বেচ্ছা' কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে জানে নারী-নিগড়ে বাঁধা পড়লে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা কোনও ভদ্রলোকের করা উচিত নয়। সে সন্ন্যাসী হতে পারত, কিন্তু সন্ন্যাসী হতে হলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তাও তার ছিল না। ষড়রিপুর মধ্যে প্রথম চারটি রিপুর কবলমুক্ত হতে পারেনি সে, হবার তেমন আগ্রহও ছিল না, যদিও ওই রিপুগুলির প্রকোপে পড়ে পাঁকেও লুটিয়ে পড়েনি সে কখনও। সুতরাং সংসারী না হয়েও সংসারে থাকবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল তাকে। বাবা-মা অথবা ভাই-বোন থাকলে বিয়ে না করেও হয়তো সংসারী হয়ে থাকতে হত তাকে কিছুদিন। কিন্তু সে সব তার

কিছুই ছিল না। বাবা-মা মারা গিয়েছিলেন তার ভাল করে' জ্ঞান হবার পূর্বেই, ভাই-বোনও হয়নি। তাকে মানুষ করেছিলেন তার বাবার এক অবাঙালী বন্ধু, টাকার বিনিময়ে। মিলিটারি কণ্ট্রাক্টার ছিলেন তার বাবা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রচুর টাকা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে আবিষ্কৃত হল দশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা করে গেছেন তিনি। নবনীর জন্মের বছরখানেক পরেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা 'পেইং গেস্ট' হয়ে তাঁর অবাঙালী বন্ধুটির বাড়িতেই থাকতেন। তাঁর মৃত্যু সেই বাড়িতেই হয় আরও বছর দুই পরে। মৃত্যুর পর দেখা গেল তিনি একটি উইল করে গেছেন। উইলে তিনি তাঁর অবাঙালী বন্ধুটিকেই তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন। ছেলেকে ভালভাবে মানুষ করার জন্য তিনি প্রতি মাসে তিনশ' টাকা পাবেন উইলে এ নির্দেশও ছিল। একথাও উল্লিখিত ছিল তাঁর বন্ধু যদি অভিভাবক হতে রাজী না হন তাহলে তাঁর উকিল গভর্নমেণ্টের হাতে সে ভার দেবেন। তার দরকার অবশ্য হয়নি, অবাঙালী বন্ধুটিই নাবালক নবনীর ভার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ সে একটু বড় হতেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ভালো একটি বোর্ডিং হাউসে। বস্তুত বোর্ডিংয়ে বোর্ডিংয়েই কেটেছে তার নাবালক জীবনটা। ঠিক বাইশ বছর বয়সে সে এম-এ পাশ করল সসম্মানে। এরপর সে নাকি বছর দুই তিন বিলেতেও ছিল। সেখানকার কোন এক নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দামী একটা ডিগ্রীও অর্জন করেছিল নাকি। এ বিষয়ে বর্ণনার ধারণাটা অবশ্য ধোঁয়াটে। কারণ নবনী নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেনি বর্ণনাকে। আর আমি যা লিখছি তার উৎস বর্ণনাই। নবনী যে এম-এ পাশ এ খবরও বর্ণনা জানতে পারত না, হঠাৎ জেনে ফেলেছিল তারই কলেজের এক প্রফেসারের কাছ থেকে।

নবনী যেদিন বর্ণনাকে প্রথম দেখেছিল সেইদিনই তার সঙ্গে আলাপ হয়নি। সেদিন সে তার তেতলার ঘর থেকে বর্ণনাকে লক্ষ্যই করছিল

কেবল, অনেকক্ষণ ধরে দেখছিল, নিরপেক্ষভাবে দেখবার চেষ্টা করছিল, আলাপ করেনি, আলাপ করবার কথা মনেও হয়নি অনেকক্ষণ, তার ছবি-নামানোও চলছিল অনেকক্ষণ ধরে, তাই দেখেই সে আলাপের সুখটা অনুভব করছিল মনে মনে। তারপর শেষ রিক্শাটি যখন ছবি-বোঝাই হয়ে চলতে শুরু করল, তখন তার মনে হল যে আর একটু দেরি করলেই ওরা হয়তো হারিয়ে যাবে এই কোলকাতা শহরের ঘূর্ণাবর্তে, যে ঘূর্ণাবর্তে সকলেই সকলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথচ কেউ কাউকে চেনে না, যে ঘূর্ণাবর্তে একই সময়ে একই বাড়ির এক ফ্ল্যাট থেকে মড়া বেরোয়, আর এক ফ্ল্যাট থেকে বর, যেখানে মানুষের ঠিকানা নম্বর দিয়ে নির্ণীত হয়, যেখানে আসক্তি-অনাসক্তির মায়া-বৈরাগ্যের আপাত-মিলন হয়েছে স্বার্থের তাড়নায়, যেখানে—

আর কালবিলম্ব না করে নেবে পড়েছিল নবনী। কারণ এটা সে বুঝেছিল, (কি করে বুঝেছিল তা সে-ই জানে, এ বিষয়ে সম্ভবত সহজাত একটা দূরদৃষ্টি ছিল তার পশুদের মতো)—যে ওই মেয়েটি আর ওই এক লরি ছবির সমন্বয় এই কোলকাতা শহরে এমন অদ্ভুত যে ওদের কেন্দ্র করেই তাকে কাটাতে হবে এখন কিছুদিন। যে সহজাত প্রকৃতি মধুপকে নিয়ে যায় ফুলের কাছে, তৃষিত পশুপক্ষীকে চালিত করে লুক্কায়িত ঝরণাধারার দিকে, সেই সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় সেও নেবে পড়ল। কারণ একটা মনোমত-কিছু নিয়ে ব্যাপৃত থাকা মস্ত বড় অপরিহার্য প্রয়োজন তার জীবনে। ওই তার ধর্ম এবং কর্ম, একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনে নূতন সুর, নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্য, নিত্য নব আস্বাদ সৃজন করবার একমাত্র উপায়। সাধারণত শিক্ষিত যুবকেরা যে কর্মে লিপ্ত থাকে,—যেমন চাকরি অথবা ব্যবসা তা করবার দরকারই ছিল না তার, ব্যাংক থেকে প্রতি মাসে যা সুদ পেত তাতেই তার স্বচ্ছন্দে চলে যেত। অনর্থক আরও টাকা রোজগার করবার লালসায় নিজেকে অবনত করবার ইচ্ছাই তার হয়নি কোনদিন। কারণ, এই ধারণাটা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে মনুষ্যত্ব বজায় রেখে এদেশে অন্তত চাকরি বা ব্যবসা কিছুই করা সম্ভব নয়। রাজনীতিকে সে ঘৃণা করত,

ধর্মেও মতি ছিল না, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, সাহিত্য-চর্চা এসবেরও বাতিক ছিল না কোনও। সে বই পড়ত কিনে এবং পড়া হয়ে গেলেই সেটা বিক্রি করে' কিনত আর একখানা বই। লাইব্রেরি করবার শখও ছিল না তার, থাকলে তাই নিয়ে খানিকটা সময় কাটত। এককালে খবরের কাগজের নানারকম বিজ্ঞাপন এবং সংবাদ সংগ্রহের দিকে ঝোঁক ছিল, অনেক সংগৃহীত বিজ্ঞাপন আর 'কাটিং' পড়ে আছে স্তূপীকৃত হয়ে একটা বাক্সে। এখন আর ওসবে রুচি নেই। এখন কোনও সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের ধার দিয়েও সে যায় না। সংসারের বন্ধনটা যথাসম্ভব আলগা করে রাখবার দিকেই যেন তার ঝোঁক' হয়েছে ইদানীং। এমন কি যে ফ্ল্যাটটা সে ভাড়া নিয়েছিল সেখানে রান্নার ব্যবস্থাও করেনি। হোটেলে খেত নগদ পয়সা দিয়ে। চা জলখাবার আসত পাশের একটা দোকান থেকে। নিজের বাসার সঙ্গেও কোন বন্ধনের সম্পর্ক সে রাখেনি। সকালবেলা স্নান করে বেরিয়ে যেত, ফিরত রাত্রে একেবারে খাওয়া-দাওয়া সেরে। প্রহ্লাদের কাজ ছিল ফাই-ফরমাশ খাটা, বাড়ি পাহারা দেওয়া আর বাড়ি পরিচ্ছন্ন করে রাখা। যে ঘরটি নবনী ব্যবহার করত সেইটি সে পরিষ্কার করত রোজ। বাকি তিনটে ঘর তালা-দেওয়াই থাকত। মাঝে মাঝে নবনীর দু'একজন বিদেশী বন্ধু এসে আশ্রয় নিতো সেখানে দু'একদিনের জন্য। কখনও কোন সাহেব, কখনও পাঞ্জাবী, কখনও মাদ্রাজী, কচিৎ দু'একজন বাঙালী। দু'এক-দিনই থাকত তারা। কোলকাতায় বিশেষ কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি সে, পাছে বন্ধুত্বের দায়ে ঝামেলা পোহাতে হয়। সে ভালবাসত অচেনা জগতে অচেনা পথ চিনে চিনে ঘুরে বেড়াতে, অচেনা জগত চেনা হয়ে গেলেই সে সরে পড়বার চেষ্টা করত সেখান থেকে। বিশাল কোলকাতা শহরে অসম্ভবও হত না সেটা। তার যদিও একটা বাসা ছিল কিন্তু সে বাসাটাকে সরাইখানার মতো ব্যবহার করেই বেশি আনন্দ পেত সে। সুতরাং প্রহ্লাদের প্রচুর অবসর ছিল, জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সুবাসিনীর কর্ম-ভার লাঘব করেই এ অবসর বিনোদন করত সে, একথা আগেই বলেছি।

নবনী প্রায়ই বাড়িতে থাকত না, নিজের কাজে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়াত। এই কাজ সংগ্রহ করাই ছিল তার জীবনের প্রধান প্রেরণা এবং সমস্যা। একটা কাজ শেষ হয়ে গেলেই আর একটা কাজের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হত তাকে। পথে পথে ঘুরতে ঘুরতেই কাজ পেয়ে যেত সে। নীলাম্বর সেনকে সে আবিষ্কার করেছিল পথেই। পুলিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। নবনী যখন খোঁজ নিয়ে জানল যে কন্যাদায়ের জন্যই ভদ্রলোক ঋণজালে জড়িত হয়ে শেষকালে পুলিসের কবলে পড়েছেন, তখনই সে অনুভব করল তার কাজ জুটে গেছে। একটু অনুসন্ধান করতেই জানা গেল যে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার জন্যে নীলাম্বরের উত্তমর্ণ একজন আত্মীয় আক্রোশ-বশে তাঁকে সিভিল জেলে পাঠাবার আয়োজন করেছেন। আর একটু অনুসন্ধানের পর প্রকাশ হয়ে পড়ল আক্রোশটা টাকার জন্য নয়, নীলাম্বরের পঞ্চম কন্যা চুণীর জন্য। চুণীর সঙ্গে তিনি তাঁর এক মাতাল শালার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, নীলাম্বর সেন রাজী হননি। জেদ চড়ে গেল নবনীর। এক একজন গণিতজ্ঞের স্বভাব অঙ্ক যত কঠিন হয় ততই তিনি মেতে ওঠেন তা নিয়ে। নবনীর স্বভাবও অনেকটা সেই রকম। পঞ্চকন্যার পিতা নীলাম্বর সেনের কঠিন জীবন-সমস্যা মাতিয়ে রেখেছিল তাকে বেশ কিছুদিন, সমস্যার সমাধানও করেছিল সে শেষ পর্যন্ত। একথা শুনে নবনীকে অনেকে হয়তো ভুল বুঝবেন। রূপকথায় যে-সব ছদ্মবেশী দেবদূতের কথা শোনা যায় নবনী রায়কে সে-রকম কেউ যদি মনে করেন তাহলে সেটা ঠিক হবে না। সে যে পরোপকার করব বলে এসব করে বেড়াত তা নয়, করে বেড়াত নিজের প্রয়োজনে, সময় কাটাবার জন্য। আরও দু'একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কিছুদিন সে কাটিয়েছিল একটা খাতায় ভিখারী-ভিখারিনীদের সত্য জীবনকাহিনী সংগ্রহ করে। পার্কে পার্কে রাস্তায় অনেকদিন সে ঘুরে বেড়িয়েছে এজন্য। এই সময়ই তার আলাপ হয় চানাচুরওলা মহেন্দ্রের সঙ্গে। কুচকুচে কালো কষ্টিপাথরে-কোঁদা মহেন্দ্রকে দেখে তার মনে হয়েছিল অজন্তার কোন নারীমূর্তিই বোধহয়

পুরুষের রূপ ধরে নেমে এসেছে কোলকাতা শহরে আর ম্যাডক্স স্কোয়ারের কোণে দাঁড়িয়ে চানাচুর বিক্রি করছে, মহেন্দ্রের পাকা গোঁফ এবং কাঁচা-পাকা কোঁকড়ানো চুল থাকা সত্ত্বেও একথা মনে হয়েছিল তার। প্রায়ই গিয়ে চানাচুর কিনত তার কাছে। চমৎকার চানাচুর তৈরি করত মহেন্দ্র। নিরামিষ চানাচুর, ছোলা, চিনাবাদাম, মুগ মটর দিয়ে সাধারণত যা তৈরি হয় তাই। প্রথম দিন চেখেই নবনীর মনে হয়েছিল লোকটা শিল্পী।

একদিন তাকে জিগ্যেস করল—"মাংসের ঘুগনি করতে পার?"

"রোজই করি, কিন্তু বিক্রি করি না।"

"নিজে খাও?"

"আজ্ঞে না। আমার ওস্তাদের জন্য করি।"

"ওস্তাদ? কিসের ওস্তাদ?"

"সারেঙ্গীর।"

"তুমি সারেঙ্গী বাজাও নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিয়েছিল চানাচুরওলা।

এরপর থেকে নবনী তার সমস্ত চানাচুর কিনে নিত এবং তারপর তার বাড়ি গিয়ে সারেঙ্গী শুনত তার কাছ থেকে। অপূর্ব বাজাত লোকটা। তার ওস্তাদের বাড়িতেও গিয়েছিল সে। গরীব লোক, খোলার ঘরে থাকে, কিন্তু থাকে যেন বাদশার মতো। নবনীও তার জন্যে ভাল ভাল হোটেল থেকে মাংসের নানারকম খাবার কিনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত তাকে, আর বাজনা শুনত। অর্থাৎ এই নিয়েই সে কাটিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন। এর মধ্যে পরোপকারের কোন প্রশ্ন ছিল না।

যে মাদ্রাজী বন্ধুটির জন্যে ফোটোগ্রাফের দোকান-ঘর ঠিক করে দিয়েছিল তার সঙ্গে বরং এই ধরনের একটা সম্পর্ক ছিল। শ্রীনাথনের বাবা তার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর চিঠি পেয়ে এ কাজ করতে হয়েছিল তাকে। কাজটা খুব মনোরম মনে হয়নি, কিন্তু পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

সময় কাটাবার জন্য এই ধরনের নানা কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হত তাকে। তবে সে চেষ্টা করত কাজটা যাতে মনোমত হয়।

সেদিন সে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমেই যদি একটা ট্যাক্সি না পেত, তাহলে বর্ণনার নাগালই আর সে পেত না সম্ভবত। বর্ণনা অনেক দূর চলে গিয়েছিল। রিক্‌শাটা যখন একটা গলির মধ্যে ঢুকল তখন ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সে-ও ঢুকল। ঢুকেই দেখা হয়ে গেল তার সেই চেনা রিক্‌শাওলাটার সঙ্গে। তার কাছেই জানতে পারল অত ছবি কোন্ ঠিকানায় রেখে এল তারা। অবাক হয়ে গেল শুনে। অত ছবি নাকি রাখা হয়েছে একটা খোলার ঘরে। রিক্‌শাওলা চলে যাবার পর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখে এল ঘরগুলো। সারি সারি চারটে খোলার ঘর। রাস্তার পাশেই, বাড়িগুলোর সামনা-সামনি একটা কল, কলে নানাজাতের ছেলে-মেয়ের ভিড়, চীৎকার, গালাগালি, কলহ। সেই ভিড়েরই একপাশে বালতি-হাতে বাচস্পতি দাঁড়িয়ে ছিলেন, নবনী রায় তখন তাঁকে চিনত না। আশেপাশে দু'-একটা পাকা বাড়ি আছে, কিন্তু তাদের চেহারাও শ্রীহীন। অনতিদূরে একটা আটা-পেষাই কল, তার পাশে একটা বেকারি। খোলার ঘরের চাল ভেদ করে উঠেছে একটা কুৎসিত টিনের চোঙা, তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। চারপাশে ময়লা আর জঞ্জাল, একটা মরচে-ধরা ফাটা ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়েছে আরও ময়লা আর জঞ্জাল, তার উপর চড়ে কলরব করছে কতকগুলো মুরগী। আর একটু দূরে একটা দাঁড়কাক একটা মরা ইঁদুরকে দুপায়ে চেপে ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর একটু দূরে কলরব করছে কতকগুলো ছোঁড়া একটা ঘুড়ি নিয়ে। কাছেই একটা খোলার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে দুটি নারীর কাংস্য-কণ্ঠ, ঝগড়া করছে তারা। পাশেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তাতে বাঁধা রয়েছে তিনটে মোষ, তাদের ঘিরে কাদা গোবর আর চোনার নরককুণ্ড। গলির দুধারের কাঁচা ড্রেন-গুলোও নরককুণ্ড, এত দুর্গন্ধ যে কাছে দাঁড়ানো মুশকিল বেশিক্ষণ…

নবনী চমকে উঠল। সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে এসে আঙুলে ছ্যাঁকা দিয়েছিল। সেটা ফেলে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখতে পেলে বর্ণনা বেরুল একটা খোলার ঘর থেকে, বগলে বই-খাতা। পাঁক থেকে পদ্ম ফুটল এ-কথা তার মনে হল না, মনে হল একটা জীর্ণ মলিন খাপ থেকে যেন বেরিয়ে এল একটা চকচকে তলোয়ার। একটা বাড়ির পিছনে একটু গা-ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রইল নবনী। একটু আগেই যার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার সামনে এখনই পড়াটা অশোভন হবে মনে হল তার। বর্ণনা গলিটা পার হয়ে যখন চলে গেল, তখন আর একটি সিগারেট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে।

এদের ঘিরে যে একটা রহস্যলোক আছে তার আভাস সে পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে সে রহস্যলোকের চাবি কি করে পাওয়া যায় তাই সে ঠিক করতে পারছিল না। সে জানত তাড়া-হুড়ো করে যেমন ফুল ফোটানো যায় না, তেমনি ভাব করাও যায় না। সবুর করতে না জানলে আনন্দের মেওয়া পাওয়া অসম্ভব…

আবার তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল। সে দেখতে পেল গেরুয়ার আলখাল্লা-পরা, রুদ্রাক্ষধারী, কাঁচাপাকা গোঁফ-দাড়িওলা, কালো চশমা চোখে একটি লোক বেরিয়ে এল ওই চারটি খোলার ঘরের একটি থেকে। হেমন্তকুমার। ভেক বদলেছিল সে। নবনী রায়ের দিকে এক নজর চেয়ে সে প্রশ্ন করল, "আপনি খুঁজছেন কাউকে ?"

একটা প্রেরণা-প্রবাহ বয়ে গেল নবনী রায়ের মস্তিষ্কের ভিতর।

"শুনেছি এ পাড়ায় একজন ভাল তান্ত্রিক সাধু এসেছেন বাইরে থেকে। তাঁর নাম ঠিক জানি না—"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

হেমন্তকুমারকে অনুসরণ করে নবনী রায় বেরিয়ে গেল গলি থেকে।

দুই

কোলকাতায় এসে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল সকলেরই।

বাচস্পতি আর বনস্পতি যে এমন নির্বিকারভাবে নূতন পারিপার্শ্বিকের কদর্যতাটা মেনে নিতে পারবে বর্ণনা তা আশা করেনি। তারা দুজনেই বাইরে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা যে কষ্ট পাচ্ছে তা বর্ণনা বুঝতে পারত। খাওয়ারই কষ্ট হত। প্রধান সমস্যা হয়েছিল অর্থের। পোস্টাফিসে তাদের সঞ্চিত অর্থ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার। বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করে আরও হাজার দুই টাকা পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া সীমন্তিনী, সরস্বতী আর বর্ণনার গহনাও ছিল কিছু, কিন্তু সেগুলো বর্ণনা ব্যাংকে রেখে দিয়েছিল, বিক্রি করেনি।

বর্ণনাই এদের সকলের ভার নিয়েছিল, সেই বাচস্পতি-বনস্পতিকে আশ্বাস দিয়েছিল যে চিন্তার কোনও কারণ নেই। বলেছিল, "আপনারা সুখপুরে যেমন সুখপুর-পত্রিকা আর ছবি-আঁকা নিয়ে ছিলেন এখানেও তেমনি থাকুন, সংসারের ভার আমি নিলুম।"

মুখে সে আশ্বাস দিয়েছিল বটে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল মনে মনে। বাড়িতে খাওয়ার লোক আঠারো জন, কিন্তু উপার্জনক্ষম একজনও নয়। ডাল ভাত আর নিরামিষ একটা তরকারি খেয়ে থাকলেও দৈনিক অন্তত পাঁচ টাকার দরকার। তাছাড়া চারটে খোলার ঘরের ভাড়া মাসে ষাট টাকা, কাপড়-চোপড় আছে, সুখপুর-পত্রিকার জন্য, ছবি আঁকার জন্য কিছু কিছু খরচ আছে, সাবান মাজন তেল প্রভৃতির জন্যও টুকিটাকি খরচ আছে রোজই। বাচস্পতি-বনস্পতির জন্য কিছু দুধের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, তার খরচও কম নয়, প্রায় বাড়ি-ভাড়ার সমান। সাবু মিত্তির অবশ্য মাঝে মাঝে এসে চাল-ডাল দিয়ে যেত পুরোনো প্রজাদের কাছ থেকে যোগাড় করে। সাশ্রয় হত তাতে কিছু। তবু বর্ণনা হিসেব করে দেখেছিল মাসে অন্ততপক্ষে সাড়ে তিন শ টাকা আয় না হলে ওই নরককুণ্ডে থেকেও সংসার চালানো অসম্ভব। ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গিয়েছিল তার। ভাল চাকরি, মাইনে দু' শ টাকা, কাজও কম। একজন বড়লোকের স্ত্রীকে গান-বাজনা

শেখাতে হবে রোজ সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা করে। চাকরি হিসাবে খুবই ভাল, কলেজও কামাই হবে না, অথচ ভাল রোজগার হবে। যেদিন সে 'লরি' করে তার বাবার ছবিগুলো নিয়ে এল ঠিক তার দিন সাতেক আগে চাকরিটা পেয়েছিল সে। বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেছিল, এমনি একটা দরখাস্ত করে দিয়েছিল, আশা করেনি যে হয়ে যাবে। ইন্‌টারভিউ করবার জন্যে যখন চিঠি এল তখন অবাক হয়ে গেল। কোলকাতা শহরে তার চেয়ে ভাল সঙ্গীতজ্ঞ নিশ্চয়ই আছে এই তার ধারণা ছিল। ইন্‌টারভিউ দিতে গিয়ে আরও অবাক হল সে। স্থূলকায় প্রৌঢ়া একটি মহিলাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং সেতার শেখাতে হবে। এতদিন কি করছিলেন ভদ্রমহিলা? তাঁর স্বামী সুখময়বাবুরই আগ্রহ বেশি মনে হল। খানিকক্ষণ আলাপের পর তিনি বললেন, "আপনাকে দেখেই মনে হচ্ছে আপনি ঠিক পারবেন। গান-বাজনা শেখবার ওর দরকার নেই তত, আসল দরকার সহচরীর। আমরা এতদিন পাঞ্জাব-প্রবাসী ছিলাম, ব্যবসা উপলক্ষে কিছুদিন আগে এখানে এসেছি, এখানে থাকতেও হবে এখন বেশ কিছুদিন। এখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। ছেলেপিলেও হয়নি, বাইরের কাজ নিয়ে আমার সময়টা কেটে যায়, কিন্তু মুশকিল হয়েছে অঞ্জনার। আপনি এখন ওর ভার নিন। ছেলেবেলায় ওর গান-বাজনার শখ ছিল, অনেকদিন চর্চা নেই, দেখুন আবার যদি ওকে শেখাতে পারেন।" সুখময়বাবু যতক্ষণ কথা বলেছিলেন ততক্ষণ অঞ্জনা দেবী হাসছিলেন মুখে কাপড় দিয়ে ফিকফিক করে। যদিও বয়স হয়েছে তবু বর্ণনার মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা যেন একটু খুকী প্রকৃতির। যাই হোক, চাকরিটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে।

অপ্রত্যাশিত রকম পরিবর্তন হয়েছিল বাচস্পতি-বনস্পতির।

বর্ণনার আশঙ্কা হয়েছিল দুজনেই মুষড়ে পড়বে। কিন্তু ঠিক উল্টো হল। তারা দুজনেই যেন একটু বেশি রকম উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বিধাতার এই পরিহাসটাকে পরিহাসরূপে গ্রহণ করে তা উপভোগ

করবার জন্যে যেন তৈরি হয়ে পড়ল তারা। তাদের মুখে বিষাদের ছায়াপাত হওয়া দূরে থাক, এমন একটা সজীবতার ভাব দেখা গেল যা খুব নতুন ঠেকল বর্ণনার চোখে। ভাবটা—জীবন-যুদ্ধের সৈনিক হিসাবে তাদের যে এইবার ডাক পড়েছে এতে তারা ভীত বা ম্রিয়মান তো নয়ই বরং যেন কৃতার্থ, তারা যে-কোনও কাজ করতে রাজী, যে-কোন কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য প্রস্তুত।

বাচস্পতি নিজের ঘর নিজেই ঝাড়ু দিতে শুরু করে দিল, নিজের কাপড় নিজেই কাচতে লাগল। সীমন্তিনী বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, পারেনি।

"তুমি তোমার নিজের কাপড়-জামাগুলো কাচ তাহলেই যথেষ্ট হবে। তা করে সময় পাও তো তোমার বউদিকে সাহায্য কর গিয়ে রান্নাঘরে।"

সত্যবতী রান্নার ভার নিয়েছিল। বাচস্পতি নিজেই থলি হাতে বাজার করে আনত রোজ। বর্ণনাকে পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দিত।

বর্ণনা বলল, "লেখাপড়া ছেড়ে তুমি এসব কি আরম্ভ করেছ?"

"বেশ লাগছে। তুই আমার জন্যে একটা টিউশনি যোগাড় করে দিতে পারিস? সংস্কৃতটা পড়িয়ে দিতে পারব। বি-এ ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীকেও পারব।"

"আচ্ছা।"

বনস্পতিও স্বাবলম্বী হয়ে উঠল। যে লোক কোনদিন কুটোটি নাড়েনি, সে-ও নিজের কাজ নিজে করতে লাগল। সত্যবতীকে গিয়ে বললে, "দিদি, তুমি যদি আপত্তি না কর আমি তোমাকেও সাহায্য করতে পারি। এমন ছবির মতো তরকারি কুটে দেব যে, আলু পটল কুমড়োর টুকরোকে ফুল বলে মনে হবে।"

সত্যবতী কেমন যেন গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।

ম্লান হেসে বললে, "না থাক—"

বর্ণনাকে একদিন আড়ালে ডেকে বললে, "তোর টাকার যদি টানাটানি হয় আমার ছবিগুলো বিক্রি করে দে না হয়। যদিও তোর মা রাজী

হবে কিনা সন্দেহ। বেচতে আমারও কষ্ট হবে, কিন্তু কি করা যাবে, উপায় কি? দেখিস চেষ্টা করে, তোর তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে—”

“আচ্ছা।”

বর্ণনা দুজনকেই ‘আচ্ছা’ বললে বটে, কিন্তু সে জানত কোনটাই সহজ-সাধ্য কাজ নয়। সংস্কৃত শেখবার জন্যে কেউ সংস্কৃত পড়ে না আজকাল, পড়ে পরীক্ষা পাশ করবার জন্যে। আর বই কিনে পড়ার অভ্যাসই যে দেশে নেই, সে দেশে ছবি কিনবে কে? তবু সে চেষ্টা করবে, কিছু আয় বাড়াতেই হবে। অনেক বড়লোকের ছেলে-মেয়ে পড়ে তার সঙ্গে, তাদের বলবে, যদি কেউ কেনে।

খুব বড় রকম পরিবর্তন হল হেমন্তকুমারের।

সেই প্রথমেই এসে পরিস্থিতিটা যাকে বলে ‘পর্যবেক্ষণ’ তাই করলে। সব চেয়ে যে ঘরটা বড় সেইটেই দেওয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু তবু তার পছন্দ হল না। পছন্দ না হওয়ার কারণটা সে বাচস্পতি, বনস্পতি বা বর্ণনা কারও কাছে ভাঙলে না, ভাঙলে সোজা গিয়ে বাড়িওলার কাছে। বললে, “মশাই, একটু দয়া করতে হবে।”

“কি বলুন।”

“আমার ঘরটায় একটা পার্টিশন করিয়ে দিতে হবে। দরমার পার্টিশন হলেও চলবে।”

“পার্টিশন করতে চাইছেন কেন?”

“ছেলে-মেয়েরা বড় হয়েছে, তাদের সামনে কি বউ-এর সঙ্গে শোয়া যায়? অথচ অনেক দিনের অভ্যাস বউ-এর কাছে না শুলে ঘুম আসে না। আপনি ছোট-খাটো একটা পার্টিশন করে দিন দয়া করে একপাশে একটা বিছানা করবার মতো জায়গা হলেই হবে আমার।”

বাড়িওলা একটু রসিক-প্রকৃতির লোক। প্রশ্ন করলেন, “কটি ছেলে-মেয়ে আপনার?”

“তা বলতে নেই, মা ষষ্ঠীর কৃপা আছে। ডজন পুরব পুরব হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ ছ’জন বেশ বড় বড়, বাকীগুলো ছোট।”

"ও ঘরে কি কুলুবে সকলের?"

"কুলিয়ে নিতেই হবে, উপায় কি। আপনি একটা পার্টিশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন শুধু।"

"আচ্ছা।"

বাড়িওলার লোক যখন পার্টিশন তৈরি করতে এল তখনই সর্বনাশের স্বরূপটা যেন সহসা উদ্ঘাটিত হয়ে গেল সকলের কাছে। গঙ্গা কূল ভাঙতে ভাঙতে একদিন যেমন বাড়ির বারান্দার নীচে হাজির হয়েছিল, অনেকটা তেমনি। অবস্থা যখন সচ্ছল ছিল তখন এ প্রশ্ন কারো মনে ওঠেনি, কিন্তু এখন সহসা সকলে যেন উপলব্ধি করল যে হেমন্তকুমারের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে দ্বিতীয়বার ভরা-ডুবি হবে। কিন্তু এ বিষয়ে হেমন্তকুমারকে সামনাসামনি কোন কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। সম্পর্কে সে বাড়ির বড় বউয়ের দাদা, সুতরাং অগ্রগণ্য গুরুজন।

তবু বাচস্পতি সসঙ্কোচে তাকে আড়ালে ডেকে বললে, "তোমার বয়স কত হল হিমুদা?"

"একান্ন চলছে। হঠাৎ বয়স জানতে চাইছ কেন?"

"আমি বলছি পার্টিশন না করে আর একটা কাজ করলে হয় না।"

"কি?"

"সংযম।"

কথাটা শুনে হেমন্তকুমারের ভ্রূযুগল উত্তোলিত হল এবং সেই অবস্থাতেই রইল কয়েক মুহূর্ত।

"এ রকম আজগুবি কথা তোমার মনে হল কেন?"

"আজগুবি নয়, সমীচীন। আমাদের আয়ের পথ যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ব্যয়সঙ্কোচ না করলে চলবে কেন?"

"ব্যয়সঙ্কোচ কর কিন্তু স্বাভাবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণার দাবীকে তো একেবারে অগ্রাহ্য করা যাবে না। আয়ের পুরোনো পথ বন্ধ হয়েছে, নতুন পথ আবিষ্কার করতে হবে। সে চেষ্টায় আছি আমি।"

তারপর আর একটু থেমে একটু মুচকি হেসে বললে, "আমার

পরিবারের খরচ আমি রোজগার করে ফেলব কোনরকমে। সেজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না।”

হেমন্তকুমার আর সেখানে দাঁড়াল না, বাইরে চলে গেল।

অপ্রতিভ হয়ে পড়ল বাচস্পতি।

এর দিন দুই পরেই দেখা গেল হেমন্তকুমার তার কাপড়-জামা এমন কি কেড্‌স্‌ জুতো জোড়াকে পর্যন্ত গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে ফেলেছে। হেমন্তকুমারের একাদশটি পুত্রকন্যার মধ্যে ছ'জন বেশ বড় হয়েছিল। ছ'টির মধ্যে অবশ্য চারটি কন্যা, বন্দুক, কিরিচ, কাটারি আর ছোরা। বয়স যথাক্রমে বাইশ, কুড়ি, সতরো আর তেরো। দুটি ছেলে লাঠি আর সোঁটা, বয়স যথাক্রমে আটাশ আর পঁচিশ। এর পরের ছেলে বল্লমের বয়স এগারো। বয়সের দিক থেকে নাবালক হলেও বুদ্ধির দিক দিয়ে সে কম পরিপক্ক ছিল না।

নিজের কাপড়-চোপড় গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে হেমন্তকুমার তার সাতটি পুত্রকন্যাকে ডেকে নিয়ে গেল একদিন হাওড়া স্টেশনে। কোনও পার্কে যেতে পারত কিন্তু সে ভেবে দেখলে পার্কে তার এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে সমবেত হলে ভিড় জমে যাবে। হাওড়া স্টেশনের প্রকাণ্ড চত্বরের এক কোণে জটলা করলে সে সম্ভাবনা নেই। সকলেই মনে করবে ওরা যাত্রী। একদিন দুপুরে ট্রাম-যোগে সকলেই হাজির হল সেখানে। হেমন্তকুমার সকলকেই এক কাপ করে চা আর একটা করে 'কেক্' খাওয়ালে। তারপর বললে, “চল এইবার ওদিকের কোণটায় গিয়ে বসা যাক, ফাঁকা আছে জায়গাটা।”

সকলে সমবেত হলে হেমন্তকুমার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল একটি, যার সারমর্ম হচ্ছে—“দেখ, আজ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করবার জন্যে তোমাদের ডেকেছি। জীবন-মরণ সমস্যা। আমাদের প্রত্যেককে এখন রোজগার করতে হবে। তোমাদের পিসেমশাইরা এতদিন আমাদের খাইয়েছে পরিয়েছে, এইবার আমরা তাদের খাওয়াব পরাব। তা যদি নাও পারি আমাদের নিজেদের খরচটা রোজগার

করতেই হবে। তোমরা সবাই বড় হয়েছ, উপযুক্ত হয়েছ, তোমরা সবাই মিলে যদি লেগে পড় তাহলে আর ভাবনা কি।"

লাঠি বলল, "কিন্তু আমরা যে লেখাপড়া শিখিনি—"

"সেইটেই তো তোমাদের সুবিধে, তোমরা মুটে মজুর হতে পার আবার অনেক উঁচুতেও উঠতে পার। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা সব রকম কাজ করতে পারে না, কিন্তু তোমরা পারবে। কাল থেকেই লেগে পড় তোমরা। কোলকাতার মতো শহরে কাজের অভাব নেই। আমি নিজে ঠিক করেছি জ্যোতিষীর ব্যবসা করব, কিছু কিছু কবচও বেচব। হস্তরেখা বিচারের বই পড়েছি দু'চারখানা, পাঁজিটাও পড়ি ভাল করে, কিছু রোজগার হবেই ওসব থেকে। ঠিক করেছি ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসব। আমি একটা খাবারওলার সঙ্গে কথা বলেছি, সে বলেছে কিছু টাকা জমা দিলে ফেরি করবার জন্যে খাবার সে দেবে। ওই কাজটাতে কাল থেকেই লেগে পড়তে পার কেউ—"

"দোকানটা কোথা ?" লাঠি জিগ্যেস করল।

"বড়বাজারে। তুমি যদি কর তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। গোটা পঞ্চাশেক টাকা জমা দিতে হবে, যে খাবার আর বাসন-পত্তর তুমি নিয়ে যাবে তারই জামিন স্বরূপ লাগবে টাকাটা, তা আমি দিতে পারব। কিছু টাকা আমার আছে।"

"বেশ, করব।"

"ইংরেজদের একটা ফ্যাকটারি আছে আমাদের বাড়ির কাছেই। সেখানেও একটা চাকরি জুটতে পারে কারও, সোঁটা বা বল্লম সেখানে খোঁজ করতে পারে, ওরা মাইনে ভাল দেয় শুনেছি।"

"আর আমরা কি কবব ?"—মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলে কিরিচ।

"কি করবে তা তোমরাই ঠিক কর। আমিও চেষ্টায় থাকব। মোট কথা, টাকা রোজগার করতে হবে, যেমন করে হোক করতে হবে। আর কিছু না পার বাড়িতে যা করছ বাইরে তা করলেও দু'পয়সা ঘরে আসবে।"

"বাড়িতে কি আর করছি।"

"কাপড় কাচছ, বাসন মাজছ, মশলা পিষছ, ঘর ঝাট দিচ্ছ, রান্না করছ, সবই তো করছ।"

"তার মানে বাইরে দাসীবৃত্তি করতে বলছেন ?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়ে উঠল বন্দুকের।

"দাসীবৃত্তি কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু কাজটা খারাপ নয়। যারা বড় বড় চাকরে তারাও তো দাস-দাসী। দাস-দাসীরাই তো দুনিয়া চালাচ্ছে। তুই ভুরু কোঁচকাচ্ছিস কেন ?"

"কিন্তু লোকে যদি খারাপ বলে ?"

"কিচ্ছু এসে যায় না তাতে। দারিদ্র্যের চেয়ে খারাপ আর কিছু নেই। আর এই কোলকাতা শহরে কে কাকে চেনে ? এরা চেনে শুধু টাকা। কাল তুমি টাকা রোজগার করে মোটর হাঁকিয়ে বেড়াও সবাই তোমাকে সেলাম করবে, কি করে সে টাকা রোজগার করেছ তার হিসেবও নেবে না কেউ। যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা রোজগার করতে হবে এ শহরে।"

বল্লম হঠাৎ বলল, "এক ঠ্যালাওলার সঙ্গে ভাব হয়েছে আমার। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরব ?"

"সে কিছু দেবে কি ?"

"তা জানি না, জিগ্যেস করব কাল।"

"কোরো। মোট কথা সবাইকে কিছু কিছু রোজগার করতে হবে রোজ।"

এই ধরনের আলাপ আলোচনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে উঠে পড়ল তারা।

"একটা সিনেমা দেখাও না বাবা আজকে।"

"বেশ, চল।"

ছ'আনার সীটে গাদাগাদি করে বসতে হল, কারণ তার বেশি খরচ করার সামর্থ্য ছিল না হেমন্তকুমারের।

পরদিন থেকেই কাজের চেষ্টায় হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েরা ঘুরতে লাগল।

সুখপুরে মিশ্র-পরিবারের আর একজন পরিজন ছিলেন ভূষণ চক্রবর্তী। এঁর খবর বনস্পতি সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। যখন এদের সুখপুর ছেড়ে কোলকাতায় আসা অনিবার্য হয়ে উঠল তখনই বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, কোলকাতায় আবার দেখা করবেন। কিন্তু প্রায় ছ'মাস কেটে যাওয়ার পরও তাঁর কোনও খবর পাওয়া গেল না।

তিন

সেদিন কিছুক্ষণ নীরবতার পর হেমন্তকুমার অনুসরণকারী নবনী রায়কে অবশেষে জিজ্ঞাসা করল, "তান্ত্রিক সাধুর কাছে কি দরকার আপনার? মারণ, উচাটন, বশীকরণ জাতীয় কিছু না কি? না অন্য কিছু...?"

"হাতে কোনও কাজ নেই। বেকার বসে আছি। কাজকর্ম কিছু জুটবে কি না, কি রকম জুটবে—এই সব জানতে চাই আর কি।"

"সে তো যে-কোনও জ্যোতিষী আপনাকে ব'লে দিতে পারত। এর জন্যে তান্ত্রিক সাধু খুঁজছেন কেন?"

"তান্ত্রিক সাধুরা এর প্রতিকারও করে দিতে পারেন শুনেছি।"

"তা পারেন। মন্ত্রসহ মহাকালী কবচ, মহানবগ্রহ কবচ—এসব ধারণ করলে ফল পাবেন। আরও নানারকম কবচ আছে। বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে ভালো ফল হয় না। আপনার জন্মকালীন গ্রহ সংস্থান অনুসারে তৈরি করলে সুফল ফলবে। আপনাকে কে খবর দিলে যে এই গলিতে তান্ত্রিক সাধু আছে?"

"ট্রামে যেতে যেতে কানে এল ছ'জনে বলাবলি করছিল,—তিনি যে গ্রাম থেকে এসেছেন সে গ্রামের নামটিও বলছিল, নামটি ঠিক মনে পড়ছে না আমার।"

নবীন রায় ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে যেতে চাইল না।

"সুখপুর কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ সুখপুরই।"

"তাহলে আমার কথাই বলছিল সম্ভবতঃ। ও গলিতে গেরুয়াধারী তো এক আমিই আছি।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালই হল। আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন তাহলে। আপনি কোথায় বসেন ?"

"আপাতত ফুটপাথে কিংবা পার্কে বসছি। ঘর-টর কোথাও পাইনি, খোলার ঘরে এসে মাথা গুঁজেছি দিনকতক আগে।"

"সুখপুর থেকে চলে এলেন কেন ?"

"মা গঙ্গা থাকতে দিলেন না। বাড়ি-ঘর জমি-জমা সবই কেড়ে নিলেন। এ রকম ভাঙন বহুদিন হয়নি।"

"ও। তাহলে তো মহা মুশকিলে পড়েছেন।"

"মুশকিল বইকি। তবে সবই মায়ের ইচ্ছা। তিনি যা করবেন তাই হবে।"

"আপনি কোনও কবচ ধারণ করেননি ?" মুচকি হেসে জিগ্যেস করলে নবনী।

"করেছি বইকি। ডান-হাতে, গলায়, কোমরে, কোথাও বাকি রাখিনি। একটু যেন ফল হয়েছে মনে হচ্ছে। দেখা যাক।"

দেশবন্ধু পার্কের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা।

"চলুন পার্কটায় ঢোকা যাক। আপনার হাতটা আগে দেখি। কুষ্টি আছে আপনার ?"

"আজ্ঞে না।"

"জন্ম সময় ?"

"তাও নেই।"

"হাত থেকেও খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। চলুন দেখি—"

পার্কের একটা বেঞ্চে বসে নবনীর দুটি হাতই ভাল করে দেখলে সে। হাত-দেখার দু'একখানা বই পড়া ছিল, সেই বিদ্যের জোরে সে বলল, "কোন চাকরি বা ব্যবসার চিহ্ন তো দেখছি না আপনার হাতে। তবে

দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করতে হবে না আপনাকে। আপনার ভাগ্য রেখা খুব জোরালো।"

"কবচ নিলে কাজ জুটবে?"

"জোটা তো উচিত।"

"কি রকম খরচ পড়বে?"

"যেমন খরচ করবেন। কবচ দু'চার টাকাতেও হয়, আবার ভাল করে করলে শ-খানেক টাকাও লাগে।"

"ভাল করেই করুন আপনি। কিছু অগ্রিম দিতে হবে কি?"

"দিলে ভাল হয়। বুঝতেই পারছেন, বাস্তুভিটে থেকে উৎখাত হয়ে এসেছি। নিজের সংসার তো আছেই, তাছাড়া আছে এক ভগ্নীপতি আর তার ভাইয়ের সংসার।"

উৎকর্ণ হয়ে উঠল নবনী। এই সব খবরই তো সে শুনতে চাইছিল।

"ও, তাই নাকি। ওঁরা কি করেন?"

"কিছুই করেন না। করবার যোগ্যতাও নেই। দুটোই পাগল। একজন ঘরে বসে হাতে-লেখা পত্রিকা নিয়ে সময় কাটায়, আর একজন আঁকে ছবি। বাপ-ঠাকুর্দার বিষয়-আশয় ছিল তো, খেটে খাবার দরকার হয়নি, ওই সব আজগুবি খেয়াল নিয়ে থাকত। এখন মুশকিলে পড়েছে।"

"প্রত্যেকেরই ছেলেপিলে আছে তো?"

"ওইটি ভগবান রক্ষা করেছেন। বনস্পতির কেবল মেয়ে আছে একটা। সে লেখা-পড়া শিখেছে, চাকরিও করছে একটা। ভালো মেয়েটা, তবে বড্ড বেশি আপ-টু-ডেট্।"

"ও।"

বর্ণনার ছবিটা ভেসে উঠল নবনী রায়ের মনে। তার বুঝতে দেরি হল না 'লরি'র পাশে একেই সে দেখেছিল। ভাবতে লাগল, কি করে ভদ্রভাবে ওই আপ-টু-ডেট্ মেয়েটার নাগাল পেতে পারবে। যদিও শেষ পর্যন্ত উপকারী বন্ধু হিসেবেই তার সঙ্গে পরিচয় করতে হয়েছিল, কিন্তু সে তা চায়নি। কারণ সে জানত হিতৈষী বন্ধু হওয়ার শেষ

পরিণাম শত্রুতা। ওই নীলাম্বর সেনই নাকি তার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মতো লোকও পরোপকার করতে গিয়েই অনেক শত্রু-সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এটাও সে অনুভব করছিল যে ওর সঙ্গে আলাপ করতে হবেই, কেমন যেন একটা রহস্য ঘিরে আছে ওর চারদিকে, আর সেইটেই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ, মেয়েটা তত নয়। কুয়াশা কেটে গেলে স্তূপীকৃত বিরহ-বেদনা হয়তো তিরপল-ঢাকা 'লরি'-রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। 'লরি'টার ভিতর কিন্তু ছবি ছিল অনেক। এর ভিতরও আছে কি ?

"কবচটা কি তাহলে করব ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখি, আমার কাছে এখন কত আছে।"

পকেট থেকে ব্যাগটা বার ক'রে দেখল কত টাকা আছে। সাধারণত বেশি টাকা নিয়ে ঘোরাফেরা করে না সে।

"গোটা পঁচিশেক টাকা দিলে চলবে ?"

"তাই দিন।"

টাকা ক'টি গেরুয়া ঝোলাটার ভিতর পুরে হেমন্তকুমার হাসিমুখে চেয়ে রইল নবনীর দিকে, তারপর বলল, "দিন সাতেক পরে কবচ পাবেন। কোথায় থাকেন আপনি, ঠিকানা কি ?"

নবনীর মনে হল ঠিকানাটা দেওয়া ঠিক হবে না।

"আমি কোলকাতার বাইরে থাকি। সাতদিন পরে আমিই না হয় আপনার কাছে যাব। ওই গলির কত নম্বরে আপনি থাকেন ?"

"না, ওখানে যাবেন না। আমি যে এসব নিয়ে ব্যবসা করছি সেটা বাড়ির লোকের কাছে গোপন রাখতে চাই। ওরা শুনলে ভয় পেয়ে যাবে। তন্ত্র নিয়ে ব্যবসা করাটা একটু বিপজ্জনক তো। ওরা জানে আমি রোজ বেরিয়ে যাই কালীঘাটে পূজো করব বলে—"

"অ, আচ্ছা বেশ, আমি সাতদিন পরে এইখানেই তাহলে দেখা করব আপনার সঙ্গে। ক'টার সময় আসব বলুন ?"

"এগারোটা নাগাদ।"

"বেশ।"

নবনী রায় সেদিন যখন বাড়ি ফিরল তখন একটি দুঃসংবাদ দিলে প্রহ্লাদ। তার প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকটায় নাকি উই লেগেছে। ভিতরের কাগজপত্রও নষ্ট করেছে কিছু।

"বলিস কি রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভাল করে দেখেছি।"

গুম হয়ে রইল নবনী খানিকক্ষণ। অতীতের কথা মনে পড়ল। অনেক ভিখারী-ভিখারিনীর জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করেছিল সে। অনেক বিজ্ঞাপন, অনেক বিচিত্র, বিস্ময়কর, কৌতুকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহ করেছিল দেশী-বিদেশী নানা কাগজ থেকে। তাছাড়া ওই সিন্দুকে আছে চিঠি, অনেক চিঠি। ওই সিন্দুকের তলায় তার অতীত জীবনের অনেকখানি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। সিন্দুকটাও একটা স্মৃতি। ওটা তার মায়ের ছিল, মা বাসন রাখতেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে খুলে দেখলে। নীচের তক্তা খানিকটা জখম হয়েছে। কাগজপত্রও খেয়েছে কিছু কিছু। সিন্দুকটা মিস্ত্রীকে দিয়ে ঠিক করিয়ে নেওয়া যাবে, কিন্তু এত কাগজপত্র? সব ফেলে দেবে? এতদিনের কর্মফল বিসর্জন দিতে হবে রাস্তার 'ডাস্টবিনে'? আবার টুকে রাখলে কেমন হয় নতুন খাতায়। কিন্তু কে টুকবে এত? ওদের কেন্দ্র করে অতীত জীবনে যে উৎসাহ জেগেছিল তা আর নেই, কিন্তু ওদের একেবারে বিসর্জন দেবারও ইচ্ছে হল না। হঠাৎ তখুনি ঠিক করতে পারলে না কি করবে।

"ন্যাপথলিনের গুলি আছে বাড়িতে?"

"বেশি নেই, দু'চারটে আছে।"

"আরও কিছু কিনে নিয়ে আয়। আজ ন্যাপথলিন দিয়ে রেখে দে, রে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

তারপর দিন একাধিক খবরের কাগজে এই বিজ্ঞাপনটি দেখা গেল। "কেরানির কাজ করিবার জন্য একজন লোক চাই। ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকা দরকার। যোগ্যতা অনুসারে বেতন নির্দিষ্ট হইবে।...নং পোস্টবক্সে আবেদন করুন।"

ভূষণ চক্রবর্তী যেদিন সুখপুর ত্যাগ ক'রে কোলকাতায় এসে হাজির হলেন সেদিন তাঁর চেহারাটা অন্তত ভদ্রলোকের মতো ছিল। কিন্তু মাস দুই কোলকাতার ধর্মশালায় ধর্মশালায় থেকে, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে আর পোর্টিকোর তলায় কাটিয়ে, অনাহারে-অর্ধাহারে টালিগঞ্জ থেকে বেলগাছিয়া এবং শিয়ালদহ থেকে হাওড়া পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করে' তাঁর যা চেহারা হল তা কদর্য, কিম্ভূতকিমাকার, প্রায় অবর্ণনীয়। বড় বড় রুক্ষ চুল, একমুখ গোঁফদাড়ি, ছিন্নমলিন জামা-কাপড়, কপালে মুখে বলি-রেখা, ফোলা-গাল চুপসে গেছে, উঁচু হয়ে উঠেছে দু'পাশের হাড় দুটো, অস্থিসার প্রকাণ্ড নাকটা খাঁড়ার মতো আরও উগ্র হয়ে উঠেছে, আরও কণ্টকিত হয়ে উঠেছে শুঁয়োপোকার মতো ভুরু দুটো, চোখের দৃষ্টিতে জ্বলছে হুতাশন।

একটি লক্ষ্য স্থির রেখেই সুখপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি,—যেমন করে হোক কোলকাতার কদর্যতা থেকে রক্ষা করতে হবে শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে। কিন্তু এই 'যেমন করে হোক'টা কেমন করে হবে, আগে থাকতে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনও পন্থা ঠিক করেন নি তিনি, ঠিক করা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। এ-ও তিনি তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন যে কলিকাতা নামক বিরাট শহরটি পাশ্চাত্য সভ্যতার সেই বিরাট নরক-কুণ্ড, যেখানে সৎপথে থেকে কোন সচ্চরিত্র লোক সসম্মানে জীবিকা অর্জন করতে পারে না, যেখানে সদ্গুণের চেয়ে বদ্গুণেরই কদর বেশি, যেখানে গুণ্ডামি দিয়ে রাজনীতি চালাতে হয়, ভণ্ডামি দিয়ে ধর্ম, যেখানে শিক্ষকেরা ছাত্রদের ভয়ে ভীত, যেখানে তাঁরা নোট বেচে সকলের পায়ে তেল দিয়ে সভয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, যেখানে সাহিত্যিকরা পর্যন্ত হয় মতলব-বাজ ব্যবসাদার না হয় ভিখারী, শুধু অন্নের ভিখারী নয় সম্মানেরও ভিখারী, যেখানে ফুটপাথে লোক শুকিয়ে মারা যায় তিলে তিলে, কেউ ফিরে দেখে না পর্যন্ত, তারই পাশ দিয়ে মোটরের সারি চলে,
সিনেমা হয় থিএটার হয় আলো জ্বালিয়ে বাজনা বাজিয়ে,
গণিকারা ভদ্রমহিলা হয়েছে এবং ভদ্রমহিলারা গণিকা হবার চেষ্টা করছে, যেখানে অবিচার আর অন্যায়ের নূতন নামকরণ হয়েছে গণতন্ত্র স্বাধী

—এ সবই তিনি জানতেন, কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন, কারণ না এসে উপায় ছিল না। শিল্পী বনস্পতি মিশ্রকে যখন বাধ্য হয়ে কোলকাতায় আসতে হয়েছে, তিনি দূরে সরে' থাকবেন কি করে। তিনি পণ করে' বেরিয়েছেন এই নরককুণ্ডেই তিনি যেমন করে হোক রক্ষা করবেন বনস্পতিকে। বর্ণনার হস্টেলের ঠিকানা তিনি জানতেন, তিনি স্থির করেছিলেন কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই বর্ণনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। একটা জিনিস নিঃসংশয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে বনস্পতিকে আলাদা একটা পাকা বাড়িতে স্থানান্তরিত না করতে পারলে তাঁকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। কিন্তু আলাদা একটা পাকা বাড়ি মানেই টাকা, অনেক টাকা, আর সে টাকা তাঁকেই রোজগার করতে হবে। যেমন করে' হোক করতে হবে।

সামান্য কিছু টাকা ছিল তাঁর হাতে, তাই সম্বল করেই তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। আগেকার তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সম্ভবত ভবভূতির মতো একটা ক্ষীণ আশা ছিল তাঁর মনে—কাল নিরবধি এবং পৃথ্বীও বিপুলা, হয়তো সমান-ধর্মা কোনও লোকের দেখা মিলবে এবং সে হয়তো তাঁর মনের কথা বুঝবে। তিনি প্রথমে এসে উঠলেন এক ধর্মশালায়। সেখানে তিনি রাত্রে শুতেন খালি, তাও বারান্দার এক কোণে। তাঁর আসল কাজ হল ফ্রি রিডিংরুমে গিয়ে খবরের কাগজগুলো থেকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে' দরখাস্ত করা, আর আপিসে-আপিসে দোকানে-দোকানে কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো। খেতেন চা আর ছাতু, তাতেও পাঁচ-ছ' আনা লেগে যেত। যদিও তিনি বারান্দার এক কোণে শুয়ে থাকতেন, তবু এক ধর্মশালায় বেশি দিন থাকতে দিত না তাঁকে। আর এক ধর্মশালায়, কিম্বা কোন বড় বাড়ির পোর্টিকোর তলায় তখন আশ্রয় নিতে হত। এত মিতব্যয়িতা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে তাঁর সম্বল ফুরিয়ে গেল। তখন ফিরে গেলেন তিনি তাঁর গ্রামে, সেখানে বাস্তুভিটা আর সামান্য জমি যা ছিল তা বিক্রি করে' আবার ফিরে এলেন কোলকাতায়, আবার শুরু করলেন কাজ খুঁজতে।

এ যেন নতুন রকম এক অদ্ভুত তপস্যা।

সত্যিকার তপস্যা কখন নিষ্ফল হয় না। সমান-ধর্মা লোকের নাগাল পেলেন তিনি অবশেষে। নবনী রায়ের দেওয়া বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল তাঁর।

দুদিন বিজ্ঞাপন দেওয়ার ফলে নবনী রায় সবসুদ্ধ দু শ তেষট্টিখানা দরখাস্ত পেয়েছিল। অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কিছু আই-এ আই-এস-সি ছিল, গ্র্যাজুএট ছিল কুড়িজন এবং এম-এ পাশ চারজন নবনী ঠিক করল প্রথমে এম-এ পাশ প্রার্থীদের সঙ্গেই দেখা করবে।

প্রহ্লাদ এসে খবর দিলে, "একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু লোকটাকে পাগল বলে মনে হচ্ছে, নিয়ে আসব উপরে ?"

"পাগল ? কি করে বুঝলি ?"

"চেহারাটা দেখে ওই রকমই লাগছে।"

"আচ্ছা, নিয়ে আয়।"

ভূষণ চক্রবর্তীর চেহারা দেখে নবনীরও সন্দেহ হল।

"আপনি কি চান ?"

"চাকরি। আপনি আমাকে আজ দেখা করবার জন্যে ডেকেছিলেন, তাই এসেছি।"

নবনী ডায়েরী উল্টে দেখল।

"ও, আপনিই ভূষণ চক্রবর্তী ? আসুন, বসুন।"

ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে হঠাৎ ভালো লেগে গেল নবনীর, তাঁর অদ্ভুত খাপছাড়া চেহারার জন্যেই ভালো লেগে গেল। এর আগের দিন সাহেবী পোশাক-পরা ছিমছাম ক্লিন-শেভড্ যে ছোকরাটি এসেছিল তাকে তত ভালো লাগেনি। মানে, তাক্ লাগেনি। মনে হয়েছিল এ যুগের গতানুগতিকতার ঐক্যতানে সুর মিলিয়েছে ছেলেটি, গড্ডলিকা-প্রবাহের বৈশিষ্ট্যহীন মেষ একটি। ভূষণ চক্রবর্তীকে দেখে নবনী চমৎকৃত হয়ে গেল, এ যুগের বিরুদ্ধে মূর্ত একটা প্রতিবাদ যেন, অথচ বাংলা ইংরেজি দুটো বিষয়েই এম-এ ডিগ্রী আছে!

ভূষণ চক্রবর্তী চেআরে বসেই জিগ্যেস করলেন, "আপনার আপিস আছে? কেরানীর কাজ করতে হবে সেখানে?"

"আপিস নেই। আমার পুরোনো কিছু কাগজপত্তর আছে, সেগুলোতে উই ধরেছে, আমি সেগুলো টুকিয়ে রাখতে চাই নতুন খাতায় পরিষ্কার করে।"

"কত কাগজ আছে আপনার? টুকতে কতদিন আন্দাজ লাগবে?"

"মাস তিন চার লাগা উচিত।"

"তারপর আমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে?"

আগের দিন যে ছিমছাম যুবকটি এসেছিল তাকে নবনী বলেছিল 'যাবে', কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে চেয়ে সে কথা সে আর বলতে পারল না। তার মনে হল একাধিক বজ্রাঘাতে বিধ্বস্ত এই মহীরুহ আর একটা বজ্রাঘাতের জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে। আর একটা বজ্রাঘাত হয়তো সে সহ্য করতেও পারবে, কিন্তু বজ্রটা হানতে ইচ্ছা হল না নবনীর।

"না, চাকরি শেষ হবে কেন। নানারকম খবর সংগ্রহ করার বাতিকই যে আছে আমার, সেগুলো আপনি যদি সাজিয়ে পরিচ্ছন্ন করে বরাবর টুকে দেন তাহলে বরাবরই কাজ থাকবে আপনার।"

"রোজ কতক্ষণ করে কাজ করতে হবে, মাইনে কত দেবেন?"

"আপনিই সেটা বলুন। কাজ আপনার মরজি মতন করবেন। কারণ তাড়া তো কিছু নেই, কাজটা সুন্দর ক'রে করতে হবে কেবল। কড়াকড়ি নিয়ম বেঁধে যে তা করা যায় না, তা আমি জানি। মাইনে কি রকম চান?"

"মাইনে আমি চাই না, কি চাই সেটা বলছি—।"

বলবার আগে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী, যা বলবেন তার হাস্যকর দিকটা তাঁর কাছেও ক্ষণকালের জন্য প্রকট হয়ে উঠল।

"কি বলুন—"

"একটা ভালো বড় বাড়ি আমি ভাড়া করতে চাই। তার যা ভাড়া লাগে সেইটে আপনি দিয়ে দেবেন। আর আমাকে নগদ গোটা তিরিশেক টাকা দিলেই চলবে, পঁচিশ টাকা হলেও চলবে।"

এইবার নবনী রায়েরও মনে হল লোকটি সত্যই বোধহয় পাগল।

"বড় বাড়ি চান? খুব বড় পরিবার বুঝি আপনার?"

"আমার পরিবার নেই, কেউ নেই। আমি বাড়িটা চাই শিল্পী বনস্পতি মিশ্রের জন্য।"

"বনস্পতি মিশ্র?"

একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যেন স্পর্শ করে গেল নবনীকে। বনস্পতি? এই অদ্ভুত নামটা তো সে শুনেছিল সেই জ্যোতিষীর কাছে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাঁর বাড়িভাড়া আপনি দেবেন কেন? কে হন তিনি আপনার?"

"রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু তিনিই আমার সব। এই সর্বনাশা যুগের করাল কবল থেকে তাঁকে বাঁচাব এই আমার পণ, প্রাণ পণ করেছি এই জন্যে, এ পণ রক্ষা করবার জন্যে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি দু'মাস থেকে। আমি—"

হঠাৎ রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে' পড়ল তাঁর চোখ থেকে।

নবনী রায়ও রুদ্ধবাক হয়ে গিয়েছিল। ভাবছিল এ কি অদ্ভুত যোগাযোগ! আর একটু ভাল করে জানবার জন্যে সে জিগ্যেস করল, "শিল্পী বনস্পতির নাম তো শুনিনি কখনও"—

গর্জন করে উঠলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বাজারে নাম জাহির করতে হলে নিজেকে যতটা নীচু করতে হয় বনস্পতি ততটা নীচু হতে পারেন না। সত্যিই বনস্পতি তিনি, আকাশচুম্বী তাঁর শির, সে শির মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেব না আমি। প্রচণ্ড একটা ঝড় এসেছে তা ঠিক, সে ঝড় তাঁর গায়ে আমি লাগতে দেব না। তাই পাগলের মতো একাই আমি তার বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছি। হয়তো আমি পারব না, হয়তো বনস্পতির মৃত্যু হবে, হয়তো সমূলে উৎপাটিত হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে সে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও পড়ব, আমার প্রাণ থাকতে আমি মাথা নোয়াতে দেব না তাঁকে—"

"কোথা থাকেন তিনি?"

"আগে সুখপুরে থাকতেন, সুখের সংসার ছিল তাঁদের, কিন্তু গঙ্গার ভাঙনে ভেঙে গেল সব, ভেসে গেল। গঙ্গা দেবী নয়, রাক্ষসী। এখন ওঁরা কোলকাতার এক এঁদো গলিতে এসে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। আমি তাঁকে আর তাঁর মেয়ে বর্ণনাকে সেখান থেকে উদ্ধার করতে চাই।"

নিঃসংশয় হল নবনী রায়।

"বেশ, আমি আপনাকে সাহায্য করব। ভাল বাড়ি দেখুন আপনি, যা ভাড়া লাগে আমি দেব। কিন্তু একটি শর্তে।"

"কি শর্তে বলুন।"

"আমি যে বাড়ির ভাঁড়াটা দিচ্ছি, একথা তৃতীয় ব্যক্তি যেন জানতে না পারে। বাড়ি খুঁজুন আপনি। বনস্পতি মিশ্রের সম্বন্ধে আরও জানতে কৌতূহল হচ্ছে, আপত্তি যদি না থাকে, তাহলে তাঁর ইতিহাসটা বলুন—"

ভূষণ চক্রবর্তী গোড়া থেকে সব বলতে লাগলেন।

উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল নবনী রায়। শুনতে শুনতে আর একটা কথাও তার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শুধু বনস্পতি নয়, বর্ণনার জন্যেও প্রাণ কাঁদছে ভূষণ চক্রবর্তীর।

পাঁচ

এইখানে একটা কথা বলে নিতে চাই। এই কাহিনীর ঘটনাগুলো আমি পর-পর যে ভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছি তাতে হয়তো মনে হবে যে ওগুলোর মধ্যে বুঝি কোন সময়ের ব্যবধান ছিল না। সময়ের ব্যবধান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কোন্ ঘটনার কতদিন পরে আর একটা ঘটনা ঘটেছে তা আমার ঠিক মনে নেই। বর্ণনারও নেই। অনেকদিন পরে অনেক-দূর থেকে ওগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে ওদের যে পাশাপাশি-ঘেঁষাঘেঁষি রূপ আমরা দেখেছি সেটা ওদের সত্য রূপ নয়, ওদের মধ্যে অনেক ফাঁক, অনেক সময়ের ব্যবধান আছে। আকাশের নক্ষত্রদেরও আমরা

পাশাপাশি দেখি, কিন্তু আসলে একটা নক্ষত্র আর একটা নক্ষত্র থেকে বহু কোটি যোজন দূরে থাকে। এ-ও অনেকটা তেমনি।

হেমন্তকুমার আর তার ছেলে-মেয়েরা রোজগার করতে শুরু করল সবাই। চারটি মেয়েই বাহাল হয়ে গেল ঝি-গিরিতে। এর চেয়ে ভাল কাজ তাদের জুটল না, জোটা সম্ভবও ছিল না। লাঠি খাবার ফেরি করতে লাগল, সোঁটা বাহাল হয়ে গেল এক কবিরাজের দোকানে, সেখানে ওষুধ বাটা, গুঁড়ো করা, বাছা—এই সব কাজ করতে হত তাকে। বল্লম অনিশ্চিতভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরত, কিন্তু রোজই রোজগার করত কিছু কিছু, বলত মুটেগিরি করি। হেমন্তকুমারও গেরুয়া-কাপড় আর বুলির জোরে রোজগার করত মন্দ নয়। সবাই মিলে গড়ে প্রায় সাত আট টাকা রোজগার করত রোজ প্রথম-প্রথম। আর্থিক সমস্যা অনেকটা সমাধান হল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে আর এক সমস্যা দেখা দিল।

হেমন্তকুমার সকালে বেরিয়ে যেত, খাবার জন্য ফিরে আসত দুপুরে। খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করে চারটে নাগাদ আবার বেরুত, ফিরে আসত রাত নটার পর।

একদিন সে দুপুরে ফিরে এসে দেখল রান্না হয়নি। আসন্ন-প্রসবা সত্যবতী আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের চারদিকে ভাঙা কাপ ডিশ ছড়ানো।

"কি ব্যাপার, অমন করে শুয়ে আছ যে? শরীর খারাপ নাকি?"

সত্যবতী নিরুত্তর।

"ঘুমুচ্ছ নাকি?"

কোনও উত্তর নেই। মড়ার মতো শুয়ে আছে সত্যবতী।

"হল কি তোমার?"

গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলে হেমন্তকুমার বার দুই। তবু উত্তর নেই।

"আরে ব্যাপার কি—?"

ন'বছরের ছেলে সড়কি বাচস্পতির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "মায়ের অসুখ করেছে। ডাক্তার এসেছিল ইন্‌জেকশন দিয়ে গেছে।"

"তাই নাকি ?"

তারপর সীমন্তিনী এল, তার কাছে থেকে সব বোঝা গেল। সকালে হেমন্তকুমার আর ছেলে-মেয়েরা কাজে বেরিয়ে যাবার পর থেকেই সত্যবতীর এই ভাবান্তর।

"প্রথমে বিড়বিড় করে কি বলছিল। তারপর চেঁচিয়ে উঠে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল, কাপ ডিশগুলো আছড়াতে লাগল মেঝের উপর। শেষকালে আগুনের একটা নুড়ো জ্বেলে ওই পার্টিশনটায় আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়েছিল, ভাগ্যে বর্ণনা দেখে ফেললে, তা নাহলে সর্বনাশ হয়ে যেত। উনি* বললেন, এ তো পাগলামির লক্ষণ মনে হচ্ছে, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও। বর্ণনা কলেজ যাচ্ছিল, সে বললে আমি এখুনি ডাক্তার পাঠিয়ে দিচ্ছি। বর্ণনা চলে যাবার পর আরও বাড়াবাড়ি হল। নিজের পেটে গুম গুম করে কিল মারতে লাগল বৌদি। খন্তাটার চুলের ঝুটি ধরে মুখ ঘষতে লাগল মেঝেতে, বেচারীর কপালের ছাল উঠে গেছে খানিকটা। সে এক কাণ্ড! উনি, ঠাকুরপো, সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সরু ওকে ধরতে গিয়েছিল, এক চড় মেরে সরিয়ে দিলে তাকে। বাড়িতে বড় ছেলে-মেয়ে কেউ নেই, শেষকালে বাড়িওলাকে ডাকতে হল। তিনি আরও দু'তিনজনকে ডেকে এনে ধরে বেঁধে ফেললেন ওকে। সে কী চীৎকার! একটু পরে ডাক্তার এলেন, তিনি এসে ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। তোমাকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। এই তাঁর ঠিকানা—"

কার্ডখানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হেমন্তকুমার।

সীমন্তিনী বলল, "তোমার খাবার আমি করে রেখেছি। খাবে চল। ছেলে-মেয়েদেরও খাইয়ে দিয়েছি। বৌদি এখন ঘুমুক। ঘুম ভাঙলে একটু দুধ খাইয়ে দেব। চল—"

হেমন্তকুমাররা সপরিবারে রোজগার আরম্ভ করেই আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। একটা অজুহাতও ছিল তাদের। তারা পছন্দ করত ঝাল-মসলা-পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া গরগরে রান্না। বনস্পতি-বাচস্পতির

সহ্য হত না ওসব। তাই বর্ণনা একটা ইক্‌মিক কুকার আর স্টোভ কিনে আলাদা ব্যবস্থা করেছিল নিজেদের।

খাওয়া-দাওয়ার পর হেমন্তকুমার ডাক্তারের কাছে গেলেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী বর্ণনাদের হস্টেলের ডাক্তার। তিনি হেমন্তকুমারের গৈরিক বাস দেখে আশ্চর্য হলেন একটু।

"বর্ণনা আমাকে পাঠিয়েছিল কি আপনারই স্ত্রীকে দেখতে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর কি হয়েছে বলুন তো?"

"মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।"

"এর কারণটা কি?"

"কারণ আপনি।"

"আমি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্তানের বোঝা আপনার স্ত্রী আর বইতে পারছেন না। কিন্তু সেদিকে আপনার লক্ষ্য নেই, আপনি বোঝা চাপিয়েই যাচ্ছেন—"

"দেহের ক্ষুধা তৃষ্ণা কি করে রোধ করি বলুন।

মৃদু হেসে ডাক্তার চক্রবর্তী বললেন, "আপনি গেরুয়া পরেছেন আপনার মুখে ওকথা সাজে না।"

"ওইখানে ভুল করলেন সার। এটা আমার ব্যবসার ইউনিফর্ম আপিসের পোশাক। পুলিসের, রেল-কর্মচারীদের, ট্রাম কণ্ডাকটারদের যেমন থাকে, এ-ও তেমনি। আমি ঊর্ধ্ব-রেতা সন্ন্যাসী নই, হতেও চাই না। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত আছে—"

"তা থাক, কিন্তু আপনার ওই এনিমিক স্ত্রীর যদি এইভাবে ছেলেপিলে হতে থাকে তাহলে উনি আর বাঁচবেন না, যদিও বাঁচেন দেহে মনে পঙ্গু হয়ে থাকবেন।"

"কিন্তু এর উপায়টা কি বলুন। আপনারা সংযম-সংযম করেন কিন্তু সংযম করলেই কি কিছু হবে? বছরে যদি একদিনও সংযমের বাঁধ ভাঙে, ব্যস্‌, তাহলেই তো হয়ে গেল। তাছাড়া সংযম করবই ব কেন। মনুতে কি আছে তা জানেন?"

"না জানি না। তবে এইটে জানি যে জানোয়ারের মতো এই ভাবে যদি বংশ-বৃদ্ধি করতে থাকেন, অসীম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। আপনার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। আপনি বরং ডাক্তার সামন্তের কাছে যান, তার একটা বার্থ-কণ্ট্রোল-ক্লিনিক আছে। সে আপনার মন্ত্র টন্ত্র মন দিয়ে শুনবে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতেও পারবে, ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

তিনি প্যাড টেনে চিঠি লিখতে লাগলেন। তারপর চিঠিটা খামে পুরে তার উপর ঠিকানা লিখে দিয়ে দিলেন হেমন্তকুমারকে।

"এখন আমার স্ত্রীর কি চিকিৎসা চলবে?"

"আমি বর্ণনাকে একটা প্রেসক্রপশান লিখে দিয়েছি। ওই ওষুধটাই ছ ঘণ্টা অন্তর চলুক আপাতত। আজ আর ইন্‌জেকশন দেবার দরকার নেই, দরকার হলে পরে দেখা যাবে।"

"আপনার ফী-টা—"

ডাক্তার চক্রবর্তী হেসে বললেন, "আপনি তো আমাকে কল্‌ দেননি, কল্‌ দিয়েছিল বর্ণনা। ফী-য়ের কথা তার সঙ্গে হয়ে গেছে। আপনি যত শিগ্‌গির পারেন সামন্তর সঙ্গে দেখা করুন, সে আপনার কাছে ফী চাইবে না, লিখে দিয়েছি।"

"কিন্তু আমি বিনা ফী-য়ে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে চাই না।"

"বেশ তাহলে দেবেন। আচ্ছা, আসুন এখন, নমস্কার।"

ডাক্তার চক্রবর্তী ঘণ্টা টিপলেন।

আর একটি রোগী এসে হাজির হল দ্বারপ্রান্তে। হেমন্তকুমারকে উঠে পড়তে হল চেআর ছেড়ে।

ছয়

বর্ণনার আশা হয়েছিল হেমন্তকুমার সপরিবারে উপার্জন করে' যখন নিজেদের খরচ চালিয়ে নিতে পারছে তখন এইবার একটু সচ্ছলতার মুখ দেখা যাবে বোধহয়। সুখময়বাবু ঠিক নিয়মিতভাবে মাইনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, বাচস্পতিরও ছাত্রী জুটেছিল একটি। তারই এক বন্ধু, সুদেষ্ণা। সুদেষ্ণা তার চেয়ে বছরখানেকের সিনিআর, এম-এ পাশ করে পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা করছে। বাচস্পতি সংস্কৃতে পণ্ডিত শুনে আলাপ করতে এসেছিল। আলাপ করে প্রথম দিনই মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে। তিনি তাকে গবেষণার একটা নূতন পথও নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "দেখ মা, পাণিনি শুধু ব্যাকরণ নয়, পাণিনি আর্য সংস্কৃতির প্রতীক। ভাল করে পাণিনি পড়লে বোঝা যায় আর্য সভ্যতার চেহারা কি রকম ছিল, আদর্শ কি রকম ছিল। তাই পাণিনি আগে বারো বছর ধরে পড়তে হত, শুধু একটা ব্যাকরণ হলে অতদিন লাগবার কথা নয়। ভট্টি যেমন শুধু কাব্য নয় ব্যাকরণও, পাণিনিও তেমনি শুধু ব্যাকরণ নয়, ওর মধ্যে অনেক কিছু আছে। তুমি তোমার গবেষণাটা যদি এই ধারায় চালাও, তাহলে এ যুগের পক্ষে একটা নতুন জিনিস হবে। আমার যতটুকু বিদ্যে আছে তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব নিশ্চয়ই।" সুদেষ্ণা সপ্তাহে তিন দিন তাঁর কাছে আসত, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিত।

বনস্পতিরই রোজগারের কোনও রাস্তা আবিষ্কৃত হয়নি তখনও পর্যন্ত। যদিও বর্ণনা ভাবছিল তাঁর ছবিগুলো একে একে বিক্রি করে ফেলতে পারলে ঘরটাও খালি হয়ে যায় আর কিছু টাকাও আসে—কিন্তু কথাটা সে পাড়তে পারেনি বনস্পতির কাছে ভালোভাবে। বনস্পতি যদিও তাকে বলেছিল ছবি বিক্রি করতে, কিন্তু সেটা তার মনের কথা যে নয় তা সে বুঝেছিল। এখানে এসে বাবা মা দুজনেরই যেন ছবিগুলোর প্রতি মমতা আরও বেড়ে গেছে তার মনে হচ্ছিল। যদিও নূতন কোন ছবি আর আঁকা হয়নি, কিন্তু ছবির জগতেই যেন বাস করছে ওরা দুজনে। প্রতিটি ছবিকে রোজ ঝাড়ছে, মুছছে, পূবদিকের যে জানলাটা দিয়ে আলো আসে তার সামনে এক-একদিন এক-একটি ছবি

রেখে নূতন করে' যেন আলাপ করছে তাদের সঙ্গে। বর্ণনার মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই ছবিগুলোই ওদের সন্তান-সন্ততি। ওগুলোর সঙ্গে তার বাবা-মার প্রাণের যোগ যত গভীর তারও সঙ্গে বোধহয় ততটা নয়। ইদানীং ওই পুরোনো ছবিগুলো নাড়া-চাড়া করেই সময় কাটছে তাঁদের। এখানে এসেই বনস্পতি একটা নূতন ছবিতে হাত দিয়েছিল, কিন্তু সেটার কাজ অগ্রসর হল না। ক্যানভাস্টার সামনে তুলি নিয়ে চুপ করে বসে-বসেই সময় কেটে গেল অনেকক্ষণ, দিনের পর দিন কাটল, ছবি হল না।

"আচ্ছা, ভূষণের কোনও খবর পাওয়া গেল না? সে এখানকার ঠিকানা জানে তো?"

বনস্পতি মাঝে মাঝে খোঁজ করে। তার বোধহয় মনে হয় ভূষণ কাছাকাছি থাকলে তার ছবি আঁকবার প্রেরণা ফিরে আসবে আবার।

"ভূষণ কাকা এখানকার ঠিকানা জানেন না, আমার হস্টেলের ঠিকানা জানেন, হস্টেলে তো আমি রোজই যাই, তিনি এলে খবর পাব নিশ্চয়।"

"হয়তো তোকে দেখতে না পেয়ে ফিরে গেছে—"

"না দারোয়ানকে বলা আছে আমার খোঁজে কেউ এলে যেন তার নাম ঠিকানা লিখে রাখে। উনি আসেননি এখনও।"

বনস্পতি প্রতিবাদ করে না, কিন্তু কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস হয় না তার। ভূষণ এতদিন ছেড়ে থাকবে তাকে?

ভূষণ চক্রবর্তী বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

নবনী রায়ের বাড়িতে ঘণ্টা দুই কাজ করে তিনি বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। মনোমত বাড়ি কিছুতেই পাচ্ছিলেন না। কোলকাতা শহরে টাকা ফেললেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পাওয়া যায় না। নবনী রায়ও বাড়ির চেষ্টায় ছিল। বনস্পতিকে একটা ভাল পরিবেশে স্থাপন করবার আগ্রহ তারও কম ছিল না। কিন্তু কিছুতেই পছন্দমতো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না।

এইভাবেই চলছিল।

এমন সময় বর্ণনার একদিন মনে হল ভাগ্যদেবতা সহসা বুঝি প্রসন্ন হলেন। অঞ্জনা দেবীকে কাফির একটা গৎ শেখাচ্ছিল সে, পাশের ঘরেই সুখময়বাবু ছিলেন, এমন সময় নীচে থেকে চাকর হীরু কাগজে মোড়া একটি বড় প্যাকেট নিয়ে এল।

অঞ্জনা বললেন, "বাবু ওঘরে আছেন, ওখানেই নিয়ে যাও।"

হীরু চলে গেল। বর্ণনা জিগ্যেস করলে, "কি ওটা, ছবি, না আয়না?"

"ছবি। ওঁর নানারকম ছবি কেনার বাতিক আছে যে।"

কথাটা বলেই মুখ ফিরিয়ে হাসলেন অঞ্জনা, মুখে আঁচল দিয়ে। বর্ণনা ঠিক বুঝতে পারল না এতে হাসির কি আছে।

"ও, তাতো জানতুম না। জানলে আমার বাবার ছবিগুলো দেখাতাম ওঁকে। কিন্তু কই, আপনাদের ঘরে তো ছবি দেখি না তেমন। ছবি কিনে উনি রাখেন কোথা?"

"আলমারিতে।"

"ছবি তো দেখবার জন্যে। আলমারিতে পুরে রেখে লাভ কি?"

"সবাইকে দেখান না। আপনাকে হয়তো দেখাতে পারেন একদিন।"

এমন সময় সুখময়বাবু ঘরে এসে ঢুকলেন।

"কাফির গৎটা বন্ধ হয়ে গেল কেন? বেশ লাগছিল, চমৎকার হাত আপনার।"

"উনি তোমার ছবিগুলো দেখতে চাইছেন।"

অঞ্জনা দেবী মুচকি হেসে চোখ-মুখের এমন একটা ভঙ্গী করলেন যে অদ্ভুত মনে হল বর্ণনার।

"ছবির সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আছে নাকি?"

"আছে বইকি, আমার বাবা যে একজন আর্টিস্ট।"

"সত্যি? এ কথা তো আগে বলেননি। আপনার বাবার নাম কি?"

"বনস্পতি মিশ্র। তবে তাঁর নাম আপনারা কেউ শোনেননি। দেশের বাড়িতেই তো বরাবর কাটিয়েছেন, আর ছবি-ছাপানোর দিকে

তার ঝোঁক ছিল না কখনও। বিস্তর ছবি জমে আছে বাড়িতে। ভাবছি তেমন খরিদ্দার যদি পাই, বেচে দেব।”

“আমিই কিনতে পারি। ছবিগুলো দেখান আমাকে।”

“বেশ, দেখাব। কাল নিয়ে আসব একখানা। কোনও বন্ধুকে দেখাতে যাচ্ছি বলে নিয়ে আসতে হবে, বাবা হয়তো বিক্রি করতে রাজী হবেন না। তবে আপনার যদি পছন্দ হয় তাঁকে রাজী করাতে পারব।”

“বেশ, কাল নিয়ে আসবেন। আর আমাকে আপনি বন্ধু বলেই মনে করতে পারেন।”

মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী। বর্ণনার মনে হল যখন তখন হাসি মেয়েটির রোগ নাকি!

তার পরদিন ‘মহাকালী’ ছবিখানাই নিয়ে এল সে। বাবা-মার চোখের দৃষ্টি কিন্তু এড়াতে পারেনি।

শঙ্কিত কণ্ঠে বনস্পতি জিগ্যেস করল, “কোথা নিয়ে যাচ্ছিস ওটা?”

“আমার এক বন্ধুকে দেখাব।”

“দাঁড়া তাহলে, আমি ঠিক করে বেঁধে দি কাগজ দিয়ে। দেখিস ছবির মাঝখানে যেন ঘষা না লাগে।”

বনস্পতি নিজে হাতে নিপুণভাবে প্যাক করে দিলেন ছবিখানা।

ছবিখানা দেখে যে সুখময়বাবু এমনভাবে মুগ্ধ হয়ে যাবেন তা বর্ণনা কল্পনা করেনি।…

“বা বা বা বাঃ—এ তো অদ্ভুত ভালো ছবি। ইনি তো একজন জিনিআস দেখছি, বিরাট জিনিআস।”

ম্লান হেসে বর্ণনা বললে, “অনেকে একথা বলেছে। কিন্তু আত্মপ্রচার আর আত্মবিক্রয় না করলে জিনিআসদের কদর হয় না এদেশে। নিজের ঢোল নিজেই পেটাতে হয়। বাবা সেটা করতে রাজী নন। তাই খোলার ঘরে বাস করে অতি কষ্টে দিন কাটাতে হচ্ছে তাঁকে—”

“বলেন কি! খোলার ঘরে থাকেন আপনারা?”

“মাত্র ছ শ টাকা আয় যে। জ্যাঠামশাই সম্প্রতি একটা পঞ্চাশ

টাকার টিউশনি পেয়েছেন। মাত্র আড়াই শ' টাকা আয়ে ভালো বাড়িতে থাকা যায় না। দেশে আমাদের পাকা বাড়ি জমি সব ছিল, কিন্তু গঙ্গায় সব কেটে গেছে। এখানে খোলার ঘরে আছি। বাবার ছবিগুলোর জন্মেই আলাদা একটা ঘর ভাড়া করতে হয়েছে।"

"সেটাও খোলার ঘর ?"

"হ্যাঁ, পাকাঘর ভাড়া করবার পয়সা এখনও রোজগার করতে পারছি কই।"

"আপনার যা গুণ, আপনার পয়সা রোজগারের ভাবনা কি। ছবিগুলোর জন্ম অন্তত একটা পাকা ঘর ভাড়া করুন, তা নাহলে ওগুলে নষ্ট হয়ে যাবে।"

"কাছাকাছি তেমন পাকা ঘরও নেই। আর বাবা-মা দুজনেই ছবি-অন্ত প্রাণ। ছবিগুলো চোখের আড়াল করতে চান না। আমি চেষ্টা করছি ওঁদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ছবিগুলো আস্তে আস্তে বিক্রি করে দেব। আপনি কি এটা কিনতে চান ?"

"নিশ্চয়ই—"

"কি রকম দাম দেবেন ?"

স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন সুখময়বাবু।

তারপর বললেন, "এসব অমূল্য জিনিস, টাকা দিয়ে এসবের দাম দেওয়া যায় না। আপনি যা বলবেন তাই দেবার চেষ্টা করব, অবশ্য যদি সামর্থ্যে কুলোয়।"

"আমি কিছুই বলব না।"

সুখময়বাবু চেক-বই বার করে এক হাজার টাকার চেক লিখে দিলেন একটা। বর্ণনা এতটা প্রত্যাশা করেনি। তার দেহে মনে পুলক শিহরণ বয়ে গেল। তবু বললে, "আপনি চেকটা এখন রাখুন। বাবা যদি বিক্রি করতে রাজী হন তাহলে ওটা নিয়ে যাব।"

"না, আপনি চেকটা নিয়ে যান, ছবিটাও নিয়ে যান। আপনার বাবা যদি রাজী হন ছবিটা দিয়ে যাবেন আমাকে।"

একটু ইতস্তত করে বর্ণনা বললে, "আচ্ছা, ছবিটা থাক আপনার কাছে।"

বাড়ি ফিরে এসে বর্ণনা বনস্পতির দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

"একটা কথা বলব, রাগ করবে না তো ?"

"কি কথা—"

"আমার বন্ধুর খুব ভালো লেগেছে 'মহাকালী' ছবিটা। সে ওটা রাখতে চাইছে।"

আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠল বনস্পতির চোখ দুটো।

"খুব ভালো লেগেছে ? রাখতে চাইছে ? তোর মায়ের যদি আপত্তি না থাকে, থাক না হয় ওটা ওর কাছে। তোর খুব বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ—। সে কিন্তু অমনি নেবে না, এক হাজার টাকার চেক দিয়েছে একটা।"

"সে কি ! বন্ধুর কাছ থেকে দাম নিবি ?"

"সে কিন্তু অমনি নেবে না।"

বনস্পতি এ-কথা শুনে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

"নেবে না ? আমাদের দারিদ্র্যের কথা টের পেয়েছে না কি ? আমাদের দুরবস্থার কথা বলেছিস তাকে ?"

"বলেছি বইকি। লুকুতে যাব কেন ?"

"তাই সে তোর উপহার নিতে চাইছে না। ছবি কেনার ছুতো করে সাহায্য করছে। দাম দেওয়ার ছলে ভিক্ষে দিচ্ছে।"

"বাঃ, তা কেন, ছবি বিক্রি করে' সব শিল্পীই দাম নেয়। এটা একটা পেশা তো—"

"তা জানি। কিন্তু আমি তো পেশাদার শিল্পী নই। ছেলেবেলা থেকে নিজের খেয়ালেই ছবি আঁকছি। দাম-টামের কথা তো ভাবিনি কখনও।"

"কিন্তু এবার ভাবতে হবে। এমন কষ্ট করে তুমি আছ, এ আমি দেখতে পারি না।"

হঠাৎ বর্ণনার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। এ কাঁপার অর্থ কি তা বনস্পতি জানতেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তোর যা খুশি কর

বর্ণনার চোখ দিয়ে সত্যিই টপ টপ করে জল পড়ল। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলে সে।

"এই দেখ, দেখ, কি ছেলেমানুষী দেখ। বললুম তো, তোর যা খুশি কর। ছবি বেচে তোর যদি সাশ্রয় হয়, তাই কর।"

এমন সময় সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকল। স্নান করতে গিয়েছিল সে।

"কি হয়েছে?"

তারপর সমস্ত শুনে বললে, "ও ছবিখানা কাউকে দেব না। আমি মহাকালী পুজো করব ঠিক করেছি, ওই ছবিখানাই পুজো করব। অন্য ছবি তুমি তোমার বন্ধুকে দিতে পার।"

পরদিন আর একখানা ছবি নিয়ে গেল বর্ণনা। এটা আরও পছন্দ হল সুখময়বাবুর। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, তাঁর তেতলার ঘরে তিনি খানকতক ছবি এনে রাখতে চান। দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে ভালও থাকবে, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ক্রেতাও জুটবে।

বললেন, "বেশি ছবি যদি আনেন সেগুলো আলমারিতে রেখে দেবার ব্যবস্থাও করতে পারি। বড় বড় দুটো খালি আলমারিও আছে আমার। আমি আরও দু'একখানা কিনতেও পারি।"

আকাশের চাঁদ হাতে পেলেও বর্ণনা এত খুশি হত না।

কিন্তু এতে বনস্পতি সরস্বতী কেউ রাজী হয়নি প্রথমে। যে ছবিকে তারা কখনও চোখের আড়াল করেনি তা অপরের বাড়িতে নিয়ে যাবে? তারা ঠিক মতো রাখবে কিনা, ঝাড়বে কিনা, এসব নানা কথা মনে হচ্ছিল তাদের। অথচ তারা সোজাসুজি 'না'-ও বলতে পারছিল না। কারণ এই বেদনাদায়ক সত্যটা ক্রমশ তাদের উপলব্ধি করতে হচ্ছিল যে ছবি বিক্রি না করলে চলবে না। এত টানাটানির মধ্যে বেশি দিন থাকা যাবে না। তবু তারা ইতস্তত করছিল। বর্ণনার জেদাজেদিতে শেষ পর্যন্ত পাঁচখানা ছবি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। এ ছবিগুলো দেখেও

উচ্ছুসিত হয়ে উঠলেন সুধাময়বাবু। বললেন, আরও দু'খানা তিনিই নেবেন, বাকি তিনখানার খদ্দেরও যোগাড় করে দেবেন।

এইভাবে কাটল দিন কতক। বর্ণনার কল্পনা স্বপ্নে রঙীন হয়ে উঠল। তার মনে হল সত্যিই যদি বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে তো তাদের ছোটোখাটো একটা বাড়িও হয়ে যেতে পারে। তার বান্ধবী আকাশ-পরী এম-এ পাশ করেই নাকি বিলেত যাবে। তারও বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে। বাবার এত ছবি, সত্যিই যদি ভাল দামে বিক্রি হয়ে যায়, তাহলে টাকার ভাবনা কি।

কিন্তু স্বপ্নসৌধ-শীর্ষে বজ্রপাত হল একদিন।

বর্ণনার সাহায্যে সেই তেতলার ঘরটিতে ছবি পাঁচখানি টাঙাচ্ছিলেন সুখময়বাবু। টাঙানো হয়ে যাবার পর সুখময়বাবু হঠাৎ বললেন, "বাইরের খদ্দের আসবার আগে আমি আমার ছবি দু'খানা বেছে নিয়ে 'সোল্ড' লিখে দি।"

"বেশ তো নিন। কোন্ দু'খানা নেবেন আপনি ?"

সুখময়বাবু ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দেখবার পর হঠাৎ তিনি বর্ণনার সামনে এসে বললেন, "আমার মতে কোন্ ছবিখানা সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন ?"

"কোন্খানা ?"

এইটি।"—এই বলে মৃদু হেসে তিনি বর্ণনার থুত্নিটি নেড়ে দিলেন।

বর্ণনা পেছিয়ে গেল, তারপর আগুন জ্বলে উঠল তার দৃষ্টিতে।

"এর মানে !"

খিক্ খিক্ হাসির শব্দ শুনে বর্ণনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল দালানে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসছে। হাসছে ? নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না বর্ণনার। স্বামীর এই ব্যবহার দেখে তার স্ত্রী হাসছে খিক্ খিক্ করে।

নিমেষের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন সুখময়বাবু। ঢোঁড়া ভেবে যাকে নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলেন, দেখলেন তা ঢোঁড়া নয়, গোখ্‌রো।

ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কিছু মনে করবেন না বর্ণনা দেবী, ওটা এমনি একটু রসিকতা করলুম। আমি 'শ্রীরাধা' আর 'রজনী' এই ছবি দুটো নেব। চেকটা এখুনি লিখে দি?"

"না—"

রূঢ় কদর্য সত্যটা সহসা প্রতিভাত হয়ে উঠল তার মনে। সে আর কোন কথা না বলে নেবে গেল, সোজা নেবে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল একেবারে, তারপর হাঁটতে লাগল।

…অনির্দিষ্ট ভাবে হন হন করে খানিকক্ষণ হাঁটবার পর সে একটা পার্কে গিয়ে ঢুকল ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখবার জন্যে। একটা কথা গোড়া থেকেই তার মনে হচ্ছিল, ওখানে আর যাওয়া যাবে না। কিন্তু এই কোলকাতা শহরে তাহলে চলবে কি করে? হঠাৎ মনে পড়ল সুদেষ্ণা বলেছিল সে বনস্পতিকে ছোটখাটো আঁকার কাজ যোগাড় করে দিতে পারে। তার এক দাদা বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট, অনেক আর্টিস্টকে ছবির কাজ দেন। বর্ণনা তখনই উঠে পড়ল।

সুদেষ্ণার দাদা সুবন্ধু সেন বাড়িতেই ছিলেন।

বর্ণনার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।

"তিনটে কাজ এখনই দিতে পারি আপনার বাবাকে। একটা ছবি জুতোর কালির বিজ্ঞাপনের জন্য, একটা ছবি দেশলাই বাক্সর জন্য, আর তৃতীয়টা একটা বইয়ের প্রচ্ছদপট। বইটার নাম 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে'। ছবি পছন্দ হলে তবে টাকা পাবেন। আমার কাজ ছবি যোগাড় করে আনা, পছন্দ করবেন ব্যবসার মালিকরা।"

"পছন্দ হলে কি রকম টাকা পাওয়া যাবে?"

"ছবি পিছু পঁচিশ টাকা। অনেক আর্টিস্ট ওর চেয়েও কম নেন, কিন্তু

আমি আপনার বাবাকে পঁচিশ টাকাই পাইয়ে দেব। এসব ছবি আঁকতে ওঁর কতক্ষণই বা লাগবে। আসলে আইডিআটারই দাম।"

বর্ণনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটু আগেই তার বাবার এক একটা ছবির জন্য হাজার টাকা দিতে চাইছিল একজন, আর ইনি পঁচিশ টাকাও যেন অনুগ্রহ করে দিচ্ছেন। তৎক্ষণাৎ অবশ্য তার মনে হল সুখময়বাবু কি কেবল ছবির জন্যই অত টাকা দিচ্ছিলেন?

"আপনার আপিসটা কোথায়? ছবি-আঁকা হলে কোথায় নিয়ে যাব? এখানেই আনব?"

"এখানে আনতে পারেন, কিন্তু আপিসে যাওয়াই ভালো। আপনার বাবাকেই পাঠিয়ে দেবেন।"

"বাবা এখানকার পথ-ঘাট তেমন চেনেন না। আমিই গিয়ে দিয়ে আসব। আপনার আপিসের ঠিকানাটা দিন।"

ঠিকানাটা নিয়ে চলে এল বর্ণনা, কিন্তু বাড়ি গেল না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবতে লাগল, বিচার করতে লাগল। একটা কথা বার বার তার মনে হচ্ছিল আর একটা চাকরি পাবার আগে এ চাকরিটা ছাড়বে কিনা। লোকটা যে পাষণ্ড তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে নিজে যদি সংযত থাকে কি করবে ও? জীবন-যুদ্ধে যখন নাবতেই হয়েছে তখন অত স্পর্শকাতর হলে চলবে কেন? এই যে রোজ রাস্তা দিয়ে সে হাঁটে একাধিক পশুর লুব্ধদৃষ্টি কি তার সর্বাঙ্গ লেহন করে না? তাই বলে সে কি রাস্তায় হাঁটা ছেড়ে দেবে, না বোরখা পরে বেরুবে। বাবার ছবিগুলো উদ্ধার করে' আনবার জন্যেও তো তার কাছে যাওয়া দরকার। আর সত্যিই যদি সে দু'হাজার টাকা দিয়ে ছবিগুলো কেনে, তাহলে বিক্রিই বা করবে না কেন? ক্রেতার চরিত্র নির্ণয় করে ছবি বেচে না কেউ। যদি চাকরি ছেড়েই দিতে হয় ওই টাকাগুলোই তখন সম্বল হবে...

হঠাৎ তার চিন্তাধারা বিঘ্নিত হল, একটা ট্যাক্সি নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার পাশে। আর ট্যাক্সির ভিতর থেকে মিষ্টি সুরে ভেসে এল—"বোর্নিও, বোর্নিও—"

আকাশ-পরীর গলা।

"বোর্নিও, তুই চিত্রাঙ্গদা দেখতে যাসনি ?"

"না ভাই যাওয়া হয়নি। কেমন হল ?"

"চমৎকার। অনেক লোকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছি। কোথা যাচ্ছিস ?"

"বাড়ি।"

"চল্ তোকে পৌঁছে দি—"

ট্যাক্সিতে উঠল বর্ণনা। তার মনেই ছিল না যে ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা আজ 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করছিল 'এম্পাআর' থিএটারে। আকাশ-পরী 'চিত্রাঙ্গদা' সেজেছিল।

"তুই এত মনমরা হয়ে আছিস কেন বল্ তো ?"

ম্লান হেসে বর্ণনা বললো, "এমনি—"

আকাশ-পরী বড়লোকের মেয়ে, কিছুদিন পরে বড়লোকের বউ হবে, হবু স্বামী একজন বড় মিলিটারি অফিসার। যদিও আকাশ-পরী বর্ণনার খুব বন্ধু, তবু নিজের দৈন্যের কথা সে কোনদিন বলেনি তাকে। বলতে লজ্জা করত। বর্ণনাকে নাবিয়ে দিয়ে আকাশ-পরী চলে গেল। যাবার আগে দু লাইন কবিতা বলে গেল—

"সখি, আবরি রেখ না হিয়া
মরা মনটিরে জিয়াইয়া তোল প্রেমবারি সিঞ্চিয়া—"

কথায় কথায় গান আর কবিতা তৈরি করতে পারত সে।

বর্ণনা বাড়িতে ঢুকে দেখলে বাবা চিন্তিত হয়ে বসে আছে তার অপেক্ষায়।

"এত রাত হল যে তোর ?"

মিথ্যে কথা বললে বর্ণনা।

"আজ কলেজে থিএটার ছিল। আচ্ছা বাবা, তুমি বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকবে ? সামান্য কাজ, অথচ ছবি-পিছু পঁচিশ টাকা করে দেবে।"

"কি রকম ছবি ?"

"সে কিছুই নয় তোমার পক্ষে। পরে বলব তোমাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা বনস্পতিকে বলতে পারল না যে জুতোর কালীর আর দেশলাই বাক্সের জন্য ছবি আঁকতে হবে।

"মা কোথা ?"

"হিমুদার ওখানে গেছে। ওদিকে আবার এক কাণ্ড হয়েছে।"

"আবার কি হল ?"

"বন্দুক কিরিচ কেউ ফেরেনি এখনও। বৌদি আরও ক্ষেপে গেছে। ক্রমাগত চীৎকার করছে আমার মেয়েদের ফিরিয়ে এনে দাও। হিমুদা ফিরে আসতেই হাতা ছুঁড়ে মেরেছে তাকে। লাঠি সোঁটা বল্লম কেউ বাড়িতে নেই। তুইও তো ছিলি না। হিমুদাই গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন, তিনি আবার একটা ইন্‌জেকন দিয়ে গেছেন।"

সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকলেন।

"তুমি চলে এলে যে ?"

"কে একজন ভদ্রলোক কুষ্ঠি নিয়ে এসেছেন দাদার কাছে। বর্ণনা তুই একবার যা ওখানে, ওষুধ আনতে হবে।

ঘর থেকে বেরুতেই দেখা হয়ে গেল সাবু মিত্তিরের সঙ্গে।

বুড়ির জঙ্গল বনকরটা বেঁচে গিয়েছিল। তারই খানিকটা বন্দোবস্ত করে কিছু চাল-ডাল সংগ্রহ করে এনেছিল সে।

"সাবুদা তুমি কি ওষুধ আনতে যাচ্ছ ?"

"না, আমি বাসায় ফিরে যাচ্ছি। এখন না গেলে ট্রাম পাব না আর। টালিগঞ্জে যেতে হবে তো।"

"ও আচ্ছা।"

সাবু চলে গেল।

হেমন্তকুমারের ঘরে ঢুকে বর্ণনা দেখল নবনী রায় হেমন্তকুমারের সঙ্গে কথা কইছে। নবনী ইদানীং প্রায় কোন-না-কোন ছুতো নিয়ে হেমন্তকুমারের কাছে আসে বর্ণনার দেখা পাবে বলে। আজ তার সে আশা সফল হল। হেমন্তকুমারের মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে বর্ণনা জিগ্যেস করলে, "তোমার মাথায় কি হল মামাবাবু ?"

"গলিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকার তো গলিটা তোর মামীমারও আবার অসুখ করেছে।"

আসল ব্যাপারটা বাইরের লোকের কাছে ভাঙল না হেমন্তকুমার।

নবনী রায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। নমস্কার করে বর্ণনাকে বললে, "চিনতে পারছেন?"

বর্ণনা চিনতে পারলে না।

"আপনি সেদিন যখন 'লরি' থেকে ছবি নাবাচ্ছিলেন তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, প্রায় মাস তিনেক আগে।"

এইবার মনে পড়ল বর্ণনার।

"এখানে এসেছেন কেন?"

"স্বামীজির কাছে একখানা কুষ্ঠি নিয়ে এসেছিলাম। উনি আমাকে একটা কবচ করে দিয়েছিলেন, খুব ভালো ফল পেয়েছি।"

'স্বামীজি' কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে গেল বর্ণনার।

হেমন্তকুমার বললে, "নবনীবাবু, আজ আর কুষ্ঠি বিচার করতে পারব না। কপালটা কেটে গেছে, তার উপর বাড়িতেও অসুখ। আপনি দিন সাতেক পরে আসবেন।"

"বেশ। টাকাটা দিয়ে যাই।"

দু'খানি দশ টাকার নোট বার করে দিল নবনী রায়।

হেমন্তকুমার তখন বর্ণনার দিকে ফিরে বলল, "তোর মামীমার জন্যে ডাক্তার চক্রবর্তী একটা প্রেসক্রপশান লিখে দিয়ে গেছেন, তুই এনে দিতে পারবি?"

"শ্যামবাজারে যেতে হবে তো। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে, 'বাস' হয়তো পেতে পারি। দাও, দেখি—"

নবনী রায় বললে, "আমি ট্যাক্সি করে এসেছি। আপনাকে 'লিফ্ট্' দিয়ে দিতে পারি যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"বাইরে তো কোন ট্যাক্সি দেখলুম না।"

"বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।"

"চলুন তাহলে—"

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নবনী রায় বলল, "স্বামীজি যে আপনার মামা তা জানতাম না।"

বর্ণনাও জানত না যে হেমন্তকুমার স্বামীজি সেজে পয়সা রোজগার করছেন। বর্ণনার মজা লাগল একটু। কিন্তু পরমুহূর্তেই লজ্জা হল। একটু আগেই সে সুখময়বাবুর মুখোসের অন্তরালে যে পশুকে দেখেছিল হেমন্তকুমারের মধ্যেও যেন সেই পশুর আর এক রূপ দেখতে পেল সে।

"আপনার বাবার আঁকা ছবিগুলো কি এইখানেই এনে রেখেছেন?"

নবনী রায়ের প্রশ্নে একটু বিস্মিত হল বর্ণনা, এই ছবির কথাই এখনি ভাবছিল সে।

"আর কোথা রাখব বলুন। কিছু বিক্রি করে দিতে চাই, কিন্তু খরিদ্দার পাচ্ছি না। কোথাও এক্‌জিবিট্ করতে পারলে হত, কিন্তু জানাশোনা সে রকম জায়গা তো নেই। একজনকে দিয়েছিলাম কয়েকখানা, কিন্তু সেখানে রাখা চলবে না।"

"কেন, কি হল? একটাও বিক্রি হয়নি?"

"তিনি একখানা কিনেছেন আরও কিনতে চান, কিন্তু—"

হঠাৎ থেমে গেল বর্ণনা।

"কিন্তু কি?"

"সেখানে পোষালো না ঠিক।"

এই সময় বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারা। আলো পড়লো বর্ণনার মুখে। নবনী রায় দেখতে পেল সে একটু অপ্রতিভ আর লজ্জিত হয়ে পড়েছে।

নবনী তখন বলল, "আমার একটি ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, তার ভাল 'শো-কেস'ও আছে। লোকটি মাদ্রাজী, খুবই ভদ্রলোক। আপনি যদি চান তার 'শো-কেসে' দু'একটা ছবি রাখিয়ে দিতে পারি। অনেক লোক আসে তার দোকানে, বিক্রি হয়ে যেতে পারে।"

"যদি করে দিতে পারেন, খুব উপকৃত হব।"

উপকারী বন্ধুর ভূমিকায় নাবতে ইচ্ছা ছিল না নবনীর, কিন্তু নাবতে

হল। সে মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নিল কি করবে, এখন ধরা দিতে হল বটে, কিন্তু আর দেবে না।

"ছবিগুলো কি আপনার বাড়িতে দিয়ে আসব? আপনার ঠিকানা কি?

"আমি বাইরে থাকি। যাঁর কাছে ছবিগুলি আছে তাঁর কাছে যদি একটা চিঠি লিখে দেন আনিয়ে নিতে পারি। কিম্বা এখানে যদি এনে রাখেন, আমার সেই বন্ধুটি এখান থেকেও নিয়ে যেতে পারেন।"

"বেশ। কাল আপনি আসবেন কি? তাহলে আপনাকে সঙ্গে করে না হয় নিয়ে যাব তাঁর কাছে।"

"আসব। কোথায় দেখা হবে আপনার সঙ্গে? এইখানেই?"

"আপনি যদি আমাদের হস্টেলে যান তাহলে আমার সুবিধা হয়।"

"হস্টেল? কোথায় সেটা?"

"হস্টেল বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। আমরা জনকয়েক পোস্ট-গ্র্যাজুএট মেয়ে একটা বাড়িভাড়া করে থাকি। কলেজ রো-তে। ঠিকানাটা লিখে দেব আপনাকে?"

"বেশ যাব। পাঁচটা নাগাদ থাকবেন সেখানে?"

"থাকব।"

ওষুধের দোকানে নেবে বর্ণনা হস্টেলের ঠিকানাটা নবনী রায়কে লিখে দিলে।

ওষুধ নিয়ে বর্ণনা যখন ফিরল তখনও বন্দুক কিরিচ ফেরেনি। লাঠি ফিরেছে, কিন্তু মত্ত অবস্থায়। বর্ণনা এসে দেখলে সোঁটা তার মাথায় জল ঢালছে আর বল্লম জোর করে তার মাথাটা হেঁট করে রেখেছে। বাকী ছেলে-মেয়েগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখছে। হেমন্তকুমার নেই।

"মামাবাবু কোথায় গেলেন?"

জবাব দিল কাটারি—"বাবা দিদিদের খুঁজতে বেরিয়েছে।"

ছোরা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল, সে মুখটা খুলে বললে,

"ওরা খিদিরপুরে সেকেণ্ড শোয়ে 'নাগীন' দেখতে গেছে। বাবাকে বললুম কিন্তু বাবা শুনলে না।"

বর্ণনা পার্টিশনের ওপারে উঁকি মেরে দেখলে ইন্‌জেকশনের ঘোরে সত্যবতী মড়ার মতো ঘুমুচ্ছে। তার মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে বনস্পতি, তার দুটি চক্ষুই বিস্ফারিত।

বর্ণনাকে দেখে বনস্পতি বললে, "ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার তো ঘুম হয় না, তাই আমিই বসলুম এসে।"

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বর্ণনা।

সাত

হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ঠিক মেয়েদের খোঁজবার জন্যেই বেরোয়নি, সে যেন আর কিছু খুঁজছিল, কিন্তু সেটা যে কি তাও ঠিক করতে পারছিল না। জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের ডাক্তার সামন্তর সঙ্গে তার যে আলাপ হয়েছিল সেইটেই মনে পড়ছিল বারবার। সেদিন যা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে এই।

ডাক্তার সামন্ত খুব ভদ্র এবং বিনয়ী লোক। ডাক্তার চক্রবর্তীর চিঠি পেয়ে তিনি আরও ভদ্র, আরও বিনয়ী হয়ে পড়লেন। বললেন, "আপনার জন্য যথাসাধ্য আমি করব। আপনার ব্যাপারটা কি আগে শুনি।"

সব শুনে বললেন, "আমার মনে হয় আপনার স্ত্রীর পেটে যে সন্তানটি এখন আছে সেটি সম্ভবত নষ্ট হয়ে যাবে। সে যা হবার হোক, কিন্তু এরপর আপনাকে বার্থ-কণ্ট্রোল করতে হবে।"

"ওইটেতেই আমার ঘোর আপত্তি। আমি গরীব লোক, বংশবৃদ্ধি করলে নিজেই ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ব তাও বুঝতে পারছি, কিন্তু খোদার উপর খোদকারি করবার সাহস আমার নেই। খোদা বলতে আমি প্রকৃতি মিন্ করছি। আপনারাই তো বলেন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা অন্যায়।"

"কোন কোন ক্ষেত্রে তা বলি বটে, কিন্তু মানব-সভ্যতার মূল কথাটা ভুলে যাবেন না। উপনিষদ পড়া আছে কি আপনার?"

"কিছু কিছু পড়েছি—"

"বৃহদারণ্যকে আছে বুদ্ধিমান মানুষ শ্রেয়কে আশ্রয় করে থাকেন, যা মঙ্গলজনক তাই তিনি বরণ করেন। কি মঙ্গলজনক এইটেই মানুষের কাছে সব চেয়ে শক্ত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্যে বহু শতাব্দী পূর্বে মানুষ জ্ঞানের পথে যাত্রা করেছে, কিন্তু সে উত্তর পুরোপুরি মেলেনি, তার সন্ধানও শেষ হয়নি। একটা কথা কিন্তু ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে সভ্য মানুষ প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান, বিদ্রোহী হয়েই সে সভ্য হয়েছে। যে তপস্বী হিমালয়ের নির্জনতায় নিদারুণ ঠাণ্ডায় তপস্যা করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি, আবার যিনি গগল্‌স্‌ পরে' এরোপ্লেনে চড়ে' ছ'মাসের পথ ছ'দিনে অতিক্রম করছেন তিনিও প্রকৃতির নিয়ম মানেননি। যে মানুষ কাঁচা মাংস আর শাক-সব্‌জিকে সুখাদ্য ব্যঞ্জনে পরিণত করেছে, উলঙ্গ শরীরকে নানারকম বেশ-বাসে ঢেকেছে, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, পঞ্চইন্দ্রিয়ের সমস্ত শক্তির সীমানা ক্রমাগত বাড়িয়েছে, ওষুধের পর ওষুধ বার করে যে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে অবিরাম, ভোগ-তৃষ্ণা কমিয়ে বাড়িয়ে নানারকম করে সে ক্রমাগত জানতে চাইছে—আমাদের শ্রেয় কিসে, যে মানুষ একদিন হারেম বানিয়েছিল, বহু বিবাহ করে অজস্র সন্তান সৃষ্টি করেছিল সেই মানুষই আজ নূতন সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, পৃথিবীতে আর স্থান নেই, খাদ্য নেই। পৃথিবীর আয়তনের একটা সীমা আছে, উৎপাদন শক্তিরও একটা সীমা আছে, আমরাও যদি সন্তানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ না করি তাহলে বিপদ অনিবার্য—"

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল হেমন্তকুমার।

"বাঃ, আপনার সার ডাক্তার না হয়ে অধ্যাপক হওয়া উচিত ছিল। চমৎকার বলবার ক্ষমতা আপনার। কিন্তু এ বিষয়ে আমারও একটু বক্তব্য আছে, শুনবেন কি?"

"নিশ্চয় শুনব।"

"আপনি সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করছেন। আমি আমাদের

মতো সামান্য লোকের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে কথাগুলো বলছি। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের দিনমজুরী করে' খেটে খেতে হয়, সেজন্য আমাদের মতো লোকের পক্ষে পরিবারে যত লোক বৃদ্ধি হবে ততই সুবিধে নয় কি? প্রত্যেকেই আর্নিং মেম্বার হবে। সেদিন একটা মেথরকে জিগ্যেস করেছিলাম, সে বললে তাদের মাসিক রোজগার মাসে তিন শ' টাকা। সে নিজে, তার বউ, তার ছেলে, মেয়ে, পুত্রবধূ সবাই রোজগার করে। এর আর একটা দিকও আছে। আমাদের গণতন্ত্র হয়েছে আজকাল, সুতরাং যারা সংখ্যায় বেশি, শাসন-ব্যাপারে তাদেরই আধিপত্য থাকবে। আপনারা যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করে ভদ্রলোকদের সংখ্যা কমিয়ে দেন আর ওই অশিক্ষিত মুচি মেথররা যদি ক্রমাগত সংখ্যায় বেড়ে যায়, বাড়বেই, কারণ তারা আপনাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ শুনবে না, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওদেরই রাজত্ব হবে, আমরা জীবন-যুদ্ধে হেরে যাব ওদের কাছে। সেটা কি ঠিক হবে?"

ডাঃ সামন্ত হাসিমুখে কথাগুলি শুনলেন। তারপর বললেন, "দেখুন, যাঁরা সংখ্যায় বেশি তারাই যে সব সময়ে জয়ী হয় তা নয়। আমাদের দেশেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, তিনি বাবার এক ছেলে। সিংহের সন্তান-সংখ্যা খুব কম, কিন্তু সিংহই পশুরাজ। আমাদের কবিও বলে গেছেন, একশ্চন্দ্র তমোহন্তি ন চ তারাগণৈরপি। যারা সংখ্যায় বেশি তারাই সব সময়ে জয়ী হয় না, তারাও শেষ পর্যন্ত গুণী শক্তিমানদের আধিপত্য মেনে নেয়। গুণী আর শক্তিমান হওয়াটাই আসল কথা। আর আপনি রোজগারের কথা যা বললেন তা আপাতদৃষ্টিতে চমৎকার মনে হতে পারে কিন্তু একটু তলিয়ে যদি দেখেন এর গলদ ধরা পড়বে। আপনার এতে খুব লাভ হবে না শেষ পর্যন্ত। পশু-পক্ষীদের সন্তান-সন্ততিরা একটু বড় হয়েই নিজেরা চরে খায়। কিন্তু তারা তাদের বাপ-মায়ের ভাইবোনের কথা কি ভাবে কখনও? তারা যেই সমর্থ হয় অমনি পর হয়ে যায়। যে সব মুচি মেথরদের কথা আপনি বললেন তাদের পারিবারিক জীবনের খবর নিয়েছেন কখনও? যদি নেন, আপনার মত বদলে যাবে। ওদের

ছেলে-মেয়েরা কেউ বাপ-মাকে মানে না, বুড়ো বাপ-মাকে বসিয়ে খেতে দেয় না কেউ, তারা যখন অসমর্থ হয় তখন ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের একমাত্র গতি, ছেলে-মেয়ে কেউ ফিরেও চেয়ে দেখে না তাদের দিকে। আপনি কি এই রকম ছেলে-মেয়ে চান? ছেলে-মেয়েকে শিক্ষিত, কর্তব্যপরায়ণ, শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে' তুলতে না পারলে তারা আপনার কোন কাজেই আসবে না। সাধারণত অশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা যে-ই টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে অমনি সে স্বাধীন হয়ে পড়ে, নিজের খুশিমতো স্বোপার্জিত টাকা খরচ করতে চায়, ছোট ভাই-বোনদেরও দায়িত্ব নিতে চায় না। আমি একজন তথাকথিত শিক্ষিত ছোকরাকে বলতে শুনেছি, ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিতে আমি বাধ্য নই, বাবা তাদের জন্ম দিয়েছেন, বাবা তাদের মানুষ করবেন। ছোকরা স্কুলে কলেজে পড়েছে বটে, কবিতা-টবিতাও লেখে, কিন্তু শিক্ষিত হয়নি। ছেলে-মেয়েরা যদি পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়, তাহলে তারা রোজগার করলেও বাবা-মার আর্থিক সুবিধা হয় না। তাদের শ্রদ্ধাশীল, কর্তব্যপরায়ণ করতে হলে প্রকৃত শিক্ষা দিতে হবে, তাদের দেহের স্বাস্থ্য, মনের স্বাস্থ্য দুইই ভালো করতে হবে, তাহলেই তারা সুপুত্র সুকন্যা হবে। একপাল ছেলেমেয়েকে এভাবে মানুষ করা সম্ভব কি? ভেবে দেখুন কথাটা।"

হেমন্তকুমার চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "জন্মনিরোধ করতে হলে কি করতে হবে?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ডাক্তার সামন্ত।

"এই যে, আসুন না, সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। পাশের ঘরটায় চলুন।"

ডাক্তার সামন্ত বই বার করে, ছবি এঁকে, নানারকম ছবি দেখিয়ে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন।

হেমন্ত মন দিয়ে শুনল সব, তারপর হেসে বলল, "দেখুন ডাক্তারবাবু, অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমাকে বলেছিল মেরুদণ্ড সোজা করে, পদ্মাসনে বসে, চোখ বুঁজে, দুই ভ্রূর মাঝখানে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করে যদি প্রাণায়াম করতে পারি, তাহলে কপালের মাঝখানে আলো দেখতে পাব, আসন ছেড়ে শূন্যে উঠতে পারব, ফলে

যে আনন্দ পাব, তাই স্বর্গ-সুখ। আমি মেরুদণ্ডটা কোনক্রমে সোজা করেছিলাম, কিন্তু পদ্মাসনে বসতে পারলুম না, একটা পায়ের উপর আর একটা পা ওঠাতেই পারলুম না। অনেক কষ্টে একবার উঠিয়েছিলাম, কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে গেল। তাই স্বর্গ-সুখ ভোগ করা আর হল না। জন্মনিরোধের যে সব বখেড়া দেখছি ওসব আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, এখন উঠি, দরকার হলে আবার আসব। কত দক্ষিণা দিতে হবে আপনাকে ?"

"আমাকে কিছু দিতে হবে না।"

"না, সে হয় না, এতক্ষণ সময় নষ্ট করলুম আপনার, সামান্য কিছু নিতে হবে।"

গোটা পাঁচেক টাকা ডাক্তার সামন্তর হাতে গুঁজে দিয়ে চলে এসেছিল সেদিন হেমন্তকুমার।

মাথায়-ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা, উদ্‌ভ্রান্ত-দৃষ্টি হেমন্তকুমার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মাতাল লাঠির কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল, "শ্লা, গেরুয়া মারিয়েছে— !"

ডাক্তার সামন্তর কথাগুলো তার মনে পড়ল, "আপনি কি এইরকম ছেলে-মেয়ে চান ?"

আট

'সুখপুর-পত্রিকা' বন্ধ হয়নি।

বাচস্পতি-সীমন্তিনী যেন আরও বেশি নিষ্ঠাভরে সেটাকে আঁকড়ে ধরেছিল। সুদেষ্ণাকে গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে বাচস্পতিকে রোজ খানিকক্ষণ পড়াশোনা করতে হত, বর্ণনা দরকার মতো তাকে বই এনে দিত ইউনিভার্সিটি থেকে, সীমন্তিনীও কাঁথা সেলাই করে' কিছু রোজগার করতে আরম্ভ করেছিল—কিন্তু এসবের জন্যে 'সুখপুর-পত্রিকা'র

কাজ বন্ধ হয়নি, তা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। খবর সংগ্রহের জন্য বাচস্পতিকে আর টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে' বাইরে যেতে হত না, ওই গলিতে তার চোখের সামনেই যে সব ঘটনা ঘটত তাই লিপিবদ্ধ করে আনন্দ পেত সে। আর একটা জিনিসও হয়েছিল, কোলকাতায় এসে খবরের কাগজের সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামতও গড়ে উঠেছিল। কোলকাতায় প্রকাশিত 'সুখপুর-পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকেই সেটা বেশ বোঝা যায়। উদ্ধৃত করছি।

"সুখপুর-পত্রিকার আদর্শ। আমরা সুখপুর ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি বটে, কিন্তু সুখপুরের আদর্শ, সুখপুরের স্মৃতি আমাদের মনে অক্ষুন্ন আছে। আশা করি বরাবর থাকিবে। মহৎ মানবতার আদর্শ এবং স্মৃতিই সুখপুর-পত্রিকা সম্পাদনায় আমাদিগকে চালিত করিবে। ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির সহিত আমাদের তেমন পরিচয় ছিল না। এখানে আসিয়া পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু সে পরিচয় লাভ করিয়া সুখী হই নাই, আতঙ্কিত হইয়াছি। এই পত্রিকাগুলির প্রথম পৃষ্ঠাতেই যে ভয়ঙ্কর খবরগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় তাহা পড়িয়া মনে হয় না যে আমরা সভ্য মানব-জাতির সংবাদ পাঠ করিতেছি। বরং এই কথাই মনে হয়, আমরা সভ্য নহি, আমরা বর্বর, আমরা পশু। কিন্তু ইহা সত্য নহে, উচ্চ প্রেরণামূলক গৌরবজনক খবর অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি ছাপা হয় না। এই অতি ঘৃণ্য দুঃসংবাদগুলি একত্রিত করিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় ফলাও করিয়া প্রদর্শন করার তাৎপর্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সংবাদগুলি সত্য হইলেও গৌরবজনক নহে, সেগুলি যদি ছাপিতেই হয় পিছনের দিকে ছোট অক্ষরে সসঙ্কোচে ছাপা উচিত। নক্কারজনক ডাস্টবিনকে কেহ বৈঠক-খানার টেবিলের উপর স্থাপন করেন না। কিন্তু এই সংবাদপত্রগুলি প্রতিদিন তাহাই করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী মিস্ মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পুস্তক সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাই মনে পড়ে। এ সকল সংবাদ পাঠ করিয়া কেহ যে বিশেষ উপকৃত হন তাহা মনে হয় না।

কেহ বিষণ্ণ হন, কেহ উত্তেজিত হন, কেহ কেহ বা হয়তো একটা পাশবিক আনন্দ তির্যকভাবে উপভোগ করেন। কতকগুলি বেকার যুবক-যুবতী এসব খবর লইয়া চায়ের দোকানে বসিয়া গুলতানি করেন শুনিয়াছি। মনে হয় এসব খবর এমন বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করার পিছনে কোনও রাজনৈতিক চক্রান্ত আছে। কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল বিপক্ষ দলকে অপ্রস্তুত বা নিষ্প্রভ করিবার জন্য এগুলি হয়তো ছাপে। এক দলের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করাই নাকি ইহাদের উদ্দেশ্য। হায়রে জনমত, কতটুকু তাহার পরমায়ু!

মানব-সভ্যতার গৌরবজনক খবরগুলি এসব পত্রিকায় ক্বচিৎ ছাপা হয়, হইলেও সেগুলিকে মোটেই প্রাধান্য দেওয়া হয় না, যদি না সেগুলির রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে। সাধারণত দেখি বীরত্ব মহত্ত্ব প্রতিভা-পৌরুষের খবরগুলিকে পাশবিক খবরগুলির অনুবর্তী বা পদপ্রান্তলীন করিয়া ছাপা হয়। মানবজাতির অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এ-কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, এ মনোভাব অত্যন্ত হীন অবাঞ্ছনীয় পশুর মনোভাব। 'সুখপুর-পত্রিকা' যদিও ক্ষুদ্র তবু মানবতার আদর্শকেই সে প্রাধান্য দিবে। অদ্যকার খবরের কাগজগুলিতে বহু ভয়াবহ পাশবিক খবর ছাপা হইয়াছে, কিন্তু আমরা নিম্নলিখিত খবরটিকেই প্রাধান্য দিলাম। নাশের, ক্রুশ্চেভ, চু-এন্-লাইয়ের খবর, আমাদের বিবেচনায়, ইহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই একটি দরিদ্র পরিবার বাস করে। তাহাদের একমাত্র কন্যা মিণ্টুর কালাজ্বর হইয়াছে। মিণ্টুর বাবা বলিতেছিলেন অর্থাভাবে মেয়েটির চিকিৎসা হইতেছে না। দাতব্য চিকিৎসালয়গুলিতেও পয়সা খরচ না করিলে সুচিকিৎসা হয় না। মেয়ের রোগের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে মিণ্টুর খাদ্যদ্রব্যে নাকি খুব লোভ, উহা নাকি কালাজ্বর ব্যাধির একটি লক্ষণ। কিন্তু সকালে জলখাবার হিসাবে মাত্র দুইখানি বিস্কুটের বেশি তিনি তাহাকে দিতে পারেন না, দিতে ভয়ও হয়, পয়সাও নাই। গতকল্য কিন্তু একটি অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। আমাদের গলিতে

মিন্টুদের বাড়ির সম্মুখে একটি ছিন্নবসনা ভিখারিণী তার-স্বরে চীৎকার করিতেছিল, আমাকে দয়া করিয়া কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে পারি না। কেহই তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেছিল না। সহসা দেখিলাম কঙ্কালসার লোভী মিন্টু তাহার রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিল এবং তাহার বরাদ্দ দুইখানি বিস্কুটের একখানি ওই ক্ষুধার্তা ভিখারিণীটিকে দান করিল। আমাদের বিবেচনায় এই খবরটিই অদ্য আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে সর্বাগ্রে বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য। চিত্রতারকাদের ছবির পরিবর্তে মিন্টুর ছবিই সর্বাগ্রে বড় করিয়া ছাপা উচিত। কারণ ওই মিন্টুরাই মানব-সভ্যতার ধারক এবং বাহক। উহার আচরণ দেখিয়া বহুকাল পরে প্রাতঃস্মরণীয় রাজা শিবিকে মনে পড়িল। কৃতার্থ হইয়া গেলাম।"

এই ধরনের খবরই 'সুখপুর পত্রিকা'য় প্রকাশিত হত। রিক্‌শাওলার কর্তব্যবোধ, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালাদের অসাধুতা, গাভীর প্রতি অকথ্য নিষ্ঠুরতা এবং তার কারণ, শহরের কলতলা ও পল্লীর পুকুর-ঘাটের তুলনামূলক আলোচনা, রাস্তায় ঘাটে বাঙালীদের তুলনায় অবাঙালীদের ভিড়, অবাঙালীদের পোশাক পরিচ্ছদ নকল করার দিকে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের প্রবণতা, ধারের ভারে পাড়ার মুদিটির ব্যবসায়-নৌকাটি কেন ডুবু-ডুবু, পথের ধারে যে মুচিটি বসে' জুতো সেলাই করে আধুনিক জুতো সম্বন্ধে তার অভিমত, জনৈক গরীব বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে অভিজাত-বংশীয় একটি অ্যালশেসিআন কুকুর-ছানার দুর্দশা,—সুখপুর-পত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে এরকম অনেক কৌতুকজনক সংবাদ এবং সে সম্বন্ধে বাচস্পতির সরস মন্তব্য পাওয়া যাবে।

পারিবারিক খবরও থাকত কিছু কিছু। এই কাহিনীর যোগসূত্র হিসাবে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করছি।

"শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের বর্তমান জীবন-দর্শন। আমাদের নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমারের জীবনে উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে।

এই বিপর্যয়ের হেতু নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু যদি কেহ ইহাকে কেবলমাত্র অর্থ-সঙ্কটের সহিতই যুক্ত করেন, আমাদের মতে হেতুর স্বরূপটি তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইবে না। অর্থ-সঙ্কটকে আপাত-কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে প্রকৃত কারণ নিহিত আছে স্বভাবে, সংস্কারে এবং জীবন-দর্শনে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, গোমাংস-ভক্ষণ ব্যতীত ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্য উপায় নাই, এমত অবস্থায় পতিত হইলে সকলেই কি গোমাংস-ভক্ষণ করিবে? আমাদের মনে হয় সকলে করিবে না, যুক্তিযুক্ত হইলেও করিবে না, অনেকে গোমাংস-ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু-বরণই শ্রেয় মনে করিবে। মানুষের স্বভাব, সংস্কার এবং জীবন-দর্শনই তাহার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাহার আচরণের অনুকূল যুক্তিও সে আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় এবং তজ্জন্য যে কোনও কৃচ্ছ সাধন করিতেও সে প্রস্তুত থাকে। জীবন-রক্ষার জন্য গোমাংস-ভক্ষণ করাও অনুচিত নহে ইহাই যদি কাহারও জীবন-নীতি হয় তাহা হইলে গোমাংস-ভক্ষণ-জনিত সামাজিক ও দৈহিক অসুবিধাগুলিও সহ্য করিবার জন্য তাহার প্রস্তুত থাকা উচিত। হেমন্ত-কুমার যতদিন স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন ততদিন তাঁহার স্বভাবের বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত জীবন-নীতির কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু অর্থোপার্জন করিতে হইবে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি গৈরিক বেশ পরিধান করত: জ্যোতিষাচার্যের ভূমিকায় অবতরণ করিয়া-ছিলেন, ছেলেমেয়েদেরও ইতরজনোচিত কর্মে নিয়োগ করিতে ইতস্তত করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন কর্মজগতে জাতিভেদ নাই, যে কোনও কর্মই ভালো কর্ম, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নহি। কর্মের প্রভাব চরিত্রের উপর পড়িবেই, যদি না সে চরিত্র পদ্মপত্রবৎ নির্বিকার হয়। হেমন্তকুমারের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহই এরূপ চরিত্রবান বা চরিত্র-বতী নহে। ফলে কুসঙ্গে মিশিয়া তাহারা বিপথে গিয়াছে। বড় মেয়ে বন্দুক এবং বড় ছেলে লাঠি এখন আয়ত্তের বাহিরে। দ্বিতীয় পুত্র সোঁটা, তিনটি কন্যা কিরিচ, ছোরা, কাটারি এবং সপ্তম পুত্র বল্লমও যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা যথেচ্ছ রোজগার, যথেচ্ছ খরচও করে। হেমন্ত-

কুমারের স্ত্রী সত্যবতী উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছে। সে আসন্নপ্রসবা ছিল, কয়েকদিন পূর্বে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া তাহার অবস্থা যাহা হইয়াছিল তাহা প্রায় অবর্ণনীয়। মহামতি ডাক্তার হরিভূষণ সামন্ত মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পাগলামি বাড়িয়াছে। সে ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে, আমার ছেলে-মেয়েদের ফিরাইয়া দাও। চিকিৎসায় পাগলামির কোন উপশম হইতেছে না। হেমন্তকুমার নিজেই এবার চিকিৎসার ভার লইয়াছেন। তিনি পুনরায় পার্টিশন করাইয়াছেন। তাঁহার মতে স্ত্রীর সহিত পূর্ববৎ একত্র শয়ন করিলে তাহার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। ডাক্তার সামন্ত তাহা মনে করেন না। তিনি বলিতেছেন একত্রে শয়ন করিবার পূর্বে জন্ম-নিরোধের ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তার চক্রবর্তী পরামর্শ দিয়াছেন শ্রীমতী সত্যবতীকে আপাতত কোনও পাগলা-গারদে স্থানান্তরিত করা হউক। বর্ণনা এ বিষয়ে খোঁজ করিয়াছে, কিন্তু পাগলা-গারদেও স্থানাভাব। হেমন্তকুমারের বাকী সন্তান কয়টি—কোদাল, কুড়ুল, সড়কি আর খন্তা আমাদের নিকট আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি, কিন্তু মনে হয় তাহাদের সুখী করিতে পারি নাই। তাহারা হাসে না, কথা বলে না, অকারণে কোন একটা ছুতা করিয়া কান্নাকাটি করে। মনে হয় হেমন্তকুমারও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জীবন-দর্শনের সহিত তাঁহার আচরণের মিল হয় নাই। তিনি যে পথে চলিতে চাহিয়াছিলেন সে পথের বিপদের কথা তাঁহার জানা ছিল না, সেজন্য তিনি প্রস্তুতও ছিলেন না। তাঁহার সমস্ত অন্তঃকরণ আর্তনাদ করিতেছে, কিন্তু তিনি জেদী লোক, বাহিরে নিজের জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অতিশয় মর্মন্তুদ ব্যাপার। গত রাত্রে তাঁহার স্ত্রীর চীৎকার শুনিয়া বুঝিলাম সকলের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া হঠকারীর মতো আচরণ করিবার শৌর্যও তাঁহার আছে। তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিতেছিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, ছাড়িয়া দাও, তুমি দূর হইয়া যাও, দূর হইয়া যাও।

হেমন্তকুমারের মতো আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি।"

নয়

বর্ণনাই সবচেয়ে বেশি বিব্রত হয়েছিল হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে। কারণ তা ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছিল এবং বর্ণনাকেই চেষ্টা করতে হচ্ছিল সে জট ছাড়াবার। বন্দুক বাড়িতে আসা বন্ধ করেছিল। কিরিচের মুখে শোনা গেল সে এক বড়লোকের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যেই বাহাল হয়েছে। ভাল মাইনে দিচ্ছে তারা। মাসে পঁচিশ টাকা, তাছাড়া খাওয়া পরা। কিরিচের হাতে সে কিছু টাকা পাঠিয়েছিল হেমন্তকুমারকে। কিরিচও প্রায়ই বাড়িতে থাকত না। সে যেখানে কাজ করত তারাও খাওয়া পরা দিত, কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে অনেক রাত হত তার। সে-বাড়ির কর্তা নাকি আপিস থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে গিন্নীকে নিয়ে রোজ সেকেণ্ড শো'তে সিনেমা যান। কিরিচ তাদের ছেলে-মেয়েদের পাহারা দেয়। ছোরা আর কাটারিও ঠিকে-ঝি-গিরিতেই বাহাল হয়েছিল, তারাই সত্যবতীর কিছু সেবা করত বটে, কিন্তু আর্থিক সাহায্য তেমন করত না, বিলাসী হয়ে পড়েছিল। লাঠি মিষ্টান্ন ফেরি করা ছেড়ে দিয়ে বাহাল হয়েছিল একটা মোটরের ওআর্কশপে। রাতদুপুরে কালি-ঝুলি মেখে বাড়ি ফিরত ঈষৎ মত্ত অবস্থায়। পয়সা-কড়ি যা রোজগার করত তা মদেই যেত। হেমন্তকুমার পারতপক্ষে তার সম্মুখীন হবার চেষ্টা করতেন না। সোঁটাও কবিরাজি দোকানের চাকরি ছেড়ে ঢুকেছিল একটা সাইকেল তৈরির কারখানায়। সেখানে ভালো মাইনেই পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমশ তার ধারণা হল তার মাইনে আরও ভালো হওয়া উচিত। মালিকরা বেশি মুনাফাখোর বলে মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছে না। চাপ দিলে দিতে বাধ্য হবে। তারই নেতৃত্বে স্ট্রাইক হল একদিন। তারপর ক্রমশ মারামারি, পুলিশ, কাঁদুনে গ্যাস এবং জেল। সোঁটা জেলে আছে। বর্ণনা অনেক চেষ্টা করেও তাকে জামিনে খালাস করতে পারেনি। সত্যবতীর পাগলামি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এর ঝক্কিও বর্ণনাকেই পোয়াতে হচ্ছিল। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, পাগলা গারদে সীটের জন্য ঘোরাঘুরি করা সব সে-ই করছিল। হেমন্তকুমার রোজগারের চেষ্টায় সমস্ত দিন পার্কে পার্কে ফুটপাথে ঘুরে বেড়াত। নবনী রায়ের মতো

শাঁসালো মক্কেল তার আর জোটেনি। সমস্ত দিন ঘুরে হাত দেখে আর মাদুলী বেচে কোনদিন এক টাকা, কোনদিন দেড় টাকা, কোনদিন দু'-টাকার বেশি সে পেত না প্রায়। যা পেত তা বর্ণনার হাতেই এনে দিত। বাচস্পতিকে দিতে গিয়েছিল, সে নিতে চায়নি। বনস্পতিও চায়নি।

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনে ছবির জগতেই বাস করছিল। বর্ণনা বনস্পতিকে বিজ্ঞাপনের যে ছবি আঁকবার ফরমাশ দিয়েছিল, তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল তারা। তিনটে ছবিই আঁকা হয়েছিল, এবং তিনটে ছবিই সরস্বতীর এত ভাল লেগেছিল যে তাইতেই চরিতার্থ হয়ে গিয়েছিল বনস্পতি। সে ছবির দাম পাওয়া যাবে কি যাবে না সেদিকে খেয়াল ছিল না। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনটি সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। কয়েকরকম জুতো, জুতোর কালির কৌটো, শিশি আর বুরুশ এমনভাবে সাজিয়ে ছবিখানি এঁকেছিল বনস্পতি যে হঠাৎ দেখলে মনে হয় একসাজি ফুল বুঝি কেউ রেখে গেছে একজোড়া পায়ের কাছে। দেশলাই বাক্সের ছবিটা আরও পছন্দ হয়েছিল বর্ণনার। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠির শিখার ভিতর আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটি সহাস্য মানুষের মুখ। সে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে আছে, যেন বলছে তুমি চলে যাচ্ছ বটে, কিন্তু আমি অন্ধকারকে আলোকিত করব। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' ছবিটিই সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সরস্বতীর। আকাশে ঘন মেঘ, কদম্ব বনে শিহরণ জেগেছে কদমের ফুলে ফুলে, কদম্বের ডালে দোলনায় দুলছে একটি মেয়ে, সামনে ময়ূর নাচছে। বর্ণনার মনে হচ্ছিল বাবা যদি এই-ভাবে আঁকতে পারেন তাহলে সত্যিই তাদের আর অর্থকষ্ট থাকবে না। মাসে তিন চার শ' টাকা অনায়াসেই রোজগার করতে পারবেন।...হঠাৎ তার মনে পড়ল মামার কাছে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে সে দেখা করবে বলেছিল হস্টেলে। তিনদিন সে হেমন্তকুমারের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে কোথাও যেতে পারেনি, কলেজেও না, হস্টেলেও না, সুখময়বাবুর বাড়িতেও না। কথাটা মনে হওয়ামাত্র সে বেরিয়ে পড়ল। তার মনে হল হস্টেলে যাবার আগে সুখময়বাবুর বাড়িতে গিয়ে ছবিগুলো নেবার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। অন্তত

এ কথাটা তাঁকে জানানো দরকার যে সে অন্যত্র ছবি-বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। হয় সে নিজে এসে ছবিগুলো নিয়ে যাবে, না হয় তার চিঠি নিয়ে কোন লোক আসবে নিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলো যদি পেয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই। চাকরিতে ইস্তফা দেবে কিনা তা সে তখনও ঠিক করতে পারেনি। সে ভেবে রেখেছিল সুখময়বাবু যদি তাঁর কাষ্ঠ-রসিকতাটির জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চান, আর ভবিষ্যতে কখনও এরকম অশোভন ব্যবহার করবেন না প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে সে হট্ করে চাকরিটা ছাড়বে না। এ সিদ্ধান্তে সে উপনীত হয়েছিল অনেক ভেবেচিন্তে, এর জন্যে মনে মনে তার কুণ্ঠারও অন্ত ছিল না, এমন কি আত্মধিক্কারও হচ্ছিল মাঝে মাঝে। কিন্তু কি করবে। নিদারুণ কোলকাতা শহরে টাকা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই। সুখময়বাবু যে হাজার টাকার চেকটা দিয়েছিলেন সেটা ভাঙাতে হয়েছে সোঁটাকে জেল থেকে বাঁচানোর জন্য। সোঁটা বাঁচল না, কিন্তু টাকাটা প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। মামীমার ছোট ছেলেমেয়েগুলোরও ভার নিতে হয়েছে, মামীমার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের ফী লাগছে না বটে, কিন্তু ওষুধ কিনতেই জিব বেরিয়ে পড়ছে। হেমন্তকুমার, লাঠি, সোঁটা মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেয়, কিন্তু তাতে কুলোয় না। ছোরা আর কাটারি যা রোজগার করে তার সবটাই প্রায় খরচ করে নিজেদের স্নো পাউডার সাবান শাড়ি ব্লাউজ কিনে, বলে নোংরা হয়ে থাকাটা তাদের মনিবরা পছন্দ করে না। কাটারি ধার করে শাড়ি কিনেছে সেদিন। বাবার ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেলে কিছু টাকা পাওয়ার আশা আছে। ওই ভদ্রলোক যদি বিক্রি করে দিতে পারেন খুব ভালো হয়। কিন্তু তিনি যদি না পারেন? সুখময়বাবু দু'খানা ছবি কিনতে চেয়েছিলেন সে দু'খানা তাঁকে দিলে ক্ষতি কি। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভূষণ কাকার কথা মনে পড়ল তার। তিনি থাকলে কি ছবি বিক্রি করতে দিতেন?

সুখময়বাবুর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। সেদিন সুখময়বাবুর চোখের দৃষ্টিতে সে যা প্রত্যক্ষ করেছিল তার দ্বিতীয়

কোনও অর্থ তো হয় না। একা ও-বাড়িতে ঢোকাটা কি সমীচীন? কিন্তু ঢুকতেই হবে, উপায় কি।

কড়া নাড়তেই সুখন চাকর এসে কপাট খুলে দিলে।

"বাবু বাড়ি নেই।"

নিশ্চিন্ত হল বর্ণনা।

"মাইজি?"

"মাইজি আছেন।"

"তাঁর সঙ্গে দেখা করব একটু খবর দাও।"

একটু পরেই সুখন এসে নিয়ে গেল তাকে। উপরে উঠে বর্ণনা দেখলে একটি রূপসী মেয়ের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছেন অঞ্জনা দেবী।

"ও, আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।"

বর্ণনা আসাতে দ্বিতীয় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

"আমি তাহলে এখন উঠি। কাল থেকে আসব তো?"

"আমি খবর পাঠাব।"

নমস্কার করে এবং বর্ণনার দিকে অপাঙ্গে একটি দৃষ্টি হেনে বেরিয়ে গেল মেয়েটি।

"একেবারে ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো? কোনও খবরও তো দেননি। উনি শেষে এই মেয়েটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এ-ও বেশ ভাল শেখায়, ওঁর আপিসের স্টেনো—"

বর্ণনা নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল নির্নিমেষে।

মুচকি হেসে অঞ্জনা দেবী বললেন, "কিন্তু আপনাকেই ওঁর বেশি পছন্দ।"

হঠাৎ বর্ণনার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সব খুলে বলবেন দয়া করে?"

"কি বলব বলুন।"

"সত্যিই কি আপনাকে গান-বাজনা শেখাতে হবে, না এটা একটা ফাঁদ।"

মুখে কাপড় ঢেকে হাসতে লাগলেন অঞ্জনা দেবী মাথাটা ঘুরিয়ে।

তাঁর দোলানো বেণীটা দেখে পুরাতন উপমাটা মনে পড়ে গেল বর্ণনার, ঠিক যেন সাপ।

বর্ণনা আবার বললে, "সত্যি কথাটা বলুন আমাকে খুলে।"

মুখে কাপড় ঢেকে অঞ্জনা বললেন, "বুঝতেই পারছেন তো।"

আবার ঘাড় হেঁট করে হাসতে লাগলেন। তাঁর স্থূল মেদবহুল দেহটা হাসির বেগে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

"সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না, আপনি স্ত্রী হয়ে কি করে এসব সহ্য করছেন।"

"আমি ওঁর স্ত্রী নই, রক্ষিতা"—মৃদুকণ্ঠে বলে ঘাড় হেঁট করে রইলেন অঞ্জনা।

বর্ণনা এর পর কি যে বলবে তা ভেবে পেল না।

অঞ্জনা দেবীই আবার কথা কইলেন।

"আমার বয়স হয়েছে তো, আমি এবার রিটাআর করব। চাকরি করলেই রিটাআর করতে হয়। আমার জায়গায় তাই নতুন লোক খোঁজা হচ্ছে।"

বজ্রাহতবৎ বসে রইল বর্ণনা। অঞ্জনা দেবীও তার দিকে পিছু ফিরে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন।

"রিটাআর করে কোথা যাবেন আপনি ?"

মিনিটখানেক পরে জিজ্ঞাসা করল বর্ণনা। সহসা কৌতূহলী হয়ে উঠল সে।

"বাবা বিশ্বনাথের চরণে। আমাদের মতো অভাগিনীর তিনিই তো একমাত্র আশ্রয়।"

"সেখানে থাকবেন কোথা ?"

"সেখানে আমাকে বাড়ি করে দিয়েছেন। যথেষ্ট টাকাও দিয়েছেন, সেদিক দিয়ে কোনও অসুবিধা হবে না।"

অঞ্জনা দেবী ঘাড় ফিরিয়েই কথা বলছিলেন, ক্রমশ তাঁর ঘাড়টা যেন আরও নীচু হয়ে গেল। বর্ণনার মনে হল কাঁদছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল বান্ধবী আকাশ-পরীকে। যেমন সুন্দরী, তেমনি ডানপিটে, গানে বাজনায় অভিনয়ে কবিতা লেখায় চৌকোশ

একেবারে। তার মতো মেয়ের পাল্লায় পড়লে জব্দ হয়ে যেত শয়তানটা। নিতান্ত ভালো মানুষ অঞ্জনার জন্য কষ্ট হতে লাগল তার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বর্ণনা বলল, "আমি চললুম। আর আসব না। ওঁর কাছে যে পাঁচখানা ছবি দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথা ?"

"ওপরের ঘরে আছে।"

"ওগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই।"

"আর একদিন এসে নিয়ে যাবেন। উনি তো এখন নেই—"

"না, আমি আর আসব না। এখুনি নিয়ে যাচ্ছি, ওঁকে বলে দেবেন।" তরতর করে উপরের ঘরে উঠে গেল সে। গিয়ে দেখলে দেওয়ালে একখানি ছবিও নেই। বড় বড় আলমারি রয়েছে কয়েকটা। একটা আলমারির কপাট টানতেই খুলে গেল। ভিতরে দেখল ছবি রয়েছে অনেকগুলো, কিন্তু সেগুলো দেখেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল তার, তার বাবার ছবি নয়, কতকগুলো অশ্লীল বীভৎস ছবি। দড়াম করে আলমারির কপাটটা বন্ধ করে আবার নেমে এলো সে।

"আমি লোক পাঠিয়ে দেব, তার হাতে দিয়ে দেবেন ছবিগুলো।"

দ্রুতপদে নেবে গেল সে।

হস্টেলে পৌঁছেই তার দেখা হয়ে গেল আকাশ-পরীর সঙ্গে। আকাশ-পরীর নামটিও যেমন অপরূপ, চেহারাটিও তেমনি। চোখের কালো তারায় আছে একটু নীলের আমেজ, কালো চুলে সোনার, গায়ের বাদামী রঙেও দুধে-আলতার। ওর ভারতীয় রূপের অন্তরালে লুকিয়ে আছে ইয়োরোপীয় শ্রী। চোখ দুটি খুশির আলোয় ঝলমল। মাথার চুল বব্ করা, নাইলনের নীল শাড়ি লুটিয়ে পড়েছে স্যাণ্ডালের লাল-মখমলের উপর। স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে কিউটেক্স-রঞ্জিত পায়ের নখগুলি। হাতের নখেও কিউটেক্স। বর্ণনা উপর্যুপরি তিনদিন না আসাতে উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল সে। বর্ণনাকে দেখতে পেয়েই টেনে নিয়ে গেল সে আড়ালে, নিজের ঘরে। গিয়েই ঘরে খিল বন্ধ করে বর্ণনার থুত্নিতে হাত দিয়ে গান ধরে দিলে মুচকি হেসে—

কহ কহ লো বারতা কি
তিনটি দিবস ব'য়ে যে গেল
দেখাবে না উদারতা কি
বঁধুয়ার জুতো ক্ষয়ে যে গেল।

মুখে মুখে কবিতা তৈরি করবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল আকাশ-পরীর।

"ছাড়।"

"তুই মাদ্রাজীর প্রেমে পড়লি শেষকালে।"

"মাদ্রাজী? মানে।"

"মানে তুমিই জানো। কুচকুচে কালো লম্বা সাহেবি-স্যুট-পরা একটি মাদ্রাজী রোজ বিকেলে এসে ধন্না দিচ্ছে তোমার জন্যে। তিনদিন এসেছে, আজও আসবে হয়তো।"

"মাদ্রাজী?"

"হ্যাঁ গো, মিস্টার শ্রীনাথন।"

"ও বুঝেছি। ফোটোগ্রাফার। আমি আশা করেছিলাম বাঙালী ভদ্রলোকটিই আসবেন বোধহয়।"

"হয়তো মাদ্রাজীর ছদ্মবেশে তিনিই আসছেন, কিচ্ছু বলা যায় না"—বলেই আবার গান ধরলে সে—

প্রেমের কতই লীলা কত কারসাজি গো
বাঙালী বঁধুয়া এল সাজি' মাদরাজি গো।

"চুপ কর। আমি এদিকে মহা মুশকিলে পড়েছি। তুই যদি আমাকে উদ্ধার করতে পারিস।"

"করিব করিব সখি নিশ্চয় করিব
শাহারায় তোর লাগি মদ্‌গুর ধরিব।"

"সব শোন আগে। বস ভাল করে।"

সুখময়ের সমস্ত কাহিনীটি আদ্যোপান্ত বললে তাকে।

"এখন ওর কাছ থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করি কি করে বল্‌ তো?"

"অনায়াসে পারি। কিন্তু আমি যা করতে চাচ্ছি তা করবার আগে

হবু প্রাণনাথটির সঙ্গে ষড় করতে হবে। সে যদি রাজী হয় তাহলে অনায়াসে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।"

"তিনি তো মীরাটে—"

"এখানে এসেছে পরশু। তোর সঙ্গে আলাপ করবে বলে এসেছিল কাল। কিন্তু তুই এলি না, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেল।"

"কোথা আছেন?"

"গ্র্যাণ্ডে।"

"ফোন কর। যদি থাকে, এখ্‌খুনি গিয়ে আলাপ করে আসি। তিনিতে একাই এক শ'।"

"শুধু এক শ'? এক শ' ইন্‌টু এক শ' ইন্‌টু এক শ' ইন্‌টু এক শ' যতক্ষণ দম থাকে ততক্ষণ ইন্‌টু এক শ' প্লাস এক্‌স্। এক্‌সের যত ইচ্ছে ভ্যালু বসাতে পার।"

দুয়ারে টোকা পড়ল।

কপাট খুলে দেখা গেল হস্টেলের বালক ভৃত্যটি একটি কার্ড এনেছে।

"সেই ভদ্রলোক আজও এসেছেন। বর্ণনা দিদির সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

আকাশ-পরী মুচকি হেসে বললে, "সেই তিনি, যাও দেখা করে এস। আমি ততক্ষণ ফোন করি।"

বর্ণনা কমনরুমে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলেন শ্রীনাথন।

"মিস্ বর্ণনা মিশ্র?"

"হ্যাঁ।"

"মিস্টার রায় আপনাকে এই চিঠিটি দিয়েছেন।"

একটি বড় চৌকো সাদা খামের ভিতর থেকে ছোট্ট চিঠি বেরুল একটি।

সুচরিতাসু,

নিজে যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত। বন্ধু শ্রীনাথন নিজেই যাচ্ছে। ছবির বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইবেন। সে সব ব্যবস্থা করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আপনি ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন।

দরকার হলে ওর দোকানেই আমাকে খবর দেবেন, তখন দেখা করব। আশা করি ওই সব করে দিতে পারবে। নমস্কার। ইতি—

ভবদীয়
নবনী রায়

শ্রীনাথনের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথাবার্তা হচ্ছিল।

শ্রীনাথন বললেন, "আমি তিন দিন ঘুরে গেছি। মিস্টার রায় বলে দিয়েছিলেন যতদিন না আপনার সঙ্গে দেখা হয় ততদিন যেন রোজ আসি। আমি তাঁর আদেশ পালন করেছি। আপনার বাবার আঁকা ছবি আমি আমার শো-কেসে ভালভাবে ডিস্‌প্লে করব। ছবিগুলির দাম কি রকম হবে তা কি ছবির সঙ্গে লেখা থাকবে ?"

"একটা ছবি হাজার টাকায় বিক্রি করেছিলাম। সব ছবি হয়তো অত টাকায় বিক্রি হবে না। দাম আপনি যেমন ভাল বুঝবেন তেমনি রাখবেন।"

"ছবিগুলো কি এখানে আছে ?"

"না। সে আমি আপনার দোকানে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনাকে এত কষ্ট দিলাম, সে জন্য দুঃখিত।"

"না না না, ও কিছু নয়। আমার কোন কষ্ট হয়নি। আপনার সেবায় লাগতে পেরেছি বলে আমি সো গ্ল্যাড।"

ইত্যাকার বিনয় বাচন করে শ্রীনাথন চলে গেলেন।

বর্ণনা আকাশ-পরীর ঘরে চলে গেল। একটু পরেই আকাশ-পরী ফিরে এসে গান ধরে দিলে।

"ফ্যান-সমীরে ত্রিতল-কুটীরে গ্র্যাণ্ডে বসতি বনমালী
স্যুট্-বুট্-মণ্ডিত সে প্রণয়-পণ্ডিত সমর্থ ভুজ যুগ শালী।
ঝন-ঝন-ফোন-যোগে ভেজিল নিমন্ত্রণ—আও লো সখীরে লয়ে আও
চৈনিক তৈজসে অধর পরশ করি চাহা-পানি পান করি যা-ও।"

তারপর সুর বদলে—

"শোন গো মিনতি শোন
আমার নিধিটি আঁচলে বাঁধিয়া
চলিয়া এস না যেন।

সখি, আমারও দিকটা দেখিও খানিক,
ওই যে আমার সব সম্বল
সাতসাগরের একটি মাণিক।"

বর্ণনা তাকে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে বললে—"কি পাগলামি করছিস। চল্ বেরিয়ে পড়ি।"

...একটু পরে দুজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেলের উদ্দেশে।

গ্র্যাণ্ড হোটেলে মেজর মুখার্জি উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা জানালেন বর্ণনাকে। "আকাশের কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে দেখবার জন্মে আপনাদের হস্টেলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য খারাপ, দেখা হয়নি। আপনি যে দয়া করে এসেছেন এতে কি যে আনন্দ পেলাম তা আর কি বলব। আকাশ সাধারণত সব কথাই বাড়িয়ে বলে, কিন্তু আপনার বেলায় দেখছি কমিয়েই বলেছে।"

আকাশ-পরী বর্ণনার দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে বললে—"শুনলি তো। তোকে বলিনি? দেখা হলেই খোশামোদ আরম্ভ করবে। কী যে হ্যাংলা লোকটা—"

মেজর মুখার্জী দরাজ গলায় হেসে বললেন, "খোশামোদ করাই তো আমাদের পেশা। এক বুল-ডগ্‌মুখো সাহেবের খোশামোদ করছি, এমন সুন্দর মুখের করব না? আর সম্বন্ধটা কত মধুর, ভাবী পত্নীর প্রিয়তমা বান্ধবী—"

"কিন্তু উনি আর মধুর রসের চর্চা করতে ভরসা পাবেন কিনা সন্দেহ। একটি ষাঁড় ক্ষেপেছে, তুমি মাথা ঠিক রাখ। পারো তো ষাঁড়টাকে শিক্ষা দিয়ে দাও। সঙীন ব্যাপার। তুই গুছিয়ে বলতে পারবি, না আমিই বলব।"

"তুই বল্—"

চা এসে হাজির হল। চা খেতে খেতে সুখময়ের কাহিনী শুনতে লাগলেন তিনি আকাশ-পরীর কাছ থেকে। সব শুনে বর্ণনাকে বললেন, "ছবি আপনি কালই পেয়ে যাবেন। আপনি শুধু সুখময়বাবুর নামে

একটা চিঠি লিখে দিন আমাকে যে আমার পাঁচটি ছবি এই পত্রবাহককে দিয়ে দেবেন। আর কিছু করতে হবে না, আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নেব। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে নবনী রায় নামটা শুনে। যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন অক্সফোর্ডের এক নবনী রায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, অদ্ভুত খেয়ালী ছেলে, আমাদের সকলের কানের মাপ নিয়ে কি একটা চার্ট না গ্রাফ করেছিল। এ কি সে-ই লোক ?"

"আমি ঠিক জানি না। মাত্র একদিনের আলাপ, তা-ও হঠাৎ—"

মেজর মুখার্জী হেসে বললেন, "একদিনের আলাপেই ভদ্রলোক আপনার সম্বন্ধে এতটা ইন্‌টারেস্ট নিচ্ছেন! অবশ্য সেই নবনী যদি হয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এই ধরনেরই খেয়ালী লোক সে-ও।"

আকাশ-পরী কবিতায় বললে—

"রূপের আগুনে পুড়িল লঙ্কা, জীবন্ত হল মৃত
ধ্বংস হইল ট্রয়
রূপেরই আগুনে নবনী গলিয়া হয়েছে গব্য ঘৃত
এতে কিবা বিস্ময়।"

"ব্রেভো"—ছাদ কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন মেজর মুখার্জী।

"আপনি আমাকে চিঠিটা তাহলে লিখে দিন। আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি—"

দশ

হেমন্তকুমার ক্রমশ দমে যাচ্ছিল, বিশেষ কিছু রোজগার করতে পারছিল না সে। এক পার্ক থেকে আর এক পার্কে গিয়ে, ফুটপাথের পর ফুটপাথ বদলে কোনই ফল হচ্ছিল না। রোদে ঠায় বসে থাকাও কষ্টকর হয়ে উঠছিল ক্রমশ। বাধ্য হয়ে বড় দেখে ছাতা কিনেছিল একটা, আর সেটা যাতে পিছন দিকে আপনা-আপনি খাড়া থাকে, তার ব্যবস্থাও করেছিল। গেরুয়া-কাপড় দিয়ে মুড়েও ছিল সেটাকে, বেশ

একটা দৃশ্য হয়েছিল, কিন্তু ফল হচ্ছিল না। তার সবচেয়ে বিপদ হয়েছিল সময় নিয়ে। চুপচাপ বসে বসে সময় যেন কাটতেই চায় না। সামনে দিয়ে অবিরাম জনস্রোত বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে কেউ তার সামনে থামলে উৎসুক দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখে তার দিকে, কিন্তু সে আবার চলে যায়। দু'একজন কটু মন্তব্যও করে, ব্যঙ্গও করে কেউ কেউ। "গায়ের চামড়া আর গোঁফ দাড়িও গেরুয়া করে ফেল চাঁদ"—কে একজন বলেছিল। এসব সত্ত্বেও মুখ বুঁজে বসে থাকতে হয়। সামনের ফুটপাথে পুরাতন-পুস্তকের একটি দোকান ছিল। সেই দোকানী একদিন এসে হাত দেখিয়ে মাদুলী নিয়ে আট আনা পয়সা দিতে গিয়েছিল, হেমন্ত নেয়নি। বলেছিল, তুমি বরং মাঝে মাঝে আমাকে বই পড়তে দিও। বই পড়ে সময় কাটত কিছুটা। নানারকম ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস আর প্রেমের গল্প। মন্দ লাগত না নেহাত। হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের বই হাতে এসে গেল তার। বইওলাই দিলে তাকে।

"ঠাকুরমশাই, এই বইটা পড়ুন, হয়তো আপনার কাজে লাগবে। ওটা আপনি রাখতেও পারেন। সের দরে কিনেছিলাম।"

হেমন্ত উল্টে দেখলে বইয়ের নাম 'তন্ত্রসার'। সামনে পিছনে পাতা নেই। দশমহাবিদ্যার ছবি রয়েছে। পড়তে শুরু করে দিলে। ক্রমশ তন্ত্রসার উর্বর করে তুলল তার মস্তিষ্ককে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, তার ছাতার উপরে, ঠিক মাঝখানে একটি চৌকোনা পিস্‌বোর্ড আটকানো রয়েছে আর তাতে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে—বশীকরণ, উচাটন। এর পর থেকে তার সামনে দিয়ে যে জনস্রোত রোজ বইত তার গতি যেন একটু মন্থর হল, মাঝে মাঝে দু'একজন দাঁড়াতেও লাগল। অবশেষে এক বাবরিওলা ছোকরা একদিন বসে পড়ল তার সামনে।

"আচ্ছা ঠাকুরমশাই, বশীকরণ, উচাটন এসব কি সত্যি হয়?"

তার বিকশিত হলদে দাঁতগুলোর দিকে চেয়ে খুব চটে গেল হেমন্তকুমার মনে মনে। উপর্যুপরি কয়েকদিন কোন রোজগার না হওয়াতে তিরিক্ষে হয়ে পড়েছিল সে।

"হয় বইকি। তবে গোড়াতেই একটা কথা শুনে রাখ বাপু। এসব

বিষয়ে পরামর্শ নিতে গেলে গোড়াতেই দুটি টাকা প্রণামী দিতে হয়। অনর্থক বকবক করতে পারব না।”

ছোকরা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর বলল, “বেশ, নিন।” দুটি টাকা বার করে দিলে, প্রণামও করলে। হেমন্তকুমার এবার পুলকিত হল। ভক্তিমান মক্কেল!

“এইবার বল কি দরকার তোমার? কিচ্ছু গোপন কোর না, খোলসা করে খুলে বল সব। যদি খরচ করতে পার তোমার মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূর্ণ হবে। তুমি কি জাত?”

“মুচি। জুতোর দোকান আছে আমার। এসব করতে কত খরচ পড়বে?”

“আগে শুনি কি করতে হবে।”

একটু ইতস্তত করে বার দুই গলা-খাঁকারি দিয়ে অবশেষে ছোকরা অকপটে মনের বোঝা নামিয়ে ফেললে হেমন্তকুমারের কাছে। পাড়ার একটি মেয়েকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু মেয়েটি তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। না তাকাবার কারণ আর একটি বড়লোকের ছেলে মেয়েটিকে টাকার লোভ (সে বললে, ললকানি) দেখাচ্ছে, টাকার লোভে অন্ধ হয়ে মেয়েটি তার পবিত্র প্রেমের মহিমা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে স্থির করেছে দৈব করবে কিছু। এক্ষেত্রে কি করা উচিত?

হেমন্ত বলল, “তিন রকমই করতে হবে—”

“তিন রকম? মানে?”

“বিদ্বেষকরণ, উচাটন, বশীকরণ।”

“বুঝতে পারছি না ঠিক।”

“বিদ্বেষকরণ করলে ওই বড় লোকের ছোকরা আর ওই মেয়েটির মধ্যে ঝগড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত মনান্তর হয়ে যাবে। তারপর করতে হবে উচাটন। এর ফলে মেয়েটির তোমার সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা হবে, আগ্রহ হবে। তারপর তাকে আকর্ষণ করে বশীকরণ করতে হবে। খরচ পড়বে পঁচাত্তর টাকা।”

“পঁচাত্তর টাকা!”

"তাতো লাগবেই। খুব কম করে বলেছি আমি। জিনিসপত্তর সংগ্রহ করতে হবে কত। সব যোগাড় করতে মাস তিনেক সময়ই লেগে যাবে আমার, ঘুরতে ঘুরতে পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে—"

"খুব দামী দামী জিনিস লাগে বুঝি?"

"দামী খুব নয়, বিদঘুটে। ষাঁড়ে-ষাঁড়ে যেখানে লড়াই করছে সেখানকার মাটি, শ্মশানের আগুন, পলাশ ফুল, পাটল ফুল, গোরোচনা, কাকের পালক, কাকের বাসা, কাকের বিষ্ঠা, মহিষের গোবর, ঘোড়ার লাদি, তা ছাড়া ধূপ ধুনো কুঙ্কুম চন্দন এসব তো আছেই। চট করে এসব সংগ্রহ করাও মুশকিল। ঘুরতে হবে, তক্কে তক্কে থাকতে হবে। মাস তিনেক মেহনত করলে তবে জোটাতে পারব। মজুরি না পোষালে অত হাঙ্গামা করবে কে—"

"চট করে অত টাকা যোগাড় করা শক্ত আমার পক্ষে। বাবা দোকানে বসেন কি না।"

খেঁকিয়ে উঠল হেমন্তকুমার।

"শিরদাঁড়ার জোর নেই ডন ফেলবার শখ কেন তাহলে?"

ছোকরা তবু বসে রইল খানিকক্ষণ।

"ওই তিন রকম করলে সোনামণি আমার বশে আসবে?"

"নির্ঘাত।"

"দুবারে টাকাটা দিলে হবে না?"

"হবে না কেন, দেরি হবে। পুরো টাকাটা হাতে না পেলে কাজ আরম্ভ করা যায় না তো।"

"কাল অর্ধেক টাকা দিয়ে যাব—"

"কাল? কালই এস। কাল সোমবার, মেয়েটির নামও সোনামণি দুটোই দন্ত্য 'স'। কালই এস। তোমার নামটি কি?"

"আজ্ঞে, শশাঙ্ক দাস।"

"শশাঙ্ক কি বানান লেখ?"

"তালব্য 'শ' তালব্য শয়ে আকার আর ঙ-য়ে ক-য়ে।"

"এবার থেকে দন্ত্য 'স' লিখবে। দাস দন্ত্য 'স' আছেই, শশাঙ্কতে ডবল দন্ত্য 'স' হলে তিনগুণ জোর হবে।"

"যে আজ্ঞে।"

"কাল সোমবার হয়ে আর একটা সুবিধেও হয়েছে। সোমবার হচ্ছে চাঁদের বার। আর চাঁদ হচ্ছেন মনের কারক। আর এসব তান্ত্রিক ক্রিয়া মনের উপরই তো কাজ করবে।"

"যে আজ্ঞে, কাল আমি নিশ্চয় আসব।"

পুনরায় প্রণাম করে ছোকরা চলে গেল।

হেমন্তকুমার নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। বর্ণনা চাকরিটা ছাড়ার পর খুবই অর্থকষ্ট চলছে। ধার জমে গেছে চারদিকে।

বাড়ি ফিরে আরও খুশি হল সে। অনেকদিন পরে বন্দুক এসেছে মাকে দেখতে। ফল-টল এনেছে, কাপড়-চোপড়ও এনেছে। যাবার সময় পঁচিশটা টাকাও দিয়ে গেল। হঠাৎ তার দুই ছেলের কথা মনে পড়ল। লাঠি অনেক দিন আসেনি, সোঁটা জেলে। তারপর মনে হল বল্লমটা আজ এখনও ফিরছে না কেন। এ সময় তো রোজই ফিরে আসে। রোজই রোজগার করে আনে কিছু। বয়স যদিও কম, কিন্তু খুব করিত-কর্মা হয়েছে ছেলেটা।···একটু পরেই ছোরা গলির মোড় থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বাবা গো, শিগগির চলো, মেজদাকে মেরে ফেললে—"

"কে?"

"রাস্তার লোকে। শিগ্‌গির এস। খুব মারছে—"

হেমন্তকুমারও ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন বড় রাস্তার উপর ভিড় জমে গেছে। বাঁ চোখটা ফুলে উঠেছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে। তবু মারছে!

"কি হল, কি হল, মারছ কেন ওকে?"

"মারব না? শালা পকেটমার। এই দেখুন কাঁচি দিয়ে আমার পকেট কাটছিল, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি শালাকে। খুন করে ফেলব—"

আবার মার চলতে লাগল, কিল চড় লাথি ঘুঁষি জুতো-ছাতা।

হেমন্তকুমার লাফিয়ে পড়ল ভিড়ের মধ্যে, ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করল বল্লমকে ওদের হাত থেকে, কিন্তু পারল না। শেষে নাটকীয় ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠল সে—"আমাকেই মার তোমরা, আমাকেই মার, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে আর মেরো না, দোহাই তোমাদের, আমাকে মার, আমি ওর বাবা, আমিই ওর জন্যে দায়ী, ওকে ছেড়ে আমাকে মার—"

ছোরা দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার ভয় হল বাবাও পাগল হয়ে গেল না কি।

এগারো

মেজর মুখার্জির চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু সুখময়বাবুর কবল থেকে ছবিগুলি উদ্ধার করা গেল না। তিনি তাঁর আরদালিকে কয়েকবারই পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে যখনই গেছে সুখময়বাবুর দেখা পায়নি। উপর থেকে খবর এসেছে তিনি বাড়ি নেই, কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই। এই করতে করতে মেজর সাহেবের ছুটি ক্রমশ ফুরিয়ে এল। হঠাৎ একটা জরুরি টেলিগ্রামও এসে গেল, অবিলম্বে চলে এস।

যেদিন মেজর মুখার্জি চলে যাবেন সেদিন তাঁকে স্টেশনে তুলে দেবে বলে আকাশ-পরী গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিল।

সে বললে, "বর্ণনার বাবার ছবিগুলোর তো কিছুই হল না—"

"আমি ওখান থেকে সাণ্ডেলকে চিঠি লিখে দেব। সে এইখানেই পুলিশে বড় চাকরি করে। সে ব্যবস্থা করে দেবে ঠিক।"

আকাশ-পরী মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল।

"হাসছ যে?"

"একটা কবিতা মনে হচ্ছে। বলব?"

"বল।"

"বাঘের ভয়েতে কাঁপে বাইসন হাতি,
নেংটি ইঁদুর গ্রাহ্য করে না তাকে

চুপটি করিয়া গর্তে লুকায়ে থাকে ;
বল যদি ফাঁদ পাতি।"

"কি রকম ফাঁদ ?"

ঠিক কি রকম তা ভাবিনি এখনও। তবে সরল ভাষায় তার কাছে গিয়ে তার মুণ্ডুটি ঘুরিয়ে দিয়ে ছবিগুলি নিয়ে চলে আসব। তুমি বরং তোমার বন্ধু সাণ্ডেলকে বলতে পার আমাকে যেন একটু সাহায্য করেন।"

"অতটা বাড়াবাড়ি করবে ?"

"পশুদের সঙ্গে একটু বাড়াবাড়ি করতে হয়। ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে বেশ লাগে। তবে তোমার যদি আপত্তি থাকে তাহলে—"

চুপ করে গেল আকাশ-পরী। তারপর অপাঙ্গে চেয়ে মুচকি হেসে বললে, "তোমার কি ভয় হচ্ছে আমি লোকটার প্রেমে পড়ে যাব, না, সে আমাকে গপ্‌ করে গিলে ফেলবে।"

"এসব ব্যাপারে একটু 'রিস্ক্‌' আছে বইকি।"

"থাকলেই বা। নো রিস্ক্‌ নো গেন্‌। এই যে তুমি রোজ প্লেনে প্লেনে ঘুরে বেড়াচ্ছ সেটা কি রিস্কি নয় ? আমি তো তোমাকে রিস্ক্‌ নিতে দিয়েছি। বেশ, তোমার যখন আপত্তি তখন থাক। যতই তোমরা লেখাপড়া শেখ তোমাদের প্রাগৈতিহাসিক চেহারা এখনও বদলায়নি।"

মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন মেজর মুখার্জি।

তারপর হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, অনুমতি দিলুম। কিন্তু দেখো কেলেঙ্কারিটা যেন খুব বেশি দূর না গড়ায়।"

আকাশ-পরী লাফিয়ে উঠল চেআর থেকে। তারপর দু'হাত তুলে ঘুরে ঘুরে নাচ শুরু করে দিলে গান গাইতে গাইতে।

মনের পিয়ানো বাজে
টিরি টিং, টুং টাং, টিং টিং
ডার্লিং, ডার্লিং, ডার্লিং
ও ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং।

অদ্ভুত মেয়ে আকাশ-পরী।

বারো

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল বর্ণনা। প্রায় কপর্দকহীন হয়ে পড়েছিল সে। চারদিকে ধার অথচ হাতে একটি পয়সা নেই। হেমন্ত বশীকরণের জন্য শশাঙ্ক দাসের কাছ থেকে যে টাকাটা পেয়েছিল সেটা খরচ হয়ে যাচ্ছিল আদালতে, বল্লমকে জেলের কবল থেকে বাঁচাবার জন্যে। পুলিশে বেশ ঘোরালো করে কেস সাজিয়েছিল তার বিরুদ্ধে। সেঁটা জেল থেকে খবর পাঠিয়েছিল, 'ওকে জেল থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছ কেন। জেলই ভালো। আমি রাজসুখে আছি। তোমরা সব্বাই জেলে চলে এস।' হেমন্তকুমার তবু বাঁচাবার চেষ্টা করছিল ওকে। বর্ণনাকে কিচ্ছু দিতে পারেনি সে ইদানীং।

সুখময়বাবুর কাছ থেকে ছবিগুলো আনতেও যায়নি বর্ণনা, সে নির্ভর করছিল আকাশ-পরীর উপর। ইতিমধ্যে সে আর এক কাজ করেছিল। বনস্পতির আঁকা বিজ্ঞাপনের ছবি তিনখানা দিয়ে এসেছিল সুবন্ধু সেনের আপিসে। তাঁরা খবর পাঠাবেন বলেছিলেন, কিন্তু কোনও খবর আসেনি। সে একবার গিয়েছিল তবু খবর পায়নি। সুদেষ্ণা বাচস্পতিকে যে টাকাটা দিচ্ছিল সেটাও পাওয়া যায়নি এমাসে। সুদেষ্ণা আজকাল আসছে না। গুজব রটেছে তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, পাণিনির গবেষণা পাণিপীড়নে পর্যবসিত হবে নাকি শেষ পর্যন্ত। আর্থিক অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে নগদ তরকারিও কেনা যাচ্ছে না। ছোরা কাটারি কিছু রোজগার করে কিন্তু তাদের কাছে হাত পাততে প্রবৃত্তি হয় না বর্ণনার। তাছাড়া তারা তাদের মায়ের জন্য খরচও তো করছে। ফল-মূল, ওষুধ-বিষুধ নানারকম লেগেই আছে রোজ। বন্দুক কিরিচ আসেই না। সত্যবতীর অবস্থা একটু ভালো হয়েছিল, কিন্তু আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। ডাক্তার চক্রবর্তী বলেছেন এমনি করে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যাবে। জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা ছোট ছেলেমেয়েগুলোর ভার নিয়েছেন, নিজেদের দুধ ওদেরই খাওয়াচ্ছেন। বর্ণনাকে বাধ্য হয়ে দুধের বরাদ্দ বাড়াতে হয়েছে। কিন্তু মাসের শেষে সে টাকা দেবে কোথা থেকে? জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা দুজনেই অদ্ভুত রকম শান্ত আছেন। সব কাজকর্ম সেরে অনেক রাত্রে শোন। আবার ওঠেন খুব

ভোরে। উঠেই 'সুখপুর-পত্রিকা' লিখতে শুরু করেন। ওই যেন ওঁদের পূজো করা। জ্যাঠাইমা তাঁর সর্বদা-পরার ভারী হারটা তাঁকে দিয়েছেন বিক্রি করে টাকা যোগাড় করবার জন্যে। খুব নির্বিকার ভাবে বললেন, "ভাবছিস কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এইটে বেচে কিছু টাকা যোগাড় করে ফেল আপাতত।" বর্ণনা এখনও হারটা বিক্রি করেনি। ভাবছে বাবার বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো যদি চলে তাহলে বিক্রি করবার দরকার হবে না হয়তো। বনস্পতি একেবারে নীরব হয়ে গেছে। বর্ণনা বুঝতে পারে বাবা মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ছবি আঁকবার জন্যে রোজই ক্যানভাসটার কাছে গিয়ে বসে, কিন্তু, কিন্তু ছবি এগোয় না, বসে থাকে কেবল।

একদিন জিগ্যেস করেছিল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানার কি হল? কেউ বোধহয় শেষ পর্যন্ত কিনলে না, নয়? বিক্রির জন্যে তো ওসব আঁকিনি। কেউ না কেনে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। একটা ছবি তো হাজার টাকা নিয়ে দিয়েছিলি তোর বন্ধুকে। চেকটা ভাঙিয়েছিস?"

"ভাঙিয়েছি তো। সোঁটার মকদ্দমায় খরচ হল, দুধের টাকা, বাড়িভাড়ার টাকা, সব ওই থেকেই তো দিলাম। সে টাকা ফুরিয়ে গেছে।"

"ও, তাই বুঝি। তা বেশ হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ছবিগুলো কি হল?"

"এখনও খবর পাইনি। খবর পাব শিগ্‌গির।"

"আচ্ছা, সে হবে এখন, ব্যস্ত কি।"

বর্ণনা কিন্তু বুঝতে পারছিল, বাবা ব্যস্তই হয়েছেন। কিন্তু কি করবে, উপায় তো নেই কিছু।

সেদিন হস্টেলে যেতেই আকাশ-পরী বললে, "সব মাটি হয়ে গেল।"

"কি মাটি হল?"

"আমার প্ল্যানটা। আমি দরখাস্ত করেছিলাম যে সঙ্গীতানুরাগিণী অঞ্জনা দেবীকে আমি সব রকম গান-বাজনা শিখিয়ে দেব। সুখময়বাবু আমাকে পরশু দিন ডেকেওছেন, কি শাড়ি পরে কি এসেন্স মেখে তাঁর কাছে যাব তাও ঠিক করে রেখেছি, এমন সময় পুলিশ অফিসার সাণ্ডেল এসে আমার মনের বেলুনটিতে আলপিন ফুটিয়ে চলে গেলেন।"

"তার মানে।"

"তিনি নিজে গিয়ে ছবিগুলি নিয়ে এসেছেন। আমার আর কিছু করবার রইল না। কি কাণ্ড বল দিকি, আমি কত কি ভেবে রেখে-ছিলাম।"

"ভালোই হয়েছে।"

"ভালোই হয়েছে! এমন একটা স্পোর্ট মাটি হয়ে গেল। আচ্ছা, পুরুষগুলো আমাদের কি মনে করে বল দেখি, আমরা এতই ঠুনকো যে ক্রমাগত সামলে সামলে বেড়াতে হবে।"

হাসিমুখে ক্ষণকাল চেয়ে রইল বর্ণনার মুখের দিকে। তারপর গান ধরে দিলে—

চতুর পুরুষগুলো—
করিয়া নানান্ ছলনা ফন্দী
আঙুরের মতো করেছে বন্দী
উপরে নীচেতে তুলো।

"ছবিগুলো কোথা?"

"ওপরে আছে।"

"আমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে পারিস? ছবিগুলো তাহলে পৌঁছে দিয়ে আসি ফোটোগ্রাফারের দোকানে।"

"বেশ, চল, দুজনেই যাই, একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠা।"

ছবি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে বর্ণনা দেখল বনস্পতি বাড়িতে নেই। সরস্বতী চিন্তিত হয়ে ঘর-বার করছে।

"উনি বাইরে বেরিয়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি।"

"কোথা গেছেন ?"

"কিছু তো বলে যাননি। খাওয়া-দাওয়ার পর কখন বেরিয়ে গেছেন টেরও পাইনি। আমি দিদির ঘরে ছিলাম।"

"কেউ সঙ্গে গেছে ?"

"কে আর যাবে।"

চিন্তিত হয়ে পড়ল বর্ণনা।

"মহা মুশকিল তো। বাবা তো কখনও বেরোয়নি এর আগে, পথঘাট জানা নেই। জ্যাঠামশাই শুনেছেন ?"

"না। সড়কি আর খন্তা দুজনেরই খুব কেঁপে জ্বর এসেছে। ওদের নিয়েই ব্যস্ত আছেন। এ খবর শুনলে আরও ব্যস্ত হবেন, তাই আর বলিনি। তুই একবার দেখ নাহয়।"

বর্ণনা বেরিয়ে গেল।

তেরো

বনস্পতি কোলকাতার রাস্তায় কখনও একা বেরোয়নি। একা একা বেরোবার একটা গোপন লোভ অনেকদিন থেকেই তার মনে ছিল। যে বন্য স্বভাব তাকে সুখপুরের বনে জঙ্গলে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত সেই স্বভাব তাকে এখানেও প্রলুব্ধ করেছিল অনেকদিন থেকে। এসে থেকে একটা মনের ছবি আঁকতে পারেনি, গলির ভিতর ওই ঘুপচি ঘরে কোনও প্রেরণাই সে পাচ্ছিল না। তার মনে হচ্ছিল রাস্তায় বেরুলে সত্যিকার কোলকাতার রূপ ধরা দেবে তার চোখে। ওই খোলার ঘরের অন্ধকূপে দেবে না। তাছাড়া হেমন্তকুমারের ছেলে-মেয়েদের নিত্য নতুন ঝামেলা, উন্মাদিনী সত্যবতীর আর্তনাদ, আর্থিক অনটন, বর্ণনার শুকনো মুখ, সরস্বতীর সপ্রতিভ থাকবার ব্যর্থ চেষ্টা, দাদা-বৌদির কৃচ্ছ্রসাধন—এ সবই যেন নিষ্প্রভ করে দিচ্ছিল তার মনের

আলোকে। তার আশঙ্কা হচ্ছিল আমি কি নিভে যাচ্ছি? কিন্তু তার অন্তরতম শিল্পী একথা মানতে চাইছিল না, তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই টালটা সামলে গেলেই গুমোটটা কেটে যাবে, অন্ধকার থাকবে না, হাওয়া বইবে, চাঁদ উঠবে, ফুল ফুটবে, ছবি আসবে। তার এ-ও মনে হচ্ছিল কোলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় সে যদি একা ঘুরে বেড়াতে পারে তাহলেও ছবি আসবে মনে। কোলকাতার রূপ সে দেখতে পাচ্ছে না। এই খাঁচা থেকে না বেরুতে পারলে পাবে না। একা একা বাইরে বেরিয়ে পড়বার আকাঙ্ক্ষাটা অনেক দিন থেকেই জাগছিল তার মনে। সেদিন একটা উপলক্ষ জুটে গেল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া ঢুকল ঘরে, বর্ণনার টেবিলের কাগজ-পত্র ছড়িয়ে পড়ল মেজেতে।

ঘরে আর কেউ ছিল না, বনস্পতি নিজেই কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল, গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একটা ঠিকানা চোখে পড়ল তার, ঠিকানাটার নীচে লেখা রয়েছে, বাবার বিজ্ঞাপনের ছবি তিনটে এই ঠিকানায় দেওয়া হল। পড়েই পাখা মেলে উড়ল বনস্পতির কল্পনা। খাওয়া-দাওয়ার পর চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল সে।

দেখাই যাক না···।

রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটবার পর মনে পড়ল সঙ্গে একটি পয়সা নেই, রিক্‌শা নেওয়া যাবে না। রাস্তার পথিকদের জিগ্যেস করে করে হাঁটতেই লাগল সে। হাঁটতে খারাপ লাগছিল না। মাঝে মাঝে থেমে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, বাঃ, চমৎকার তো। কোলকাতার বড় বড় রাস্তাগুলোর যে বিশেষ একটা রূপ আছে তা অভিভূত করে দিল তার শিল্পী মনকে। সে মনে মনে ছবি আঁকতে আঁকতে চলেছিল। ভাবছিল···অনেক কিছুই ভাবছিল সে।

অনেক ঘুরে, অনেকবার পথ ভুল করে অবশেষে সে যখন সুবন্ধু সেনের আপিসে এসে পৌঁছল, তখন সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়ির দারোয়ান বললে, তিনতলার একটি ঘরে আপিস। অনেক সিঁড়ি

ভেঙে উঠতে হবে। খাড়া সিঁড়িগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর কপালের ঘামটা মুছে ওপরে উঠতে লাগল।

"সুবন্ধুবাবুর সঙ্গে দেখা হবে কি?"

"হবে। আসুন ভিতরে। কি দরকার আপনার?"

বনস্পতির দিকে না চেয়েই বুশ-সার্ট-পরা সুবন্ধু সেন রিভলভিং চেআরে বসে আপিসের কাজ করে যেতে লাগলেন।

"আমি আমার ছবি তিনটের খবর নিতে এসেছি।"

এইবার সুবন্ধু চাইলেন তার দিকে।

"আপনার ছবি? কবে ছবি দিয়েছিলেন আপনি?"

"আমার মেয়ে বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিল।"

এই শুনে সুবন্ধু সেনের দৃষ্টির ভাষা বদলে গেল। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। নমস্কারও করলেন।—"ও, আপনি বর্ণনা দেবীর বাবা? বসুন বসুন।"

সামনের চেআরটায় বসল বনস্পতি।

সুবন্ধু সেন আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। বোধহয় চিঠি লিখছিলেন। সেটা শেষ করে ব্লট করে খামে পুরে, ঠিকানা লিখে আবার ব্লট করে আবার চাইলেন তিনি বনস্পতির দিকে। ক্ষণকাল চেয়ে রইলেন কিছু না বলে। তারপর মন-স্থির করে ফেললেন। বাঁ দিকের ড্রআরটা টেনে বড় খাম বার করলেন একটা।

"এই নিন—"

"কি ওটা?"

"আপনার ছবি তিনখানা। প্রোপ্রাইটারদের পছন্দ হয়নি।"

খামটা হাতে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বনস্পতি। তারপর বলল, "কোন্ ছবিগুলো ওঁদের পছন্দ হয়েছে তা দেখতে পারি কি?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়। এই যে দেখাচ্ছি—"

তিনখানা ছবিই বার করে দিলেন। জুতোর কালির বিজ্ঞাপনের

ছবিতে জনৈক পীনোন্নত-পয়োধরা যুবতী কবলার্স স্ট্যাণ্ডের উপর পা তুলে দিয়ে জুতো বুরুশ করাচ্ছে, তার দু'হাত কোমরে, চোখে মুখে একটা দৃপ্ত হাসি যেন কি মহৎ কাজ করাচ্ছে। মুচিটাও হাসছে। দেশলাই বাক্সর ছবিতেও এক জোড়া তরুণ-তরুণীর মুখ, তরুণটির মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, সে একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে তরুণীর মুখের সিগারেটটি ধরিয়ে দিচ্ছে। দুজনেরই চোখে মুখে হাসি। 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' বইটির প্রচ্ছদপটেও একটি মেয়ের ছবি, তার এক পা মাটিতে আর এক পা আকাশে। সম্ভবত নাচছে। মুখে হাসি।

বনস্পতি গম্ভীরভাবে ছবি তিনখানি ফেরত দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি চললুম। নমস্কার।"

"নমস্কার। পার্সোনালি কিন্তু আপনার ছবি তিনটে আমার খুব ভালো লেগেছিল, কিন্তু কি করব বলুন। আচ্ছা, মিস্টার গাঙ্গুলীর সঙ্গে কি আপনার আলাপ আছে?"

"কারো সঙ্গেই আমার আলাপ নেই।"

"চলুন না, পাশের ঘরেই আছেন তিনি। মস্ত বড় একজন আর্ট ক্রিটিক, তিনি যদি আপনাকে ব্যাক করতে রাজী হন, হু হু করে আপনার ছবি বাজারে চলবে। এই তিনটি ছবিই তরুণ শিল্পীদের আঁকা। উনিই রেকমেণ্ড করেছিলেন। বাজারে ওঁর রেকমেণ্ডশনের খুব দাম। গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত খাতির করেন, অনেক জায়গায় উনি জজ্ হন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করুন। আমি এই স্লিপটা লিখে দিচ্ছি, বেয়ারার হাত দিয়ে এইটে ভিতরে পাঠিয়ে দিলেই দেখা করবেন আপনার সঙ্গে। এদিকে খুব পলিস্ড্ লোক।—"

বনস্পতির কৌতূহল হল, দেখেই আসি কি রকম লোকটা। তবু কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল।

"আচ্ছা, চলুন, আমিই আপনাকে ইনট্রোডিউস করে দিচ্ছি।"

সুবন্ধু সেন নিয়ে গেলেন তাকে পাশের ঘরে।

"মিস্টার গাঙ্গুলী, ইনি শ্রীবনস্পতি মিশ্র, আমাদের জন্যে গোটা তিনেক বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকেছিলেন, কিন্তু সেগুলো মালিকদের পছন্দ

হয়নি। আপনি যে ছবিগুলো রেকমেণ্ড করেছিলেন সেইগুলোই নিয়েছেন ওঁরা। সুদেষ্ণার বান্ধবীর বাবা ইনি। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

তারপর বনস্পতিকে নিম্নকণ্ঠে বললেন, "আলাপ করুন।"

বনস্পতি রৈবতক গাঙ্গুলীকে দেখেনি। দেখলেও চিনতে পারত কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁর চেহারা খুব বদলে গিয়েছিল। শুধু চেহারা নয়, বেশ-বাসও। আগে সাহেবী স্যুট পরতেন, এখন খদ্দর পরেন, খুব দামী মিহি খদ্দর। বৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডলে, চোখের কোণে, চিবুকের নীচে, গলার কাছে জরার ছাপ পড়েছিল, যদিও তাঁর নীলাভ রিম্‌লেস চশমাটা প্রতিবাদ জানাচ্ছিল এই বার্ধক্যের বিরুদ্ধে। বনস্পতি নামটা শুনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি। বহুকাল আগেকার ক্ষতটা তখনও শুকোয়নি।

"বনস্পতি মিশ্র? সুখপুরে বাড়ি কি আপনার?"

বনস্পতি শুধু মাথা নাড়ল।

"বহুকাল আগে আমি আপনার বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আপনার দারোয়ান ভূষণ চক্রবর্তী আমাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে কথা মনে আছে আপনার?"

"ভূষণ অনেককেই তাড়িয়েছিল। কাকে তাড়াতো আমি জানতেও পারতাম না। আপনার কথা আমার মনে পড়ছে না।"

রৈবতক গাঙ্গুলীর ভুরু দুটো কুঁচকে গেল, তারপর ঠোঁট দুটো এবং থুত্‌নিটাও। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন বনস্পতির দিকে।

তারপর বললেন, "তা বলে আপনার উপর আমার রাগ নেই। আপনি যদি আমার পরিচয় পেতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন—"

"আপনার পরিচয় আমি পেয়েছি।"

"পেয়েছেন? কে বললে, সুবন্ধু?"

"না। আপনি যে ছবি তিনটি রেকমেণ্ড করেছেন তা দেখেছি। তারাই আপনার পরিচয় দিয়েছে। আপনাকে দেখবার কৌতূহল হল তাই এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি নমস্কার।"

উঠে পড়ল বনস্পতি।

"শুনুন বনস্পতিবাবু, আপনার তিনটি ছবিও আমার ভালো লেগেছে। আপনি যে গুণী লোক তাতে আমার সন্দেহ নেই, আপনার অন্য ছবিগুলো যদি আনেন একদিন—"

স্মিত হাস্য করে বনস্পতি বললে, "না, দ্বিতীয়বার ভুল আমি আর করব না—"

রৈবতক গাঙ্গুলীকে অবাক করে দিয়ে বনস্পতি বেরিয়ে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে অনেক রাত্রে বর্ণনা বাড়ি ফিরে এসে দেখলে বনস্পতি সরস্বতী দুজনেই গুম হয়ে বসে আছে। বনস্পতি অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর।

"বাবা, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

বনস্পতি কোন জবাব দিল না। তারপর হঠাৎ বলল, "আমার সেই ছবি পাঁচখানা নিয়ে এস। আমি ছবি বিক্রি করব না।"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না বর্ণনা। বাবা-মার অনুমতি নিয়েই সে ছবি বিক্রি করতে দিয়েছে।

"সেগুলো একটা ছবির দোকানে দিয়েছি।"

"কালই গিয়ে নিয়ে এস, ছবি বিক্রি করতে হবে না।"

বনস্পতির এরকম রুক্ষ কণ্ঠ বর্ণনা আগে কখনও শোনেনি। নিজের পক্ষ সমর্থন করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সরস্বতী চোখের ইশারায় বারণ করাতে থেমে গেল।

চোদ্দ

নবনী রায়ের অনেকক্ষণ খবর পাওয়া যায়নি।

নেপথ্য-বিলাসী নবনী রায় নেপথ্যেই ছিল বরাবর, নেপথ্যে থেকেই যা করবার করে যাচ্ছিল, যারা কাঠ-পুতলীর নাচ দেখায় অনেকটা

তাদেরই মতো। শেষ পর্যন্ত নেপথ্য থেকেই হয়তো বর্ণনাদের সমস্যাটার সমাধান করে নেপথ্যেই বিলীন হয়ে যেত সে, কিন্তু তা হল না। পাদ-প্রদীপের সামনে এসে তাকে দাঁড়াতে হল অবশেষে।

বর্ণনার সম্পর্কে নবনীর মনোভাবটা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রণিধানযোগ্য। নবনী যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল বর্ণনার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে, আপাত-দৃষ্টিতে সে এড়িয়ে চলছিলও। জ্ঞাতসারে সে কখনও বর্ণনাকে প্রিয়-রূপে কল্পনা তো করেইনি, পাছে বর্ণনা সন্দেহ করে যে সে করছে তাই সে বর্ণনার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবার চেষ্টা করেনি কোনদিন। কিন্তু গোপনে গোপনে বর্ণনার জন্য সে যা করছিল তা নির্বিকার নিঃস্বার্থভাবে কেউ যে করতে পারে একথা কোনও বিজ্ঞানী মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষে মানা শক্ত। তাঁরা সন্দেহ করবেন প্রেমই অবদমিত হয়ে ওকে ওইরকম ভাবে ঘোরাচ্ছে। কিন্তু আগেই আমি বলেছি ওইরকম ভাবে ঘোরাটাই ওর স্বভাব। নীলমণি সেন, মহেন্দ্র, নগেন হাজরা, ঝক্‌মু বা কমলাক্ষের জন্যেও সে ওইরকম ভাবে ঘুরেছে। যাই হোক বর্ণনার জন্যে সে যা যা করেছে তা সংক্ষেপে বলছি। এর থেকে আপনারা যে যা অনুমান করতে চান করুন।

বর্ণনার সঙ্গে যেদিন তার প্রথম পরিচয় হল সেদিন থেকে বর্ণনার গতিবিধির সমস্ত খবর রাখছিল সে। বর্ণনা কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, কোথা কোথা যায়, কবে সে সুখময়বাবুর চাকরি ছাড়ল, কেন ছাড়ল—কোন খবর তার অবিদিত ছিল না। রিক্‌শা বা ট্যাক্সি চড়ে নিজেই সে অনুসরণ করেছে বর্ণনাকে অনেকদিন, ইংরেজি ভাষায় যাকে 'ফলো' করা বলে। কিন্তু কখনও তার সামনে পড়বার চেষ্টা করেনি। সুখময়বাবুর খবর জানবার জন্যে সে এক মেয়ে-গোয়েন্দাই বাহাল করে ফেলেছিল। এই সূত্রে তার পুরাতন ভৃত্য প্রহ্লাদের চরিত্রেরও একটা বিশেষ দিক প্রকাশিত হয়ে পড়ল তার কাছে। প্রহ্লাদ যে তার নাকের সামনে এই কাণ্ড করেছে তা ঘুণাক্ষরে সে জানত না। প্রহ্লাদকে সে একদিন সুখময়বাবুর বাড়িটা দেখিয়ে বলল, "দেখ, তুই এই বাড়ির চাকরদের সঙ্গে ভাব করে খবর নে তো ও-বাড়িতে কি সব কাণ্ড-

কারখানা হচ্ছে। প্রহ্লাদ মনে মনে একটু অবাক হল, কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করল না। তারপর বর্ণনাকে ও বাড়ি থেকে ঢুকতে-বেরুতে দেখে সে নিজস্ব একটা থিয়োরি খাড়া করে প্রভুর আদেশ পালন করতে লাগল। দিন কতক পরে এসে সে খবর দিলে, "ও-বাড়ির ভিতরে অনেক খবর আছে বাবু। কিন্তু আমি ঠিক ধরতে পারছি না, অন্দরমহলে তো ঢুকতে পারি না। কাল শুনলাম ওদের বাড়িতে একটা ঝি দরকার। যদি বলেন সুবাসিনীকে ওইখানে লাগিয়ে দি। ওর আজকাল চাকরি নেই।"

"সুবাসিনী কে?"

কথাটা এতদিন গোপনই রেখেছিল প্রহ্লাদ, এইবার মরিয়া হয়ে বলেই ফেললে।

"আমার পরিবার হুজুর।"

"তোর পরিবার! তোর যে পরিবার আছে তা তো জানতাম না। কোথা থাকে সে?"

"আগে সামন্ত ডাক্তারের ওখানে নার্সের কাজ করত। উনি এখন পাশ-করা নার্স বাহাল করেছেন, ওর চাকরি নেই। যদি বলেন তো ওকে ঢুকিয়ে দি সুখময়বাবুর বাড়িতে।"

"দে। কিন্তু তুই এই বয়সে বিয়ে করে ভরাডুবি হবি যে—"

মাথা চুলকে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে প্রহ্লাদ বললে, "যাতে না হই ডাক্তার সামন্ত সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

সুবাসিনী এসে বর্ণনার সম্বন্ধে যে খবর দিলে তা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল নবনী। বর্ণনার যতই পরিচয় পেতে লাগল, ততই সে মুগ্ধ হতে লাগল উত্তরোত্তর। এর আর একটা কারণও ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে এদেশের সনাতনপন্থীদের সঙ্গে সে ঠিক একমত ছিল না। শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা রোজগার করতে নাবলে বিপথে যাবেই—সনাতনপন্থীদের এই মনোভাবের সঙ্গে সে সায় দিতে পারেনি কোনদিন। কিন্তু নিজের মতটাকে সে যেন আর টিকিয়ে রাখতে পারছিল না। পথে ঘাটে, আপিসে, হাসপাতালে, সিনেমায় থিএটারে, এমন কি স্কুল কলেজেও

রোজগেরে মেয়েদের যে চেহারা সে রোজ দেখতে পাচ্ছিল তাতে সত্যিই দমে যাচ্ছিল সে। তার মনে হচ্ছিল সনাতনপন্থীদের কথাই ঠিক তাহলে নাকি। বেলেল্লাগিরিতে পুরুষদেরও উপর টেক্কা দিতে পারে এরকম মেয়ে রোজই যে চোখে পড়ছে তার। যে শাস্ত্রকে ওরা উপহাস করে সেই শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্যই যে প্রমাণ করছে এই সব ঘৃতকুম্ভের দল, আগুনের সংস্পর্শে আসামাত্রই গলগল করে গলে গড়িয়ে পড়ছে একেবারে। তার বাইরের মনটা দমে যাচ্ছিল সত্যি, কিন্তু তার অন্তরের নিভৃতলোকে যে আদর্শবাদী কল্পনাবিলাসীটি বাস করত সে দমেনি। সে জানত, যাদের দেখছি তারা এ যুগের প্রতীক নয়। তারা আধুনিক বেশ-বাসে নিজেদের সজ্জিত করে, আধুনিক ফ্যাসান আর মুদ্রাদোষগুলো আস্ফালন ক'রে রাস্তায় ঘাটে ট্রামে-বাসে হৈ-হুল্লোড় করছে বটে, কিন্তু তারা আধুনিক-আধুনিকা নয়, তারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের বন্য বর্বরের দল। ভোলটা শুধু বদলেছে। কিন্তু এও সে জানত ওই বর্বরের ভিড়ের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্যিকার আধুনিক-সত্তা, সংখ্যায় কম বলে তাদের দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারা আছেই। চানাচুরওলা মহেন্দ্রের মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল সঙ্গীত-রসিক, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেনের মধ্যে যেমন ছিল তেজস্বী পিতা, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নগেন হাজরার মধ্যে যেমন সে বিবেকী নাগরিককে দেখতে পেয়েছিল, গরীব রিক্শাওলা ঝক্মুর মধ্যে আবিষ্কার করেছিল নির্লোভ সচ্চরিত্র ভারতীয় কর্মীকে, গরীবের ছেলে কমলাক্ষের মধ্যে পেয়েছিল আত্মত্যাগী বীরকে, তেমনি সত্যি-কারের আধুনিকাকেও সে একদিন আবিষ্কার করবে এই হ্যাংলা ভিড়ের মধ্যে এ আশা তার ছিল। যে শুধু আধুনিকা নয়, সুচরিতা, সুশোভনা, সুশিক্ষিতা, অপ্রগল্ভা, যে আত্মসম্মানী, যে সত্যি স্বাধীন। বর্ণনাকে প্রথম দিনই সেই লরির পাশে দেখে তার মনে হয়েছিল এ মেয়েটি অসামান্যা, একে ঘিরে যে গম্ভীর কমনীয় প্রভাময় পরিবেশ দ্যুতিমান হয়ে আছে, তা সচরাচর দেখা যায় না। এ রহস্যময়, সুদূর এবং সুন্দর। এই রহস্যের যবনিকা তুলতে গিয়ে সে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল, পুলকিত হয়ে উঠল তার অন্তরনিবাসী কল্পনাবিলাসী কবি, বলে উঠল,—এই তো,

এই তো সে। আধুনিকতার মুখোশ পরা বর্বরদের ভিড়ের একপাশে এই তো সে দাঁড়িয়ে আছে, সসঙ্কোচে নয়, সসম্মানে। এই তো সেই মহিমময়ী আধুনিকা যে বিপন্ন পরিবারের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সমর্থ ছেলের মতো, তুলে নিয়েছে কর্তব্য-বোধে, শোভন শালীনতা সহকারে যে নিদারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছে লম্পট সুখময়ের লালসা-ক্লিন্ন প্রস্তাব, যে অপরের সহানুভূতির জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘোরেনি, আত্মবিক্রয় করেনি, হতাশায় ভেঙে পড়েনি, কামনায় বেঁকে যায়নি। মেয়েটি যে কত বড় বংশের, কত বড় মর্যাদার, কত বড় মহিমার উত্তরাধিকারিণী এ খবরও সে পেয়েছিল ভূষণ চক্রবর্তীর কাছে। সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, ঠিক করে ফেলেছিল একে সে সাহায্য করবেই। ব্যাংকে তার যে টাকা জমছিল তার কিছুটা না হয় খরচ হয়ে যাবে এই মহৎ কর্মের জন্য। তা যাক। টাকার সম্বন্ধে তার মোহ নেই। কিন্তু এও সে ঠিক করেছিল, যা করবে খুব গোপনে নেপথ্যে থেকেই করবে। বর্ণনা যেন বুঝতে না পারে তার টাকাতেই এসব অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও মনে করবে আবার বুঝি আগুন লাগল। বন্ধু শ্রীনাথনের কাছেও কিচ্ছু ভাঙেনি সে, পাছে তার মনে হয় মেয়েটির প্রেমে পড়েই মিস্টার রায় এসব করেছেন।

মিস্টার নাথন পাঁচখানা ছবিই একসঙ্গে সাজিয়ে রেখেছিল তার 'শো-কেসে' পাশাপাশি। ছবিগুলো তার নিজেরও খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু ছ'মাসের আগে যে বিক্রি হয়ে যাবে এ আশা সে করেনি। প্রত্যেক ছবির দাম হাজার টাকা করেই রেখেছিল সে, ভেবেছিল খরিদ্দার এলে একটু দর-দস্তুর করবেই, তখন না হয় কিছু কমানো যাবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল যখন সাতদিনের মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেল সব ছবিগুলো। পাঁচজন অচেনা খরিদ্দার এসে এক হাজার টাকা করে দাম দিয়েই কিনে নিয়ে গেল সেগুলো একে একে। চানা-চুরওলা মহেন্দ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত নীলমণি সেন, কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত নগেন হাজরা,

রিকৃশাওলা ঝক্‌মু, প্রফেসার কমলাক্ষ সিংহ এদের কাউকেই চিনত না শ্রীনাথন। শিল্পীর জাত বলে বাঙালীদের সম্বন্ধে শ্রীনাথনের আগে থাকতেই শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধা আরও বাড়ল। ঝক্‌মু আর কমলাক্ষকে আপনারাও চেনেন না। ঝক্‌মুকে নবনী একদিন অন্ধকারে ভুল করে এক টাকার বদলে দু'টাকার নোট দিয়েছিল ভাড়া হিসেবে। ঝক্‌মু তার পরদিন টাকাটা ফেরত দিয়ে যায়। সেই থেকে ঝক্‌মু নবনী রায়ের বন্ধু। কমলাক্ষের সঙ্গে নবনী আলাপ করেছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবরের কাগজ পড়ে আর খবরের কাগজে তার ছবি দেখে। কমলাক্ষ তখন স্কুলে পড়ত। এক অন্ধ বুড়ীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে চাপা পড়েছিল এক মোটরের তলায়। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল। খবরটা কাগজে পড়েই নবনী খোঁজ নিয়েছিল গিয়ে হাসপাতালে। রোগা পাতলা ছেলে একটা, কণ্ঠার বুকের হাড় বেরিয়ে আছে। খোঁজ নিয়ে খবর পেল, গরীব মায়ের একমাত্র ছেলে। দুবেলা ভাল করে খেতেও পায় না। তারপর থেকে নবনী আর তাকে ছাড়েনি। নবনীর অর্থানুকূল্যেই বরাবর পড়াশোনা করে এখন সে প্রফেসার হয়েছে।

ছবিগুলো শ্রীনাথনের দোকানে পৌঁছে গেছে এ খবর পেয়েই নবনী এদের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা করে ছবি কিনতে পাঠিয়েছিল। নিজে কেন গিয়ে কিনছে না তার একটা মনগড়া কাহিনীও বলেছিল প্রত্যেককে। আর বলেছিল, খবরদার কথাটা যেন প্রকাশ না পায়।

ছবিগুলি সংগ্রহ করে নিজের বাড়ির একটা ঘরেই তালাবন্ধ করে রেখে দিয়েছিল সে ভূষণ চক্রবর্তীর অজ্ঞাতসারে। এর জন্যে বেশি বেগ পেতে হয়নি তাকে। ভূষণ চক্রবর্তী সমস্ত দিনই বাড়ির খোঁজে বাইরে বাইরে থাকতেন। তাঁকে একটা ঘর দিয়েছিল নবনী। সেই ঘরে তিনি কাজও করতেন, থাকতেনও।

এই ভূষণ চক্রবর্তীই শেষকালে বিপদে ফেলে দিলেন তাকে। অসুখে পড়ে গেলেন তিনি। অসুখে যে পড়বেন তা নবনী আশঙ্কাই করেছিল। নিজের খাওয়া খরচের জন্ত নগদ পঁচিশ টাকার বেশি নিতেন না তিনি, নবনী রায়ের অনুরোধ সত্ত্বেও নেননি। ওই পঁচিশ টাকাতে একটা সস্তা

হোটেলে জঘন্য খাবার খেয়ে বাড়ির খোঁজে সমস্ত দিন রোদে রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতেন। কিছুতেই ভাল বাড়ি পাচ্ছিলেন না। শেষে নবনী রায়ই তাঁকে দমদমের দিকে ভাল একটা কম্পাউণ্ড-ওলা বাড়ির খবর দেন। বাড়িটা দেখে খুব ভালো লাগে তাঁর। অনেকখানি কম্পাউণ্ড, বড় একটা গেট, গেট বন্ধ করে দিলে কেউ আর ঢুকতে পারবে না। বাড়িতে মালিকের একটি কর্মচারী ছিলেন, তাঁর সঙ্গেই পাকা কথা ক'য়ে ঠিক করে ফেললেন সব। মাসে পাঁচ শ' টাকা করে ভাড়া। আনন্দে উত্তেজনায় হন হন করে ফিরে আসছিলেন তিনি নবনী রায়কে খবরটা দেবার জন্যে। হেঁটেই ফিরছিলেন। কিন্তু এত উত্তেজনা সহ্য হল না তাঁর। বাড়িতে ফিরে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি অজ্ঞান হয়ে। নবনী তখন বাড়িতে ছিল না। প্রহ্লাদ গিয়ে ডেকে নিয়ে এল ডাক্তার সামন্তকে। তিনি এসে যা করবার করলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি, কিন্তু অসুখের কোন উপশম দেখা গেল না, জ্বর উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে ডাক্তার সামন্ত বললেন টাইফএড হয়েছে। এর নূতন যে ওষুধ বেরিয়েছে তা দিয়ে জ্বরটা কমল বটে, কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তী সুস্থ হলেন না। আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকতেন আর প্রলাপ বকতেন।

প্রলাপে বলতেন—"কে, কে যাচ্ছেন ঘরের মধ্যে, যাবেন না। না, আমি যেতে দেব না। খবরদার। হ্যাঁ, হ্যাঁ তপস্যাই, আপনি ওখানে ঘুজ ঘুজ করছেন কেন, বাইরে যান। কি বললেন, মাসিক পত্রের সম্পাদক, ওঁকে চুমরে বিনা পয়সায় ছবি নিতে এসেছেন? হবে না, বেরিয়ে যান।"

আবার খানিকক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। তারপর আবার—"বর্ণনা কোথা। বর্ণনার বিয়ের পাত্র আমি নিজে খুঁজব। রূপকথার রাজপুত্র চাই, শিল্পী বনস্পতির উপযুক্ত জামাই চাই। একটা স্বর্ণগর্দভ হলে চলবে না।"

তারপর আবার—"কে হে? ছবি কিনবে? এটা ছবির দোকান নয়। অন্যত্র যাও।" আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা? এদিকে আয়। অমন শুকনো মুখ কেন মা তোর। তোর তো ফুলের মতো ফুটে থাকা উচিত। কত বড় শিল্পীর মেয়ে তুই। তোদের জন্যে খুব ভালো একটা বাড়ি খুঁজে বার করেছি, জানিস? আমার একটা কর্তব্য শেষ হয়েছে"—আবার খানিকক্ষণ পরে—"আর একটা কর্তব্য বাকী আছে। তোর জন্যে একটা ভাল বর খুঁজে বার করতে হবে। বার করবই।"

আবার চুপচাপ কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ—"বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, এটা বেশ্যা বাড়ি নয় যে মজলিশ করবে। না, না, উনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না। এই দারোয়ান—" আবার চুপচাপ।

তারপর—"বর্ণনা, বর্ণনা কোথা গেলি। ও বর্ণনা, সরে আয় না এদিকে, তোর মুখটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না।"

শেষে প্রলাপের ঘোরে ভূষণ চক্রবর্তী ক্রমাগতই বর্ণনাকে খুঁজতে লাগলেন, এত অস্থির হয়ে পড়লেন যে বিছানায় উঠে উঠে বসতে লাগলেন।

"বর্ণনা আসছে না কেন, কি হয়েছে ওর, নিশ্চয় রাগ হয়েছে, খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলছে ওকে সবাই, ও কি অত খাটতে পারে, কচি মেয়ে, রাজার দুলালী। বর্ণনা, বর্ণনা—" চীৎকার শুরু করলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

নবনী তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার সামন্তকে ডেকে নিয়ে এল। নবনী, প্রহ্লাদ আর সুবাসিনী এরা তিনজনই পালা করে সেবা করছিল, রাত জাগছিল।

ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকে বরং খবর দিন। তাঁকে দেখলে হয়তো একটু শান্ত হবেন।"

শান্ত হবার একটা ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন। ওষুধে কিন্তু ফল হল না! বর্ণনার জন্যে ক্ষেপে গেলেন তিনি যেন। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "আমি বর্ণনার কাছে যাব, তার হস্টেলে যাব, সে অভিমান করেছে—"

নবনী রায়কে আবার যেতে হল ডাক্তার সামন্তর কাছে। ওএটিংরুমে

ঢুকেই বুঝতে পারল, ভিতরে লোক রয়েছে। ডাক্তার সামন্ত কাকে যেন বলছেন, "আজ্ঞে না, আপনাদের এখন জন্ম-নিরোধ করবার দরকার নেই। দু'একটা ছেলে-মেয়ে হোক না, তখন আসবেন।"

নবনী রায় শুনতে পেল মৃদুকণ্ঠে একটি মেয়ে বলছে, "না, ছেলে-মেয়ের বড় ঝঞ্ঝাট। ও আমরা চাই না।"

"দেখুন, জন্ম-নিরোধ করে আপনাদের যথেচ্ছাচার করবার সুবিধে করে দেব তেমন লোক আমি নই। আয় এবং স্বাস্থ্য অনুসারে সন্তান সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করাই আমার কাজ। যখন দরকার হবে আমি নিজেই সে কথা বলব আপনাদের। এখন থেকেই ও-কথা ভাবছেন কেন? অন্তত একটা ছেলে হোক, তখন আসবেন—"

একটি বয়সা-ধরা পুরুষ কণ্ঠ বলল, "যদি একটু বিবেচনা করে দেখতেন। শ' খানেক টাকা দিতে রাজী আছি আমি।"

"সব জায়গায় ঘুষ চলে না। আচ্ছা, আসুন এখন।"

বাহারে শাড়ি-পরা আধ ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ে এবং একটি ছোকরা বেরিয়ে গেল।

নবনীর মুখে সব শুনে ডাক্তার সামন্ত বললেন, "বর্ণনা দেবীকেই আনিয়ে নিন। ঠিকানাটা জানেন তো?"

"জানি।"

"একটা খবর দিয়ে দিন তাহলে।"

নবনী রায়কে পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াতে হল এইবার।

পনরো

বর্ণনাদের বাড়িতে এদিকে তুমুল তাণ্ডব চলছিল। পুলিশের এবং মৃত্যুর। উপর্যুপরি কয়েকদিন সে কলেজে যেতে পারেনি। হস্টেলেও যায়নি, ছবির খবরও নিতে পারেনি। প্রচণ্ড দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে বনস্পতিও আর তোলেনি ছবির কথা।

বিপদ কখনও একা আসে না, বিধাতার রোষ যার উপর পড়ে তাকে একেবারে ছারখার করে দেয়—এই সব প্রবাদ বাক্য হেমন্তকুমারকে দেখেই যেন রচিত হয়েছিল। যে কটি রঙীন বুদ্বুদ সে কোলকাতার রাস্তায় উড়িয়েছিল তার সব কটিই ফেটে গেল।

ছোরা আত্মহত্যা করেছিল। একটা কাগজে লিখে গিয়েছিল, "স্বেচ্ছায় গলায় দড়ি দিলুম। কেন দিলুম তা জেলে গিয়ে সেজদাকে জিগ্যেস করো। আমি তা লিখতে পারব না।" কাটারি পালিয়ে গিয়েছিল কিরিচের কাছে। তার ভয় করত। সে নাকি ছোরাকে দুদিন দেখতে পেয়েছিল দরজার পাশে, তার দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে। এর উপর আর এক বিপদ। যে চারটি ছেলেমেয়ে বাচস্পতির কাছে ছিল তাদের প্রত্যেকেরই বসন্ত হয়েছে। আসল বসন্ত। কারো টিকে দেওয়া ছিল না।

একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু। সত্যবতী হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যে ভোরে আড়কাটা থেকে দোদুল্যমান ছোরাকে দেখে চীৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, সেই ভোর থেকেই তাঁর পাগলামি সেরে গিয়েছিল। একটা দমকা হাওয়ায় কুয়াশাটা যেন উড়ে গেল। সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর ছোরা গভীর রাত্রে গলায় দড়ি দিয়েছিল। ভোর-বেলা সত্যবতীই তাকে প্রথম দেখতে পান। তাঁর যে গগন-বিদারী আর্ত হাহাকার পাড়ার সবাইকে জাগিয়ে তুলেছিল সেই হাহাকারই নাকি জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর আচ্ছন্ন সত্তাকে, তীব্র বেদনার তাড়নায় পাগলামি সেরে গিয়েছিল। ডাক্তার চক্রবর্তীর এই মত।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর চোখে মুখে একটা অপ্রতিভ কুণ্ঠিত ভাবও ফুটে উঠেছে, এতদিন কর্তব্য-কর্মে মন দিতে পারেন নি বলে তিনি লজ্জিত। লাঠি সোঁটা বল্লম বন্দুক কিরিচ ছোরা এদের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি, এদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেন নি। অত্যন্ত শান্ত ভাবে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন। বর্ণনার মনে হচ্ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিক হাসপাতাল থেকে ভাল হয়ে আবার যেন 'ডিউটি'তে ফিরে এসেছে অনেকদিন পরে।

একদিন শুধু কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "উনি তো নিজে সংসারের জন্যেই দিনরাত মেহনত করছেন, সংসারের উপকার হবে বলে ছেলে-মেয়েদেরও কাজে লাগিয়েছিলেন, এমনটা যে হবে কে জানত। আমিই মাথা ঠিক রাখতে পারলুম না বলে এসব হল। আমি ঠিক থাকলে এমন হত না। হালে মাঝি না থাকলে নৌকো তো বানচাল হবেই।"

এই বলে হেসেছিলেন একটু। করুণ বিষণ্ণ হাসি।

এই নিদারুণ দুঃখের পটভূমিকায় বাচস্পতি-সীমন্তিনীরও নূতন রূপ ফুটে উঠেছিল। বাচস্পতি যে বাড়ির বড় ছেলে এবং সীমন্তিনী যে বাড়ির বড় বউ সেটা এইবার যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এত বিপদেও দুজনেই অবিচলিত, দুজনেই হাসিমুখ, যেন কিছুই হয়নি। সীমন্তিনী সত্যবতীকে রোজ বলেন, "উনি বলছিলেন আমরা যতক্ষণ আছি তোমাদের কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবানকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাচস্পতি বর্ণনাকে বললেন, "তোমার বড়মার গয়নাগুলো ব্যাংক থেকে বার করে বিক্রি করে দাও। তোমার আর তোমার মায়ের গয়না এখন থাক। তোমার বড়মার গয়না বিক্রি করলে অন্তত হাজার পাঁচ ছয় টাকা হবে। ও টাকাটা শেষ হয়ে যাবার পর যদি দরকার হয় তখন তোমাদের গয়নায় হাত দেব।"

জ্যাঠামশায়ের আদেশ অমান্য করা সম্ভব ছিল না বর্ণনার পক্ষে। বড়মার গয়না বিক্রি করে সাড়ে ছ' হাজার টাকা পাওয়া গেল। সেটা ব্যাংকে জমা করে পাশ বুকটা বাচস্পতিকে এনে দিলে সে।

"ওটা তোর কাছেই রাখ। তোকেই তো বার করতে হবে ব্যাংকে গিয়ে। এখন কিছুদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তুমি হস্টেলে গিয়ে পড়াশোনায় মন দাও এবার। ভাল করে এম. এ-টা পাশ করা চাই। হ্যাঁ, আর তোর বন্ধু সুদেষ্ণার বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র এসেছে দেখেছিস? তাকে ভাল একখানা বেনারসী শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দে। খেলো জিনিস দিস নি। দেড় শ' দু শ' টাকায় ভাল শাড়ি হবে না? তাই দিস। আর তোর বাবাকে বল্ সে ছবি আঁকতে আরম্ভ করুক

এবার। মন-স্থির করে বসলেই পারবে। আর আমি যখন রয়েছি ওর অত ভাবনা কি—"

বাচস্পতির মনোভাবটা আরও স্পষ্ট হয়েছে 'সুখপুর-পত্রিকা'র একটি সংবাদে। উদ্ধৃত করছি।

"ঘরের খবর। আমাদের আত্মীয় হেমন্তকুমারকে ভগবান শাস্তি দিতেছেন। এ শাস্তি তাহার প্রাপ্য কিনা, শাস্তি অত্যন্ত বেশি কঠোর কিনা তাহা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। এইটুকু শুধু বলিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিব। যতক্ষণ আমাদের দেহে ও মনে শক্তি থাকিবে ততক্ষণ আমরা হেমন্তকুমার ও তাহার পরিবারবর্গকে ভগবানের শাস্তি হইতে বাঁচাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব। ফল কি হইবে তাহা জানি না। সে সম্বন্ধে চিন্তাও করিব না। কারণ স্বয়ং ভগবানই গীতায় বলিয়াছেন, কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে, সুতরাং ফল লইয়া মাথা ঘামাইও না।

উপর্যুপরি বিপৎপাতে শ্রীমান বনস্পতিও বেশ বিচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে জল-চ্যুত মীনের মতো ম্রিয়মান হইয়া ছিল, একটিও ছবি আঁকিতে পারে নাই, সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকিত। সম্প্রতি সে আরও যেন দমিয়া গিয়াছে। নিজেকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য ঘরের কাজে মন দিয়াছে। রাস্তার কল হইতে জল আনে, ঘর ঝাঁট দেয়, এমন কি কাপড় কাচে। শ্রীমতী সরস্বতী রান্নার যাবতীয় ভার বহন করিতেছে। যাহারা স্বপ্নের জগতে বাস করিয়া বিবিধ বর্ণের বেলুনে উড়িয়া বেড়াইত, ভগবান তাহাদের রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন করিয়া সম্ভবত মজা দেখিতেছেন। ভগবান তাঁহার লীলা-বিলাসে মত্ত থাকুন, আমরা আমাদের কর্তব্য হইতে বিমুখ হইব না। আমি অদ্য বনস্পতিকে শাসন করিয়া দিয়াছি। বলিয়াছি 'দেখ, শাণিত ক্ষুর দিয়া কেহ কখনও বৃক্ষশাখা ছেদন করে না। তুমি শিল্পী, তুমি ছবি আঁক। জল-আনা, কাপড়-কাচার জন্য আমি একটি দাসী নিযুক্ত করিয়া দিতেছি। সংসারের তুচ্ছ খুঁটিনাটি লইয়া তোমাকে চিন্তা করিতে

হইবে না। সেজন্য আমি আছি। বধূমাতারও রান্নাঘরে সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। একটি পাচিকা বা পাচক ঠিক করিয়া দিতেছি। বধূমাতা তোমাকে যেমন ছবি আঁকায় সাহায্য করিত তেমনি করুক। এখনও তো আমরা একেবারে নিঃস্ব হই নাই, তোমার ভাবনা কি। তুমি ছবি আঁক।' আমার কথায় সে ছবি আঁকিতে বসিয়াছিল কিন্তু কিছুই আঁকিতে পারে নাই। সম্ভবত এ পরিবেশই তাহার ছবি-আঁকার অনুকূল নহে। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, সে-ই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বেশি বিপন্ন। কিন্তু রাত্রে আমার এ ভুল ভাঙিল, বুঝিলাম হেমন্তকুমারই সব চেয়ে বেশি দুঃখী। গত রাত্রে রাস্তায় ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম পথের উপর নর্দমার পাশে বসিয়া হেমন্তকুমার দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। হেমন্তকুমারকে ইতিপূর্বে কখনও কাঁদিতে দেখি নাই। সে সর্বদাই সপ্রতিভ। তাহাকে রোরুদ্যমান দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পাশে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম।

বলিলাম, 'ভাই, ভাঙিয়া পড়িও না। বিপদে ধৈর্যই বল। কর্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। তুমি উদ্যমশীল কর্মী লোক। একটি দিনও অলসভাবে বসিয়া থাক না। কিন্তু যদি রাগ না কর একটি কথা তোমাকে বলিব। তুমি গৈরিক বাস পরিত্যাগ কর। গৈরিক ধারণ করিবার যোগ্যতা আমাদের কাহারও নাই। খুব কম লোকেরই সে যোগ্যতা থাকে। জ্যোতিষীর ব্যবসায়ও আমার মতে ভালো ব্যবসা নহে, সাধারণত উহা ভণ্ডামি এবং মিথ্যাচারের নামান্তর মাত্র। আমার মতে এইটিও তুমি পরিত্যাগ কর। সুবিধা মতো অন্য কোন কাজ যোগাড় করিয়া লও। যদি যোগাড় করিতে না পার, ঘরেই বসিয়া থাক। আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি, তোমার কোন চিন্তা নাই।'

হেমন্তকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—'চিরকাল আমরা তোমাদেরই খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়াছি। কিন্তু দুর্দিনে আর তোমাদের ভার বাড়াইতে চাহি না। যেমন করিয়া পারি, যতটুকু পারি তোমাদের

সাহায্য করিব। জ্যোতিষী ব্যবসায় যে জুয়াচুরির নামান্তর তাহা আমি জানি, কিন্তু যে সমাজে, যে শাসন ব্যবস্থায় সর্বত্রই অন্যায় অবিচার ও জুয়াচুরি সেখানে আমি সৎ থাকিব কেমন করিয়া? আমি ইচ্ছা করিয়াই জুয়াচুরি করিতেছি, সমাজের উপর প্রতিশোধ লইতেছি, বোকা অথচ পাজি লোকগুলার কান মলিয়া টাকা আদায় করিতেছি। আমাকে তুমি বাধা দিও না। অন্য কোন্ কাজ করিব বল? আমার কোন যোগ্যতাই যে নাই।'

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না।"

ষোল

হেমন্তকুমার বাচস্পতির অনুরোধ শোনেনি। গেরুয়া পরেই রোজ বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। সমস্ত দিন বাইরে বাইরেই থাকত। রোজগারের চেষ্টায় হন্তে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে। এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়। দিনের বেলা বাইরেই খেয়ে নিত কিছু, কিম্বা কিছুই খেত না। বাড়ি ফিরত রাত এগারোটা বারোটার পর।

একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সহদেবের। সেই সহদেব, যে 'সুখপুর কার্ড ক্লাব' স্থাপন করেছিল। সে গৈরিকধারী হেমন্তকে দেখে অবাক হয়ে গেল। "হিমুদা, এ কি কাণ্ড?"

হেমন্ত কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল তার দিকে গম্ভীর ভাবে।

তারপর সংক্ষেপে বলল—"পেটকা ওয়াস্তে। তুই কি করছিস?"

"আমি এক গুজরাটি বিড়ির দোকানে চাকরি করি।"

"যাক চাকরি একটা পেয়েছিস তাহলে—"

"অতি কষ্টে। বাঙালীকে আজকাল কেউ চাকরি দিতেই চায় না হিমুদা। বলে তোমরা ফ্যাক্‌টারিতে ঢুকলেই স্ট্রাইক করাবে। তোমাদের চাকরি দেব না। এই গুজরাটির হাতে-পায়ে ধরে অনেক কষ্টে চাকরিটি পেয়েছি। বকুদা বনুদা কেমন আছেন?"

"টিকে আছেন কোন রকমে।"

"তোমার এ ব্যবসা কেমন চলছে ?"

"এক রকম। তবে তুই যদি একটু সাহায্য করিস আরও ভাল ভাবে চলবে। তোকে কিছু কমিশনও দেব।

"বল কি করতে হবে। নিশ্চয় করব সম্ভব হলে—"

"একটু অভিনয় করতে হবে। তুই রোজ আমার কাছে হাতজোড় করে এসে বসবি, আর যেই কেউ কাছাকাছি আসবে অমনি গদগদকণ্ঠে একটু জোরে জোরে বলবি, ঠাকুর মশাই ধন্য আপনার গণনা। আপনার কথা অনুসারে চলে রেসে বিস্তর টাকা পেয়েছি। কোনদিন বা বলবি, ধন্য আপনার মাদুলি, হাঁপানি একদম সেরে গেছে। কোনদিন বলবি ধন্য আপনার কবচ, চাকরি পেয়ে গেছি। কোনদিন বলবি, কি বশীকরণই করেছিলেন, অদ্ভুত ফল হয়েছে। এখন মেয়েটা আমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে। ধন্য আপনার গণনা, ধন্য আপনার তান্ত্রিক ক্রিয়া, আপনি মহাপুরুষ আপনি দেবতা—"

চীৎকার করতে লাগল হেমন্ত। সহদেব ভয় পেয়ে গেল। প্রলাপ বকছে নাকি হিমুদা। চোখ দুটো কেমন যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, রগের শিরগুলো ফুলে উঠেছে।

"এই উপকারটি করতে পারবি ?"

"তা পারব না কেন—

"ওই একটা লোক আসছে। বল তাহলে জোরে জোরে—"

বিস্মিত সহদেব হাতজোড় করে বলতে লাগল—"ঠাকুর মশাই, ধন্য আপনার মাদুলী, হাঁপানি একদম সেরে গেছে—ধন্য আপনার গণনা—"

লোকটা এল, চলে গেল, দাঁড়ালো না।

এইভাবে চলল কিছুদিন। সে কবে কোন্ পার্কে বা কোন্ রাস্তায় বসবে তা আগে থাকতে সহদেবকে বলে দিত। সহদেব ঠিক আসত। এতে তার রোজগার বেড়েছিল কিছু। সহদেবকে টেন্ পারসেণ্ট দিয়েও কিছু বাঁচত তার।

হঠাৎ একদিন আর এক কাণ্ড হল। সেই বাবরি-চুলওলা শশাঙ্ক দাস তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আরে, ঠাকুর মশাই, আপনি এখানে বসছেন নাকি আজকাল! এদিকে আমি আপনার খোঁজে সারা কোলকাতা শহর চষে বেড়াচ্ছি। আপনার বশীকরণে কি অদ্ভুত ফলই যে ফলেছে তা কি আর বলব। সোনামণি এক্কেবারে আমার হাতের মুঠোয় এখন। অবশ্য এক ছড়া ভারী বিছে হার গড়িয়ে দিতে হয়েছিল, কিন্তু আপনার ক্রিয়ায় কাজ যে হয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। খুব কাজ হয়েছে। তিন আইনের জোরে বিয়েও করে ফেলেছি তাকে। ল্যাটা চুকিয়ে দিয়েছি। আপনি চলুন, আশীর্বাদ করে আসবেন।" শশাঙ্ক দাস প্রণাম করে নগদ পঁচিশটি টাকা দিলে।

"আপনার জন্যে এক জোড়া কাপড় আর একটি মলমলের চাদরও গেরুয়ায় ছুপিয়ে রেখে দিয়েছি। বাড়িতে পায়ের ধুলো পড়লে সেখানেই দেব। যাবেন এখন? রিক্‌শা ডাকব?"

"ডাক।"

রিক্‌শায় যেতে যেতে শশাঙ্ক দাস বললে, "আর একটি কাজও করে দিতে হবে ঠাকুর মশাই। যাতে ছেলেপিলে না হয় তার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ছেলেপিলে হতে আরম্ভ করলেই শরীরের বাঁধুনিটা চলে যায়, বুঝলেন না। ছেলেপিলে চাই না। একজনের কথায় ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকে গেসলাম কিন্তু লোকটা একটু ইয়ে গোছের, এক শ' টাকাতেও রাজী হল না। হয়তো দু শ' পাঁচ শ' দিলে হত, কিন্তু অত টাকা এখন হাতে নেই। বাবা দোকানে বসে কিনা। আপনি তন্ত্র মন্ত্র কিছু একটা করে দিন। তন্ত্রে মন্ত্রে হবে কিছু?"

"হবে। ওই এক শ' টাকাতেই হবে।"

"বেশ, ব্যবস্থা করে ফেলুন তাহলে।"

তারপর হেমন্তকুমারকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বললে, "আর একটা বিয়েও পাকছে। সোনামণির একটা বোন আছে, আমার এক মাসতুতো ভাই তাকে দেখে ক্ষেপেছে। ক্ষেপবার কথাই, ডব্‌কা ছুঁড়ি

যাকে বলে। এর বিয়েটা চটপট দিয়ে দিতে হবে। মেয়েটা রাজী হয়েছে"—তারপর চুপি চুপি—"সাধে হয়েছে? পোয়াতি হয়ে গেছে ছুঁড়ি। এই রোকো, রোকো—" রিক্‌শা একটা খোলার বাড়ির সামনে থামল।

"কই সোনামণি, কপাট খোল, কপাট খোল। ঠাকুর মশাইকে পাকড়াও করে এনেছি।"

এইবার ভগবান আর একটি বজ্র হানলেন হেমন্তর মাথায়। কপাট খুলে বেরিয়ে এল বন্দুক, আর তার পিছনে কিরিচ আর কাটারি।

হেমন্তকুমার হঠাৎ ঘুরে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল গলি থেকে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শশাঙ্ক দাস।

সতেরো

পর পর তিনদিন গিয়েও বর্ণনার দেখা পেল না নবনী। হেমন্তকুমার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াতে আবার তাকে ঘুরতে হচ্ছিল থানায় থানায়, হাসপাতালে হাসপাতালে। তাছাড়া আর এক বিপদ হয়েছিল। কোদাল কুড়ুল খন্তা তিনজনই মারা গিয়েছিল। সড়কি শুষছিল। বর্ণনা বাড়িতে বসতে পারছিল না এক মুহূর্ত। সব ব্যবস্থা তাকেই করতে হচ্ছিল, সব ভার তার উপর।

কয়েকদিন পরে হেমন্তকুমারের এক ঠিকানাহীন চিঠি আসতে পারিবারিক আবহাওয়া কিছু যেন শান্ত হল। হেমন্তকুমার লিখেছে—আমি ভাল আছি। আমার জন্যে তোমরা চিন্তা কোরো না। যথাসময়ে গিয়ে হাজির হব। নতুন কাজ শিখছি একটা। কয়েকদিন দেরি হতে পারে।

ভূষণ চক্রবর্তী অনেকটা সামলেছিলেন। জ্বর ছিল না, কিন্তু বর্ণনাকে দেখবার জেদ কমে নি। তাঁর আগ্রহাতিশয্যে নবনীকে আর একবার বর্ণনার খোঁজে বেরুতে হল। যাবার আগে সে ভেবে নিয়েছিল কি

করবে। একটা সে বুঝতে পেরেছিল যে বর্ণনার সঙ্গে যে ছলনা সে এতদিন করেছে তা আর চালানো যাবে না। সে বর্ণনাকে বলেছিল সে কোলকাতার বাইরে থাকে, হেমন্তকুমারকেও বলেছিল সে কথা। কিন্তু ভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বর্ণনার দেখা হলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। আরও কতকগুলো মিথ্যা কাহিনী রচনা করে এ ব্যাপারটাকেও অন্য রঙে রাঙিয়ে দেবার মতো কল্পনা-শক্তি তার যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তা করতে তার আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কারণ সে জানত সত্য একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই, আর যখন করবে তখন বর্ণনার কাছে অত্যন্ত খেলো হয়ে যেতে হবে তাকে। বর্ণনা নিঃসন্দেহে তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলে মনে করবে। হয়তো এ-ও ভাববে যে এ সবের পিছনে নিশ্চয় তার একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, হয়তো তাকে সুখময়বাবুরই নূতন সংস্করণ মনে করবে। বর্ণনার মনে এ ধরনের সন্দেহ যাতে না হয় সেই জন্যই তো সে গোপনতার আশ্রয় নিয়েছিল। বর্ণনাকে টাকা দিয়ে প্রলুব্ধ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার আকাঙ্ক্ষা তার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না, এখনও নেই। বর্ণার মতো মেয়ে, বনস্পতির মতো শিল্পী, ভূষণ চক্রবর্তীর মতো আদর্শবাদী এই বর্বর সভ্যতার স্টিম-রোলারের তলায় চাপা প'ড়ে আর একটু হলে মারা যাচ্ছিল, সে তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। কর্তব্যবোধেই করেছে। এই জন্যে সে কোন বাহবাও প্রত্যাশা করে না, এর পিছনে তার কোন উদ্দেশ্যই নেই। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল কি করবে।

বর্ণনার সঙ্গে বাড়িতে দেখা হল না। তার হস্টেলে যেতে হল। বাচস্পতি বর্ণনাকে জোর করে আবার হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কমন-রুমে বসে একটা স্লিপে নিজের নাম লিখে পাঠিয়ে দিতেই বর্ণনা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, "আপনি এসেছেন? আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি মনে মনে।"

"কেন?"

"কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। আপনি কি উপকার যে করেছেন আমার। বাবার পাঁচখানা ছবিই বিক্রি করে দিয়েছেন আপনার বন্ধু। আর প্রত্যেকটা এক হাজার টাকা করে। এটা সত্যি প্রত্যাশা করিনি। আমি ওঁকে কিছু কমিশন দিতে চাইলাম, কিন্তু উনি নিতে চাইলেন না। আপনি একটু বলবেন তো ওঁকে—"

"ও আমার কাছ থেকে কমিশন নেবে না।"

"কিন্তু আপনার কাজ তো করেন নি, করেছেন আমার কাজ।"

"আমার অনুরোধেই করেছে। টাকাটা পেয়ে গেছেন তো ?"

"হ্যাঁ—"

"এইবার আরও খানকয়েক ছবি দিন ওকে। সে পরে দেবেন এখন। আপাতত একটি দুঃসংবাদ শোনবার জন্যে প্রস্তুত হোন—"

"কি দুঃসংবাদ ?"

"ভূষণ চক্রবর্তী বলে আপনার বাবার একজন ভক্ত তাঁর জন্যে একটা ভালো বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আমার বাসায়। আপনাকে দেখতে চাইছেন। আপনি চলুন একবার।"

"আপনার বাসায় ? আপনি তো কোলকাতার বাইরে থাকেন বললেন সেদিন। কোথা যেতে হবে আমাকে ?"

"এখানেও আমার একটা ছোট বাসা আছে। সেইখানেই আছেন তিনি।"

"সেখানে এলেন তিনি কি করে ?"

"সব বলব। চলুন।"

"এখনই যেতে হবে ?"

"এখনই যাওয়াই তো ভালো। বড্ড অস্থির হয়েছেন আপনার জন্যে।"

"একটু অপেক্ষা করুন তাহলে। কাপড়টা বদলে আসি।"

ভিতরে ঢুকেই আকাশ-পরীর সঙ্গে দেখা হল বর্ণনার।

"আকাশ, আমি একটু বেরুচ্ছি।"

"আগেই জানতাম।"

"কি করে জানলি ?"

"ভদ্রলোক এসেছেন দেখে আড়ি পাতছিলাম। আজ মাদ্রাজীর ছদ্মবেশ ছেড়ে এসেছেন দেখছি। চমৎকার দেখতে ভদ্রলোক। তোরা দুজনে যখন পাশাপাশি কথা বলছিলি এমন সুন্দর লাগছিল।"

বলেই সে কবিতা আওড়াতে লাগল।

সোনার সঙ্গে সোহাগা যেন রে
মালার সঙ্গে গলা
কমল-নয়নে কাজলের রেখা
ফলারেতে পাকা কলা।
(আহা) মানিয়েছে ভালো, মানিয়েছে খাসা
পান্নার পাশে চুণী
তপোবন মাঝে অপ্সরা হেরি
বিব্রত যেন মুনি।

"ফাজিল কোথাকার। ওই এক চিন্তা খালি—"

বর্ণনা কাপড় বদলাবার জন্যে ঘরে ঢুকল। আকাশ-পরীও ঢুকল তার পিছু পিছু কীর্তনের সুরে গাইতে গাইতে—

কহিছে শ্রীরাধা কোথা শ্রীকৃষ্ণ
কোথা তুমি বনমালী
কোথা শ্রীবৎস কোথা শ্রীবৎস
কহিছে চিন্তা খালি।
সখি, কেন কর মুখে এ কপটতা—
গাহিবার মতো এই তো রাগিণী
কহিবার মতো এই তো কথা।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল একটু পরেই।

নবনী রায় বললে, "এইবার আমি চললাম।"

"কোথা যাবেন ?"

"আমি এবার বিদায় নিতে চাই। আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না"—তারপর ব্যাগ থেকে একটি কাগজ বের করে দিয়ে বললেন, "এটা ভূষণবাবুকে দিয়ে দেবেন। দমদমের বাড়িভাড়ার রসিদ। এক বছরের বাড়িভাড়া দেওয়া আছে।"

"কোথা যাচ্ছেন এখন?"

"হিমালয়ের দিকে যাব"—তারপর হেসে বললে—"আবার ভেসে ভেসে বেড়াব আর কি, যেখানে গিয়ে ঠেকি—"

বর্ণনা তার মুখের দিকে চকিতে চেয়ে দেখল একবার।

"ভূষণ কাকার সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"না। তাঁকে এত বেশি শ্রদ্ধা করি যে তিনি যদি যেতে মানা করেন আমাকে থেকে যেতে হবে। কিন্তু আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। উনি অনেকটা সেরে উঠেছেন, এবার আপনি ওঁর ভার নিন। আমাকে ছুটি দিন।"

"কিন্তু কোনও কারণে আপনাকে যদি আবার দরকার হয়। কি করে খবর দেব আপনাকে?"

"চান যদি আমার ঠিকানাটা দিতে পারি। আপাতত সিমলা যাচ্ছি, সেখানে একটা হোটেলে উঠব। সেই ঠিকানাটাই রাখুন।"

একটা কার্ডের পিছনে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে, ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে হাসিমুখে নমস্কার করে চলে গেল নবনী রায়।

বর্ণনা তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। নবনী রায় দেখতে দেখতে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার দিকে ফিরেও চাইলে না।

বর্ণনাকে দেখেই বিছানায় উঠে বসলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

"বর্ণনা এসেছিস? আয়, এইখানটায় বোস। তোকে দেখবার জন্যে মনটা ছটফট করছিল। কেমন আছিস, তোর বাবা কেমন আছে?"

ভূষণ কাকার জরাজীর্ণ চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল বর্ণনা। তাঁর শরীরটা ভেঙে পড়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থায় তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা তাঁকে বলবার সাহস হল না তার।

বললে, "ভালই আছি আমরা।"

"তোর বাবা নতুন কোন ছবি এঁকেছে আর ?"

"না। অত ভিড়ে গোলমালে কি ছবি আঁকা হয়!"

"হয় কি ? হবে না জানতাম। কিন্তু এবার হবে। খুব ভালো বাড়ি ঠিক করেছি তোদের জন্যে একটা। সেখানে গেলে দেখবি ছবির পর ছবি হবে। কি বড় বড় ঘর, প্রকাণ্ড হাতা, চমৎকার বাগান, কোলকাতাতেও যে দোয়েল থাকতে পারে তা ওইখানেই প্রথম দেখলুম। চমৎকার বাড়ি—"

"নবনীবাবুর কাছে শুনলাম। তিনি এই রসিদটা তোমাকে দিয়ে গেলেন। বাড়িটার এক বছরের অগ্রিম ভাড়া দেওয়া হয়েছে। টাকাটা কি নবনীবাবু দিলেন ?"

"হ্যাঁ, সেই তো কথা ছিল। নবনীবাবু কোথা ?"

"তিনি তো চলে গেলেন।"

"চলে গেলেন। কোথা চলে গেলেন ?"

"বললেন হিমালয়ে যাচ্ছি।"

"হিমালয়ে!" নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন ভূষণ চক্রবর্তী।

কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন, "হিমালয়ে চলে গেলেন। সে যে অনেক দূর। আমি যে এদিকে মনে মনে—" আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

"কি ?"

"হিমালয়ে কোথায় গেছে জানিস ?"

"একটা ঠিকানা দিয়ে গেছেন।"

ভূষণ চক্রবর্তীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। "ও, ঠিকানা দিয়ে গেছেন ? এখুনি চিঠি লেখ। লেখ, আপনি চিঠি পেয়েই চলে আসুন।"

"আসতে বলছেন কেন ?"

"না বললে আর আসবে না। নির্বিকার মহাপুরুষ লোক। এ রকম লোক আমি আর দেখিনি। স্বয়ং শিব। লেখ লেখ, এখুনি লেখ— ফিরে আসুন, আপনি ফিরে আসুন। ওই টেবিলে কাগজ, কলম, খাম সব আছে। এখুনি লেখ, আমার সামনে বসে লেখ।"

ভূষণ কাকার আগ্রহাতিশয্যে লিখতে হল চিঠিটা। তারও যে খুব একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়, তারও খুব ভালো লেগেছিল লোকটিকে।

কিন্তু চিঠি লিখতে লজ্জা করছিল তার।

যতদূর সম্ভব সংযত ভাষায় সে লিখলে—

প্রিয় নবনীবাবু,

আপনি হঠাৎ চলে যাওয়াতে ভূষণ কাকা ভারী অস্থির হয়ে পড়েছেন। তাঁর খুব ইচ্ছা আপনি আবার ফিরে আসুন। কিছুদিন পরে না হয় আবার যাবেন। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছাও যুক্ত করলাম। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

ইতি—বর্ণনা

চিঠিটা হস্তগত করে ভূষণ চক্রবর্তী হাঁক দিলেন—"প্রহ্লাদ।"

প্রহ্লাদ পাশেই ছিল, এসে হাজির হল।

"এই চিঠিটা এক্ষুনি ডাকে দিয়ে এস। তোমার বাবু হঠাৎ হিমালয়ে চলে গেলেন কেন?"

"উনি মাঝে মাঝে ওই রকম চলে যান। আবার ফিরে আসবেন দিন কতক পরে।"

"উনি না থাকলে এখানকার খরচ-পত্র চলে কি করে?"

"সে ব্যাংকে সব বলা আছে। আমি গেলেই টাকা পাই। আর বাড়িভাড়া প্রতি মাসে বাড়িওলার কাছে চলে যায়। সেজন্যে কিছু আটকায় না।"

চিঠি নিয়ে চলে গেল প্রহ্লাদ। নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ভূষণ চক্রবর্তী। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"মহার্ঘ শয্যাপরিবর্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশ পুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে
অশেত তা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিল এব কেবল।

দামী বিছানায় পাশ ফিরবার সময় চুল থেকে যে ফুল খসে পড়ত

তার স্পর্শেও যিনি কাতর হতেন সেই উমা এখন হাতে মাথা রেখে মাটিতে শুয়ে থাকেন, মাটিতেই বসে থাকেন।"

"কি বলছ ভূষণ কাকা ওসব।"

"কালিদাসের কুমার-সম্ভবে উমার তপস্যার যে বর্ণনা আছে তা এখন মনে পড়ল হঠাৎ। উমা অনেক তপস্যা করেছিল তাই মহাদেবকে পেয়েছিল। তোকেও করতে হবে। তোরা সবাই তো উমা—"

বর্ণনার কান এবং গালের খানিকটা লাল হয়ে উঠল। কথার মোড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলল, "আমরা নতুন বাড়িতে কবে যাব?"

"আমি আর একটু জোর পাই। বাড়িটা পরিষ্কার করাই, সাজাই, তখন যাস। তোর বাবাকে এখন কিছু বলিস না যেন। তাকে একটা 'সারপ্রাইজ' দেব আমরা।"

"হ্যাঁ, সেই বেশ হবে।"

একটু পরেই প্রহ্লাদ এসে জিজ্ঞাসা করল, "উনি ছবিগুলোর কথা কিছু বলে গেছেন কি?"

"কোন্ ছবিগুলো?"

"উনি পাঁচখানা ছবি কিনে রেখে গেছেন পাশের ঘরে। সেগুলো কি ওখানেই থাকবে?"

"দেখি কি ছবি।"

পাশের ঘরে গিয়ে বর্ণনা ছবিগুলো দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারপর সে ভূষণ কাকার কাছে শুনল দমদমের বাড়িভাড়া করার কাহিনী। তারও মনে হল এরকম লোক কি সম্ভব এ যুগে?

এ যে কল্পনাতীত!

আঠারো

আরও দিন দশেক ভুগে সড়কিও মারা গেল।

কান্নার রোল পড়ে গেল বাড়িতে। বাচস্পতি বালকের মতো লুটিয়ে

লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। সীমন্তিনী মূর্ছা গেল। সরস্বতীর চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল নীরব অশ্রুধারা। সে সাধারণত নীরব প্রকৃতির, শোকেও নীরব রইল। স্থির প্রস্তরমূর্তিবৎ বসে রইলেন সত্যবতী, তাঁর চোখে এক ফোঁটা জল নেই, মুখে একটি কথা নেই। বনস্পতিরও না। কাঁদতে পারলে সে খানিকটা হালকা হত। কিন্তু সে কিছুতেই কাঁদতে পারল না, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার সারা বুকটাকে মুচড়ে মুচড়ে দিতে লাগল কিন্তু সে কাঁদতে পারল না। মাথা হেঁট করে গলির একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগল শুধু।

বর্ণনা হতবাক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর হস্টেলে চলে গেল।

আরও দিন কয়েক পরে, শোকের তীব্রতাটা যখন কিছু কমেছে, তখন হেমন্তকুমার এসে হাজির হল হঠাৎ একটা রিকৃশা টানতে টানতে। পরনে ছেঁড়া ময়লা হাফপ্যাণ্ট, হাফশার্ট, মাথায় একটা পাগড়ি। গৈরিক নয়, ময়লা খাকি।

বাচস্পতির দিকে চেয়ে বলল, "তোমার উপদেশ শুনেছি বন্ধু। গেরুয়া জ্যোতিষ সব ছেড়ে দিয়েছি। একটা খাটালে রিকৃশা টানা শিখছিলাম। এখন থেকে আমি রিকৃশাই টানব।"

বাচস্পতির চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। তার বাকী চারটি সন্তানও আর বেঁচে নেই একথা শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল হেমন্ত। তারপর বলল—"মরে বেঁচেছে। বেঁচে থাকলে হয় বেশ্যা হত, না হয় জেলে যেত।"

সত্যবতী নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসেছিলেন, সত্যিই যেন তিনি পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীর এই পরিবর্তনে তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। সমস্ত অনুভূতির অতীত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যেন। তাঁর মুখে একটি ভাবই কেবল ফুটে ছিল, তিনি লজ্জিত, কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। তার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল হেমন্ত।

তারপর বলল, "সব তো ফুরিয়ে গেল। এস আমার সঙ্গে—"

"কোথা যাব ?"

"এস না।"

সত্যবতী যন্ত্রচালিতবৎ গিয়ে রিক্‌শাতে উঠে বসলেন।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল সে হাজির হয়েছে ডাক্তার সামন্তর জন্ম-নিরোধ-ক্লিনিকের সামনে।

ডাক্তার সামন্ত তখন ক্লিনিকে ছিলেন।

সব শুনে বললেন, "খুবই দুঃখিত হলাম সত্যি। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে এই জিনিসই নানা আকারে রোজই দেখছি। সেই জন্যেই তো আমরা চেষ্টা করছি একটা প্ল্যান করে ছেলে-মেয়ে হোক—এদেশে আইডিআটা নতুন, কিন্তু ও ছাড়া বাঁচবার পথ নেই।"

হেমন্ত বলল, "আমরাও নতুন করে জীবন আরম্ভ করছি আবার। আপনি ব্যবস্থা করে দিন যাতে আর ছেলে-মেয়ে না হয়।"

"তা কেন। আপনার নতুন জীবনে নতুন মানুষ আসুক না আবার দু' একটা, এখন তো একটাও সন্তান নেই বলছেন। আবার নতুন সন্তান হোক। সে সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলুন এবার।"

"না, না, না। আর সন্তান চাই না। আমার মতো দরিদ্রের পিতা হবার যোগ্যতা নেই, এ লক্ষ্মীছাড়া সমাজে কোনও সন্তান মানুষ হবে না, মরুভূমিতে গাছ বাঁচে না। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন একটা, আমি নির্বংশই থাকব, আমার বংশে বাতি দিতে হবে না কাউকে। আপনি দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।

হঠাৎ ডাক্তার সামন্তের পা দুটো জড়িয়ে কাঁদতে লাগল সে।

উনিশ

দিন পনরো পরে একদিন বিকেল বেলায় ভূষণ চক্রবর্তী বনস্পতিকে দমদমের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে এলেন। বর্ণনা পরীক্ষা দিচ্ছিল, সে আসতে পারেনি। একটা ভালো বাড়ি পাওয়া গেছে শুনে

বাচস্পতি আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিন্তু বললেন, "বনু আর বউমা খুব ভোরে উঠে কোথা যে চলে গেছে, বুঝতে পারছি না। বর্ণনা তো কদিন থেকে আসেনি, হস্টেলেই আছে। ওরা যে কোথা গেল বুঝতে পারছি না। কোলকাতায় নেই। কোলকাতায় থাকলে এতক্ষণ ফিরে আসত—"

ভূষণ চক্রবর্তী নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি বাড়িখানি সাজিয়ে গুছিয়ে অনেক আশা করে এসেছিলেন, কিন্তু এ কি হল!

বনস্পতি আর সরস্বতী দুজনেই হাঁটছিল। সুখপুরে ফিরে যাচ্ছিল তারা। কোলকাতায় আর তারা একদণ্ড থাকতে পারছিল না। কয়েকদিন আগে সাবু এসেছিল। সে খবর দিয়েছিল বুড়ির জঙ্গলে অনায়াসে বাস করা যেতে পারে। গৃহপতি যে ঘরটা করেছিলেন সেটা এখনও আছে। সেইখানে ফিরে যাচ্ছিল তারা। হেঁটে যাচ্ছিল কারণ তাদের কাছে একটিও পয়সা ছিল না। পয়সা চাইলেই অবশ্য পেত, কিন্তু চায়নি। তাদের আশঙ্কা ছিল শুনলে বাচস্পতি হয়তো যেতে দেবেন না।

খবর পেয়েই ভূষণ চক্রবর্তী গিয়ে হাজির হল সেখানে।

বুড়ির জঙ্গলে সে আগে কখনও যায়নি। গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিরাট অরণ্য। তার মাঝখানে বনস্পতি মহানন্দে ছবি এঁকে চলেছে।

"আমি আবার ফিরে এলাম—"

"আরে, ভূষণ না কি! আমি রোজই তোমার কথা ভাবি। যাক এসে গেছ বাঁচলাম—" দুজনে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হল।

বনস্পতি বললে—"আর তোমাকে কোথাও যেতে দেব না ভূষণ।"

ভূষণ চক্রবর্তী ছবিটার দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে ছিলেন।

বনস্পতি বললে—"ওটার নাম দিয়েছি 'শিল্পী ও দারিদ্র্য রাক্ষসী'।"

একটা বিরাট কুৎসিত্র তাড়কার মতো রাক্ষসী। শিল্পী তার গায়ে মুখে পেটে বুকে নানারকম রং লাগাচ্ছে তুলি দিয়ে, আর রাক্ষসীটা খিল খিল করে হাসছে, বোধহয় তার কাতুকুতু লাগছে।

সরস্বতী এক বাটি ক্ষীর আর মুড়ি নিয়ে এল।

"সাবু একটা গাই ঠিক করে দিয়েছে। খুব মিষ্টি দুধ। তোমার

চেহারাটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে, তুমি কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া কর, ভাল করে খাও। আমি ততক্ষণ এটাতে রং দি—"

আবার তন্ময় হয়ে গেল সে ছবিতে।

সুখপুর-পত্রিকার একটি খবর।

"বনস্পতি সরস্বতী বুড়ির জঙ্গলে গিয়া বাস করিতেছে। সাবু বলিল সেখানে ভূষণ চক্রবর্তীও গিয়াছেন। বনস্পতি আজকাল রোজই নাকি ছবি আঁকিতেছে। আমিও সেখানে ফিরিয়া যাইতাম, কিন্তু হেমন্ত-কুমারকে এখানে একা ফেলিয়া যাইতে পারি না। তাহাকে বারবার বলিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল। গঙ্গার গতি পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের জমি আবার হয়তো উঠিবে। আবার হয়তো আমরা সুখের মুখ দেখিতে পাইব। কিন্তু সে বলে—'আমি এ মুখ আর সুখপুরে দেখাইতে পারিব না।' সে না গেলে আমি কি করিয়া ফিরিয়া যাই। মহা সমস্যায় পড়িয়াছি।"

কুড়ি

নবনী রায় আর ফেরেনি।

প্রায় মাস তিনেক পরে তার চিঠি এল একটা। বর্ণনাকে লিখেছে।

সুচরিতাসু,

আমি আর ফিরতে পারলাম না। পৃথিবী গোল, আবার কোনদিন কোথাও দেখা হবে হয়তো। একটা সুযোগ ঘটেছে, আপনি যদি রাজী হন তাহলে হয়তো দেখা হবে। দিল্লীতে আপনার বান্ধবী আকাশ-পরী আর তাঁর স্বামী মেজর মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হল। দুজনেই চমৎকার লোক। তাঁদের খুব ইচ্ছে আপনার বাবার ছবিগুলোর একটা প্রদর্শনী করা। এজন্য তাঁরা দিল্লীতে একটা হলও ভাড়া করেছেন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে ছবিগুলো নিয়ে চলে আসুন। শ্রীমতী আকাশ-

পরীও হয়তো আপনাকে চিঠি লিখবেন। তাঁরই অনুরোধে এ চিঠি আপনাকে লিখছি। ভূষণবাবু এবং আপনাদের বাড়ির সকলে আশা করি ভালো আছেন। চিঠির উপরে যে ঠিকানা রয়েছে সেখানে আমি একমাস থাকব। প্রীতি ও নমস্কার নিন। ইতি—

ভবদীয়—নবনী রায়

আকাশ-পরীর চিঠি এল ছোট একটি কবিতায়।

রোহিত মৎস্য থাকে গভীর জলে
তাহারে ধরিতে হয় নানান ছলে।
ফেলেছি অনেক চার
দেরি করিও না আর
লইয়া ছবির জাল
এস গো চলে।

বর্ণনার ভয় ছিল ভূষণ কাকা তাকে ছবি নিয়ে যেতে দেবেন কিনা। কিন্তু নবনী রায়ের চিঠি দেখে তিনি আপত্তি করলেন না। বরং বললেন, "ভালই হয়েছে। তুমি চলে যাও তার কাছে।"

ছবিগুলো দমদমের বাড়িতে বন্ধ ছিল। ছবিগুলো নিয়ে বর্ণনা একদিন দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়ে গেল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

শ্রীযুক্ত সাত্যকি রায়ের জবানীতে যে কাহিনীটি আপনাদের শোনালাম সেটির পাণ্ডুলিপিটি আমি পেয়েছিলাম মিস্টার রায়ের কাছ থেকে। তিনি পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখে দিতে বলেছিলেন। এ-ও বলেছিলেন, যদি আমার ভাল লাগে আমি ওটা ব্যবহার করতে পারি। মিস্টার রায়ের আসল নাম কি আমি জানি না। একদিন ট্রেনে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। গল্পটি ব্যবহার করতে গিয়ে দু'এক জায়গায় একটু আধটু ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করলাম। একথা তাঁকে লেখাতে তিনি আমাকে নীলগিরি থেকে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠিটি এই—

"আমার কোলকাতার বাসায় আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো আছে। তার থেকে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় খবরগুলি পাবেন। আমার ঠিক মনে নেই। আপনাকে খাটতে হবে একটু। এলোমেলো নানা-রকম খবরের মধ্যে ছড়ানো আছে ওগুলো। যে কোনও খবর আপনি ব্যবহার করতে পারেন। শুধু একটি অনুরোধ, আমার আসল নামটি কোথাও প্রকাশ করবেন না। মিস্টার রায় নামেই আমি চেনা-মহলে পরিচিত। আপনি মিস্টার রায় নামেই আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠি ঠিক পৌঁচেছে। আমার চাকর প্রহ্লাদ সস্ত্রীক কোলকাতার বাসায় থাকে। তাকেও চিঠি লিখে দিলাম। আপনি গেলে সে আপনাকে আমার পুরোনো ডায়েরিগুলো দেবে। আমার শেষ ডায়েরিটাও ওইখানে আছে। দরকার হলে ও বাড়িতে আপনি থাকতেও পারেন দু'চারদিন। কোন অসুবিধা হবে না। নমস্কার নিন। ইতি— ভবদীয়—মিস্টার রায়

তাঁর ডায়েরিগুলো খুলে সবিস্ময়ে দেখলাম তাঁর পদবী রায় নয়, মুখোপাধ্যায়।

ডায়েরি ঘেঁটে অনেক নূতন খবর পেয়েছি এবং এই কাহিনীতে তা ব্যবহার করেছি। একটি খবর ব্যবহার করিনি সেটি এখন জানাচ্ছি আপনাদের। তাঁর শেষ ডায়েরিটিতে এক জায়গায় আছে—"একজনের অনুরোধে আজ থেকে একটা অব্যাপারে লিপ্ত হলাম। অনুরোধ এড়াবার উপায় ছিল না, কারণ, অনুরোধকারিণী আমার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। তার পারিবারিক কাহিনী অবলম্বন করে একটা উপন্যাস ফেঁদে বসেছি। কাহিনীতে তার নাম দিয়েছি যদিও বর্ণনা, কিন্তু তার আসল নাম অন্য এবং তা বর্ণনার ঠিক উল্টো। অর্থাৎ সে অবর্ণনীয়া। আমার একটা ভয় হচ্ছে কিন্তু। ছেলেবেলায় একটা সংস্কৃত গল্পে পড়েছিলাম এক বানর চেরা কাঠের গুঁড়ির ভিতরকার কীলক নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মহা বিপদে পড়েছিল। আমারও সেই কীলোৎপাটীব বানরের দশা না হয়।"

—